সচকিতা গৃহিণী

এবং আরো গল্প

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস্

কলিকাতা

১৯৩২

মূল্য ২৲ দুই টাকা

প্রকাশক

শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র

ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস্—কলিকাতা

প্রিণ্টার

শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড্

এলাহাবাদ

পূজনীয়া

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

শ্রীচরণেষু

ছোট্‌দি,

ছেলেবেলায় খেলার ছলে গল্প লেখার সূত্রপাত! সে-খেলা জীবনে এতখানি সত্য হইবে, ভাবি নাই! এ-খেলায় তোমার উৎসাহ কতখানি ছিল,—সে-কথা স্মরণ করিয়া আমার এ বইখানি তোমার হাতে দিলাম।

৮২।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা.
১লা আশ্বিন, ১৩৩৯

স্নেহের
সৌরীন

সূচী

সচকিতা গৃহিণী	১
এক পশলা	৩৫
নিশির ডাক	৬৫
বলবান স্বামী	৯২
সুখে-দুঃখে	১০৭
বড়বাবুর বিপত্তি	১২০
অবুঝ প্রেম	১৪০
ট্রেণের কামরায়	১৬৩
অগ্নিচক্র	১৭২
কবি-কথা	১৮৩
মৌ-বনের কবিতা	২০০

সচকিতা গৃহিণী

১

রমার মনে এক তিল স্বস্তি নাই। যত দুভাবনা তার স্বামী হরেন্দ্রকে লইয়া। একেই তো নানা রোগ বিভীষিকা-বিস্তারে দুনিয়া-আক্রমণের জন্য থাবা মেলিয়া আছে, তার উপর বন্ধু-বান্ধব, থিয়েটার, বায়োস্কোপ, মাছ-ধরা প্রভৃতি নানা প্রলোভন স্বামীটিকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে! উপদ্রবের কি সীমা আছে?

তোমরা ভাবিতেছ, রমা মূর্খ? কুরূপা? সে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে? তা নয়। রমা ম্যাট্রিক অবধি পড়িয়াছে। সে তরুণী, রূপসী; তা-ছাড়া এই সহরেই সে জন্মিয়াছে এবং সহরেই মানুষ হইয়াছে। তবে কি হরেন্দ্র অরসিক? দুশ্চরিত্র? কাঠগোঁয়ার? তাও নয়।

হরেন্দ্র সুশ্রী। তার বয়স সাতাশ-আটাশ বছর; বাপের বেশ পয়সা আছে; বঙ্গসাহিত্যের প্রতি তার অনুরাগ প্রবল; এবং রমাকে সে যেমন ভালোবাসে, তেমন ভালোবাসার কথা কোনো উপন্যাস-গল্পেও পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না! তার কোনো দোষ নাই, তবে একটা খেয়াল আছে। সে খেয়াল, বন্ধু-বান্ধবের আহ্বান সে এড়াইতে পারে না, তা সে বাদার ধারে স্নাইপ-মারার আহ্বান আসুক, বা কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান অবধি পদব্রজে পাড়ি দিবারই ডাক পড়ুক! সকল-দিকে হরেন্দ্রর সমান উৎসাহ!

কাজেই রমার দুর্ভাবনা। তথাপি গোড়ার ব্যাপার আর একটু খোলশা করিয়া বলা দরকার।

রমা যখন খুব ছোট, তখনই বাপ-মা ইহলোক ত্যাগ করেন। রমা মানুষ হইয়াছে মাতামহ-মাতামহীর কাছে। মাতামহ বেশ পয়সাওয়ালা লোক এবং তিনি সৌখীন। তাঁদের কাছে রমার আদরের সীমা ছিল না। ছেলেবেলা হইতেই রমা কর্ত্রীত্ব করিতে ভালোবাসে; সে-কাজে কখনো বাধা পায় নাই। সব বিষয়ে তার কড়া নিষেধ-শাসন ছিল। বসা-দাড়ানো প্রত্যেক ব্যাপারে মাতামহ-মাতামহী রমার কথা শিরোধার্য করিয়া চলিতেন।

রমা তখন ফোর্থ ক্লাশে পড়ে; 'স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে' লেখা ছিল, দুনিয়ার বাতাস রোগের বীজাণুতে ভরা। তার মন অমনি দুশ্চিন্তায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এই বীজাণুর আক্রমণ বাঁচাইয়া চলিতে তার স্কুলের 'স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে' যে-কয়টি উপদেশ ছাপা ছিল, তার সবগুলিই সে প্রাণপণে মানিয়া চলিতে সুরু করিল। দাসী-চাকরের উপর কড়া নজর রাখিল। বাসন-মাজা প্রভৃতি কাজেও তার নজর বাঁচাইয়া চলা তাদের পক্ষে সুকঠিন হইল। চাকর-দাসীর ছেঁড়া মশারিতে তালি পড়িল; এবং ময়লা দুর্গন্ধ কাপড় পরিলে রমার শাসন এমন মূর্ত্তি ধরিত যে, তখনি সে ভৃত্যকে বাড়ী হইতে বিদায় দিতে তার মন কিছুমাত্র কাতর হইত না।

দিদিমা বলিলেন,—তোর জ্বালায় লোকজন আর এ-বাড়ীতে চাকরি করতে আসবে না, দেখচি।

ধমক দিয়া রমা কহিল,—তা বলে গুষ্ঠিশুদ্ধ মারবে ঐ নোংরা কাপড়ের ব্যাসিলিতে!

দিদিমা কহিলেন,—নিজের হাতে তবে কর্ সব।

রমা কহিল,—তা করতে রাজী আছি। তা বলে স্বাস্থ্যের বিধি-নিয়ম মেনে চলবে না!

ছোটখাট ব্যাপারে রমার এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অটুট রহিয়া গেল। বিবাহের পর শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া রমা দেখে, শ্বশুর-শাশুড়ী নাই—হরেন্দ্র একা, এবং বাড়ীতে এলাহি কাণ্ড! বিছানার উপর খপরের কাগজ, প্রুফ, মাসিক-পত্র ডাঁই হইয়া আছে। শুইবার ঘরে টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালা পড়িয়া আছে তো পড়িয়াই আছে—চাকর-বাকরের তা সরাইবার নাম নাই! পেয়ালায় রাজ্যের মাছি বাসা বাঁধিবার উদ্যোগে ব্যস্ত!

মাছি! সর্ব্বরোগের এমন বাহন আর কোথায় আছে! গা তার নিশ্‌পিশ্‌ করিয়া উঠিল। কিন্তু নূতন জায়গা, নূতন বৌ...কাজেই গায়ের ঝাল তার অঙ্গেই লঙ্কাবাটা লেপিতে লাগিল।

ফুলশয্যায় আলাপের মুখে সাহিত্য-রসিক হরেন্দ্রর সোহাগ-বাণীর অন্তরালে রমা ফশ্‌ করিয়া বলিয়া উঠিল,—তোমরা এত নোংরা কেন?

নোংরা! হরেন্দ্র অবাক্‌! সে যে অতি-সৌখীন, বন্ধুরাও এ-কথা বলে, যখন-তখন! প্রিয়ার মুখে এত বড় অপবাদ শুনিয়া তাই সে থ হইয়া গেল। তার মুখে চট্‌ করিয়া কোনো কথা জোগাইল না।

রমা কহিল,—ঐ টেবিলের উপর অত বই অগোছালো পড়ে আছে—ধুলোয় ধুলো! ধুলোয় কত রোগের বীজ থাকে! ধুলো কি, জানো?

হরেন্দ্র অবাক্‌! তাকে উত্তরের অবসর না দিয়া রমা কহিল,—নবগৌরাঙ্গ পাকড়াশীর স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে আছে, ধুলো হলো যত নোংরা জিনিষের গুঁড়ো! তার ওপর ঐ চায়ের পেয়ালাটা পড়ে আছে দেখচি, সেই সকাল থেকে। ধুয়ে তোলার চাড় কারো নেই।

হরেন্দ্র কহিল,—কাল সকালে চা দেবার আগে ধুয়ে-মেজে তবে চা দেবে, নিশ্চয়। ওতেই দেবে না!

শিহরিয়া রমা কহিল,—সেই কাল সকালে ধোবে? আর ওতে রাজ্যের যত মাছি এসে বস্‌চে!...ঘরের মধ্যে মাছি জড়ো হতে দেওয়া ঠিক নয়। সর্ব্বরোগের বাহন হলো মাছি।

হরেন্দ্র কহিল,—চাকরগুলো ভারী কুড়ে...আমি পারি না। এবার তোমার হাতে তো চার্জ্জ পড়লো—তুমি দেখে-শুনে সব ঠিক করে দিয়ো...

—হুঁ। বলিয়া রমা উদাস নেত্রে একদিকে চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্র কহিল,—রবিবাবুর সেই কবিতাটি পড়বো, রমা? সেই

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার—
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার!

আমারো মনে হয়...

কথা শেষ হইল না। এমন চমৎকার ছত্রগুলার দিকে রমার যে বিন্দুমাত্র মনোযোগ নাই, হরেন্দ্র সেটুকু লক্ষ্য করিল। সে একটু অপ্রতিভ হইল, কহিল,—কিছু ভাবচো, রমা?

—হ্যাঁ। বলিয়া রমা খাট হইতে নামিল। দৃষ্টি তার খাটের ছৎরীর দিকে; এবং সে-দৃষ্টি বেশ তীক্ষ্ণ!

হরেন্দ্র কহিল,—কি দেখচো?

সে ভাবিয়াছিল, রমা বুঝি অলক্ষ্যে ভূত দেখিয়াছে—তার মুখের ভাবখানা অন্ততঃ তেমনি!

রমা কহিল,—মশা। বলিয়াই সে দু'হাত শূন্যে তুলিয়া তালি দিল; তার পর দুই করতল দেখাইয়া কহিল,—দুটো মরেচে। রক্ত দেখচো?

হরেন্দ্র কহিল,—হুঁ!

তার মনের কোণে কোথায় যেন একটা লোহার গোলা ঠেলিয়া উঠিতেছিল। রমা কি! এমন রূপ, এই বয়স...ম্যাট্রিক অবধি পড়িয়াছে···তবু ঐ মশা লইয়া বিব্রত!

রমা কহিল,—তোমরা মশারি ফ্যালো না?

হরেন্দ্র সভয়ে কহিল,—না। মশারির মধ্যে আমি শুতে পারি না। শুলে হাঁফ্ ধরে।

রমা কহিল,—মশার কামড় সহ্য করো! মশায় ম্যালেরিয়া রোগ আনে। সব মশা অবশ্য নয়—এ্যানোফিলিশ মশায় আনে। তা, সে মশা বাছাই করে কে? আমরা পড়েচি, এই মশা ম্যালেরিয়ার বীজ বয়ে বেড়ায়—সুস্থ মানুষকে কামড়ালে মশার শুঁড় থেকে সেই বীজ সুস্থ মানুষের দেহে এসে মেশে। তাতেই ম্যালেরিয়া রোগের উৎপত্তি।

হরেন্দ্র একেবারে কাঠ! ফুলশয্যার রাত্রে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের আলোচনা—এ যে কোনো কবি, কোনো গল্প-লিখিয়ে কখনো কল্পনা করেন নাই! রবীন্দ্রনাথের কল্পনা পুশা-মেনিকে লইয়াই পরিতৃপ্ত হইয়াছে। রমা কহিল,—মশারি যদি না ফ্যালো, ফ্লিট দিতে পারো তো! তা ছাড়া সেই জিলিপির মত আছে ক্যাটল্, মশ্‌কুইটো ডেষ্ট্রয়ার—তাও জালতে পারো! ধূনোয় মশা যায় না। ক্যাটল্ কিন্তু অব্যর্থ। আমাদের বাড়ীতে ব্যবহার হয়।

হরেন্দ্র কহিল,—কাল সকালেই আমি ফ্লিট আর তোমার ঐ ক্যাটল্ কিনে আনবো।

রমা কহিল,—এনো।

তোমরা ভাবিতেছ, আমি অতিরঞ্জন করিতেছি? তা নয়। যা সত্য ঘটিয়াছিল, হুবহু তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। কাহারো যৌবন-কাহিনীর সঙ্গে যদি না মেলে, আমি কি করিব?

হরেন্দ্র কিন্তু একটা কারণে খুশী হইল। প্রিয়া যে সেকেলে বৌয়ের মত ঘোমটা-ঢাকা আড়ষ্ট জীব নয়—বেশ সপ্রতিভ, আলাপে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন—এই টুকুতে তার প্রাণ আরাম পাইয়া বাঁচিল !

কিন্তু হরেন্দ্রর এত চিন্তার হেতুও দেখি না। যেহেতু এ-কাল সে-কাল নয়। সে-কালের ঘোমটা-পরা নির্ব্বাক্ বধূ আজ সভা-সমাজে বিরল। সামাজিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আজ তাঁর স্থান। তা-ছাড়া রমা লেখাপড়া শিখিয়াছে, সে বড় ঘরের মেয়ে, অতি-আদরে লালিতা, তার উপর ষোড়শী। এ-বয়সের বধূ নিপুণ হাতে সংসার-তরীর হাল ধরিতে পারে। কাজেই নব বধূর সম্বন্ধে হরেন্দ্রর উক্ত ধারণা নারী-চরিত্র-সম্বন্ধে তার অজ্ঞতারই পরিচয় দেয়—তা হোক্, সে সাহিত্যিক !

২

রমা একদিন হরেন্দ্রকে বলিল,—যাহোক একটা কাজ করো। কুড়ের মত বসে কবিতা-গল্প লেখা, বা বন্ধুদের দলে মিশে মাছ ধরতে যাওয়া —এ কি ঠিক ?

কবিতা লেখা, গল্প লেখা, মাছ ধরা কুড়ের কাজ ? হরেন্দ্র অবাক্ হইল।

রমা কহিল,—দাদামশায়ের টাকার অভাব ছিল না কোনো দিন। তবু দাদামশায় একটা কারবার খুলে বসেছিলেন। তাতে পয়সাও আসচে। তা-ছাড়া কাজে লেগে থাকার দরুণ দাদামশায়ের স্বাস্থ্য ভালো আছে।

রমা দাদামশায়ের বাড়ী গিয়াছিল ; দু'দিন সেখানে থাকিয়া আজ সন্ধ্যায় ফিরিয়াছে। এ-কথা যখন হইল, রাত তখন ন'টা বাজে : হরেন্দ্র দোতলায় নিজের ঘরে বসিয়া একটা গল্প লিখিতেছিল। পূজা আসন্ন, তিন-চারিখানা মাসিকের তরফ হইতে লেখার তাগিদ আসিয়াছে।

হরেন্দ্র কেমন লেখে,—এ প্রশ্ন হয়তো তোমাদের মনে জাগিতেছে! জাগিবার কথা। এ-সম্বন্ধে সাফ্ জবাব দেওয়া কঠিন—বিশেষ, গল্প সম্বন্ধে অভিমত! আমরা হরেন্দ্রর লেখা গল্প পড়ি নাই; তবে দু'চারিটা মাসিকে তার গল্প ছাপা হয়, দেখিয়াছি। মাসিকের গল্প ক'জন পড়ে, জানি না। আমরা পড়ি না; সময়ের অভাব। তবে কতকগুলা গল্প না ছাপিলে মাসিকের মাসিকত্ব থাকে না, তাই গল্প ছাপা হয়, জানি। হয়তো সেই কারণেই হরেন্দ্রর গল্পের আদর। তা ছাড়া হরেন্দ্রর পয়সা আছে; সে সৌখীন. এই দ্বিবিধ সার্টি-ফিকেটের জোরে তার গল্প যদি মাসিকের হাটে বিকায় তো তাহাতে বিস্ময়ের কোনো কারণ দেখি না।

রমা কহিল,—দাদামশায় বলছিল. পুরুষ-মানুষের এ বয়সে চুপ করে বসে থাকা ঠিক নয়...বাতিকের সৃষ্টি হয়!

হরেন্দ্রর অভিমান হইল। হরেন্দ্র কহিল,—তুমি কি বলচো, রমা! গল্প লেখা, কবিতা লেখা—এ-সব কুঁড়ের কাজ? রবীন্দ্রনাথ...

রমা কহিল,—বিশাল বঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একজন মাত্র!

হরেন্দ্র কহিল,—এ যে সাধনা, সাহিত্য-সাধনা!

রমা কহিল,—কার কি উপকারে লাগে? কুঁড়ে যখন সময় কাটাবার আর কিছু পায় না, তখন মাসিক কাগজ খুলে গল্প পড়ে, কবিতা পড়ে। আমাদের দেশ কুঁড়ের আড়ং হয়ে উঠেচে। লেখক-দের দ্বীপান্তরে পাঠানো উচিত। তুমি আর ধুনোর গন্ধে মনসাকে মাতিয়ো না। গল্প লিখে, কবিতা লিখে কুঁড়েমির প্রশ্রয় দিয়ো না। হ্যাঁ. যদি নতুন কিছু লিখতে পারতে, তা হলে বুঝতুম!

হরেন্দ্র কহিল,—বেশ, আজ থেকে ও-সবে ইস্তফা দেবো। যদি লিখি, কাল থেকে গম-তিষি-যব-পাটের বাজার-দর লিখবো...

রমা হাসিল। হাসিয়া কহিল,—তা লিখো! তাতে বণিক-সমাজের তবু কিছু উপকার হবে...

হরেন্দ্র চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রমা কহিল,—দাদামশায়ের আপিসে বেরুবে? দাদামশায় তাই বল্‌ছিল। দাদামশায়ের বয়স হয়েচে...সত্যি, আমারো ভালো লাগবে খুব। সকালে নেয়ে-খেয়ে তুমি কেমন আপিসে বেরুবে, আমি এসে কাছে দাঁড়াবো। তুমি আপিসে যাবে, সারা দিন আমি সংসার দেখবো। তার পর পাঁচটা বাজলে গা ধুয়ে চুল বেঁধে তোমার পথ চেয়ে থাকবো—তুমি আপিস থেকে ফিরবে, আমি তোমার পোষাক ছাড়িয়ে দেবো। তার পর মুখ-হাত ধুয়ে ঐ বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসবে, আমি জলখাবার এনে দেবো। জলখাবার খেয়ে আমায় নিয়ে তুমি মাঠে হাওয়া খেতে বেরুবে ..জীবনে কেমন বৈচিত্র্য হবে। আজো দাদামশায়ের আপিস যাবার সময়টিতে দিদিমা সব কাজ ফেলে তাঁর কাছে এসে বসে, তার পর আপিস থেকে ফেরার সময় দিদিমার আর কোনো দিকে জ্ঞান থাকে না! দু'দিন দেখে আমার তা এমন ভালো লাগ্‌ছিল! আগেও কি দেখিনি? দেখেচি। তবে এ দু'দিন ঐ যাওয়া-আসার মধ্যে বেশ একটু মাধুর্য্য দেখলুম...

রমার আঁকা ছবিটুকু হরেন্দ্রর মন্দ লাগিল না। এখন অহরহ রমার সঙ্গে এই ছোট-বড় সংসারের কথা সুরু হইয়াছে! কাব্য-কূজন কাজের কথার কলরবে গা ঢাকিয়া লুকাইতে চায়! দুপুর বেলায় সে গল্পের প্লট্ হাতড়াইয়া ফেরে, রমার উদ্দেশে কবিতা লিখিতে বসিলে ভাব-ভাষা-ছন্দের জন্য দুনিয়া ওলট-পালট্ করিতে হয়! অফিসের বৈচিত্র্যে একটু রোমান্সের আমেজ যদি. .

হয়তো অফিসে প্রিয়ার চোখের চকিত চাহনির লোভে মন

একটু আকুল হইবে,—সে যখন ইন্‌ভয়েস্ লইয়া মাথা ঘামাইতেছে, ঘরে রমা তখন কি করিতেছে, তারি কল্পনায় মনকে অধীর আবেগে ছন্দলোকের পথে উড়াইয়া দিবে! তাছাড়া ঐ ফেরার বেলায় রমার প্রতীক্ষা...বেশ হইবে!

হরেন্দ্র কহিল,—বেশ রমা, তাই হবে। তুমি দাদামশায়কে বলে ঠিক করে দাও। কাজেই বেরুনো যাক্! জীবনে বৈচিত্র্য আস্‌বে... সত্যি!

তাই হইল। দাদামশায়ের অফিসে হরেন্দ্র যাতায়াত সুরু করিল।...

কিন্তু মুস্কিল যে না বাধিল, এমন নয়।

সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইবে, বন্ধুরা আসিয়া হাজির। 'মরমী' কাগজখানা ভারী জোর চলিয়াছে, তাদের বড় সাধের 'গরজন্তি' বুঝি পিছাইয়া যায়। লেখার অভাব, পয়সার অভাব...

হরেন্দ্র কহিল,—বসো। বেড়িয়ে আসি। তার পর কথাবার্ত্তা কবো।

সেদিন বেশীক্ষণ বেড়ানো হইল না। নেপেন, সত্য, নন্দ—তার পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। সাহিত্য-জগতে নূতন কি খবর আছে, জানিবার জন্য মন তার অধীর হইয়া উঠিল।

বাড়ী ফিরিয়া দেখে, নন্দ একা শুইয়া আছে; নেপেন-সত্য চলিয়া গিয়াছে।

নন্দ কহিল,—অনেক দিন কিছু লেখোনি হে! এবার একটা গল্প দাও···এ-মাসে চাইই তোমার লেখা।

নন্দ গরজন্তির সম্পাদক। বেচারা আর দু'খানা বাঙ্‌লা দৈনিকে খবর তর্জ্জমা করিয়া কোনোমতে সংসার চালায়।

নন্দ কহিল,—তোমার ভরসাতেই কাগজ বার করা। তুমি সরে দাঁড়ালে কাগজ নিয়ে আমি যে মারা যাই!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হরেন্দ্র কহিল,—কিন্তু আমার অবসর কৈ?

নন্দ কহিল,—দু'চার জন ভালো লেখক পাকড়বো, সে সামর্থ্য নেই! এমন পাষণ্ড হয়েচে এই লেখকগুলো, পয়সা না দিলে কেউ এক লাইন লেখা দেবে না! কাগজখানা তুলে দেবো, ভাবচি।

নন্দ একটা নিশ্বাস ফেলিল।

তাও কি হয়! এই কাগজের সঙ্গে কত কল্পনা-জল্পনা, কীর্ত্তি-গৌরবের কতখানি সম্ভাবনা গড়িয়া তোলা...হরেন্দ্রর বুক দুলিয়া উঠিল। সে কহিল,—তুলে দিয়ো না। নিজেদের হাতে একখানা কাগজ থাকা ভালো হে! বেশ, কাল সকালে এসে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে যেয়ো ..

খুশী-মনে নন্দ কহিল,—মাসে পঞ্চাশটা করে টাকা দিতে পারো যদি, তা-হলে মাথা তুলে দাঁড়াই। দেখি, কে রোখে! বড় hard competition-এর বাজার পড়েচে!

হরেন্দ্র কহিল,—হ্যাঁ।...

তার পর সে কি ভাবিল, ভাবিয়া কহিল,—তাই দেবো। তবে একটা কথা...

—কি?

হরেন্দ্র কহিল,—কথাটা গোপন রেখো। আমার স্ত্রী আমায় ওদিকে ঘেঁসতে দিতে নারাজ। আমায় কাজের লোক করে তুলবেন। তিনি না জানতে পারেন..

নন্দ কহিল,—বেশ, গোপন থাকবে। তুমি আর আমি—এ ছাড়া এ-কথা আর কেউ জানবে না!...মোদ্দা, তোমার স্ত্রী শিক্ষিতা হয়েও সাহিত্য-সম্বন্ধে এতখানি উদাসীন···

হরেন্দ্র কহিল,—কে জানে, ভাই! সে বলে, বাঙলা সাহিত্য আজকাল ছাই হচ্ছে। ও-ছাইয়ে ছাই মিশিয়ে তুমি আর ছাইয়ের পাহাড় গড়ে তুলতে পাবে না!…

নন্দ কিছুক্ষণ হরেন্দ্রর পানে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া একটা বড় নিশ্বাস ফেলিল; ফেলিয়া কহিল,—Strange!

হরেন্দ্র কহিল,—তাই আমায় নজর-বন্দী করে একেবারে রেখেছেন। গল্প আর কবিতা লেখা নিষেধ।

নন্দ আবার কহিল,—আশ্চর্য্য!

ইহার বেশী আর কোনো কথা সে বলিতে পারিল না। বলিবার শক্তি নাই। হরেন্দ্র পেট্রন; না হইলে বলিত, তোমার স্ত্রীর মাথা খারাপ; চিকিৎসা করাও! বাঙলা-সাহিত্যে প্রাণের যে বিপুল বিশাল সাড়া উঠিয়াছে, তা স্বীকার করা পরের কথা—তার পরিচয় লইবারও যার আগ্রহ নাই…

সে ভাবিল, এ ঔদাসীন্য লইয়া কোনো ফাঁকে একটা সাধারণ টিপ্পনী 'গরজন্তি'তে ছাপাইয়া দিবে—এ মাসে নয়, দু'চার মাস পরে। নিশ্চয়। নর-নারীকে সাহিত্য-বিষয়ে সচেতন করিয়া তোলা মাসিকের সম্পাদক-হিসাবে তার কর্ত্তব্যও।

৩

সেদিন অফিস সারিয়া হরেন্দ্র বাড়ী ফিরিতেছিল ট্যাক্সিতে। ঘরের গাড়ী বিগড়াইয়াছিল, তাকে মিস্ত্রীখানায় পাঠানো হইয়াছে।

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের কাছে দু'খানা বাস গতি-বেগ লইয়া বাজী চালাইয়াছিল। মানুষের প্রাণ সম্বন্ধে বাসের এ ঔদাসীন্য বিচিত্র নয়—কিন্তু ট্র্যাফিক্-পুলিশের চোখের উপর এতখানি তেজ…পথিকের

দল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ফুটপাথে পলাইয়া যাইতেছিল। ট্যাক্সির ড্রাইভারটা ছিল শিখ···তারো ধমনীতে বীর-রক্ত! কারো তেজ সহিবার পাত্র সে নয়! সেও বাসের বাজী-সমারোহে ট্যাক্সি ছুটাইয়া দিয়াছিল। মেছুয়াবাজারের মোড়ের কাছে টিক ফস্কাইল এবং সবুজ রঙের বাসখানা ট্যাক্সিকে সজোরে ধাক্কা দিল। ট্যাক্সিব একদিক তুব্‌ড়াইয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে সীট্‌ হইতে হরেন্দ্র গড়াইয়া পড়িল। তার মাথায় চোট্‌!

পলকের কাণ্ড! তখনি হৈ-হৈ করিয়া চারিদিক হইতে লোক আসিয়া জমিল। মুখে মার্‌-মার্‌ শব্দ। বাসের ড্রাইভার নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া একদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। ট্যাক্সির কর্ত্তার সিং ছিট্‌কাইয়া পথে পড়িয়াছে। উঠিয়া খাড়া হইবার পূর্ব্বেই দণ্ডোদ্যত পাবলিক তাকে মুষ্ট্যাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া দিল। পুলিশ আসিল এবং হরেন্দ্রকে লইয়া হাসপাতালে যাইবে বলিয়া কলরব বাধাইল। হরেন্দ্র শুনিল না, আর-একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে চড়িয়া গৃহে ফিরিল।

তার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। কোটেও রক্ত। গায়ে ধূলা...বিশৃঙ্খল মূর্ত্তি!

সে-মূর্ত্তি দেখিয়া গৃহে রমা দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া রহিল। কি হইয়াছে?

ইজিচেয়ারে বসিয়া হরেন্দ্র কহিল,—Motor accident!

—কি করে হলো?···ওরে রঘু···শীগ্‌গির জল আন্‌! আর তুলো। আমার টেবিলের বাঁ-দিককার টানায় নীল কাগজে মোড়া ···মোড়াশুদ্ধ আনবি।

রমা পরিচর্য্যায় লাগিল। হরেন্দ্রর কোট খুলিয়া, জলে আয়োডিন দিয়া সেই জলে তুলা ভিজাইয়া কপালের রক্তর দাগ তুলিল—ইঃ! রগ বেশ কাটিয়া গিয়াছে।

হরেন্দ্রকে কহিল,—তুলোটা টিপে বসো·· আমি আস্‌চি। ওরে রঘু, শীগ্‌গির ষ্টোভ্ জ্বেলে ঐ কেট্‌লি করে জল চড়িয়ে দে। শীগ্‌গির ···কল থেকে ভালো জল ধরে আন্‌বি—সাবান দিয়ে হাত ধো··· বলিয়া সে গিয়া টেলিফোন ধরিয়া কহিল,—হ্যালো···হ্যালো···yes, Burrabazar 3044...yes, 3044...কে? 3044! ও—ডক্টর চ্যাটার্জ্জী আছেন? আছেন! তাঁকে একবার ডেকে দিন্···শীগ্‌গির। accident case.. ডক্টর চ্যাটার্জ্জী?···হ্যাঁ, আমি Mrs Sen, শীগ্‌গির আসতে হবে...accident—হ্যাঁ, ওঁর motor accident...ট্যাক্সিতেই আসুন...দেরী করবেন না। আমি ভারী nervous হয়ে পড়েচি। বাড়ীতে আর কেউ নেই তো। আয়োডিন...হ্যাঁ, আয়োডিন আর গরম জল মিশিয়ে ধুয়ে দিয়েচি। ইন্‌জেকশন দরকার হবে, বোধ হয়—পথের ধুলো কি না। আচ্ছা, দশ মিনিটের মধ্যেই আস্‌বেন। নিশ্চয়! দেরী করবেন না।

রিসিভার রাখিয়া রমা হরেন্দ্রর কাছে ফিরিয়া আসিল; কহিল, —ডক্টর চ্যাটার্জ্জীকে পেয়েচি। তিনি আস্‌চেন।

হরেন্দ্র কহিল,—তুমি পাগল হয়েচো, রমা। আয়োডিন লেপে দিলে চলতো...তা না একেবারে তিলে তাল করে তুল্‌লে!

রমার মনে দুভাবনার পাহাড় জমিয়া উঠিয়াছিল। রমা কহিল,— পথের ধূলো লেগেচে কাটা ঘায়ে। আমার এমন ভয় হচ্ছে...

হাসিয়া হরেন্দ্র কহিল,—পাছে টিটেনাস্ হয়?

রমা কহিল,—চুপ করো, বাপু। ভালো লাগে না আমার ও-রকম রসিকতা।

হরেন্দ্র কহিল,—খুব বেঁচে গেছি, রমা। যদি দুটো গাড়ীর চাপে পিষে যেতুম!...

রমার চোখ ছলছলিয়া উঠিল। সে ভীষণ দৃশ্য কল্পনা করিয়া রমা শিহরিয়া কহিল,—শিখ ড্রাইভার ছিল ট্যাক্সিতে ?

—হ্যা।

রমা কহিল,—তোমায় না বারণ করে দিয়েছি, শিখ ট্যাক্সি-ড্রাইভারের ট্যাক্সিতে চড়বে না। তারা ভারী গোঁয়ার...

হরেন্দ্র কহিল,—চুপ! ওতে defamation হয়, রমা! একজন গোঁয়ার হয়েচে বলে...

রমা তাঁর কপালে তুলা বুলাইতে লাগিল। রঘু কহিল,—জল গরম হয়েচে।

রমা কহিল,—ঐ এনামেলের বড় বাটিটা সাবান দিয়ে ধুয়ে মুছে ওটায় একটু স্পিরিট ঢাল্—ঢেলে সেটা জেলে দে...disinfect হবে।

রঘু তাই করিল। হরেন্দ্র কহিল,—তোমার উচিত ছিল হাসপাতালে নার্শ হওয়া।

রমা কহিল,—আচ্ছা, যে কাজের যা দস্তুর, তা করতে হবে তো!

হরেন্দ্র কহিল,—এতও জানো! আমি হলে উঠান থেকে একরাশ দূর্ব্বোঘাস তুলে ছেঁচে কপালের কাটা ঘায়ে টিপে দিতুম... হাঙ্গাম চুকে যেতো। এই দুঃখেই হাসপাতালে গেলুম না...কনষ্টেবলটার কি জুলুম!

রমা কহিল,—তা না গেলে আমায় সুখী করা হবে না যে! কি করে হলো এ কাণ্ড, শুনি...

হরেন্দ্র কহিল,—বলবার জন্য আমি আকুল হয়ে আছি, তুমি বলতে দিচ্ছ কৈ!

যা ঘটিয়াছিল, সেটুকুতে প্রচুর রং ফলাইয়া হরেন্দ্র বেশ একটি কাহিনী গড়িয়া বলিল।

শুনিতে শুনিতে আকাশের যত ঠাকুরকে ডাকিয়া রমা মানত করিতেছিল, হে মা কালী, হে মা দুর্গা, হে হরি, হে নারায়ণ, হে...

বাহিরের দ্বারে একখানা ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল—সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর চ্যাটার্জ্জীর স্বর—ওরে রঘু...

রমা কহিল,—যা, যা, যা রে রঘু, আগে যা, ডাক্তার বাবু এসেচেন।

রঘু ছুটিল; এবং অচিরে কক্ষে ডক্টর চ্যাটার্জ্জীর প্রবেশ।

রমা কহিল,—ভালো করে দেখুন। আর, হ্যাঁ, এ্যাণ্টিটিটানিক ইঞ্জেকশন দিতেই হবে। না হলে আমি স্থির হতে পারবো না।

ডক্টর চ্যাটার্জ্জী হাসিলেন, কহিলেন,—আগে দেখি ··

রমা কহিল,—না, না, না .পথের ধুলো! আপনারা তো বলেন, কাটা ঘায়ে পথের ধুলো মহা অনর্থ ঘটাতে পারে।

হরেন্দ্র কহিল,—আপনি ব্যবস্থা করে দিন্ ডক্টর চ্যাটার্জ্জী... গৃহিণী কাল থেকে মেডিকেল কলেজে গিয়ে ভর্ত্তি হোন্...

মুখে ম্লান হাসি—রমা কহিল,—তুমি থামো।

৪

সেবার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার ভারী ধুম। একটু সর্দ্দি. .তার পর দেখিতে দেখিতে প্রবল জ্বর, এবং চক্ষের পলক পালটিতে একেবারে নিউমোনিয়া...

রমা অস্থির হইয়া উঠিল, হরেন্দ্রকে কহিল,—আপিসে ছুটি নাও, বরং। কোথা থেকে শেষে...

হরেন্দ্র কহিল,—দাদামশায় রোজ অফিসে আসচেন।

রমা কহিল,—এই ধুলোই...

হরেন্দ্র কহিল,—তোমার এই দুশ্চিন্তাই রোগকে আগে ডেকে আনবে।

রমা শিহরিয়া উঠিল। ডক্টর চ্যাটার্জ্জী বলিতেছিলেন বটে, এ-সময় মন হাল্‌কা রাখিবে, রোগকে ভয় বা রোগের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা করিবে না...

কিন্তু কি বলিয়া মানুষ দুশ্চিন্তা দাবিয়া রাখিবে, তার হদিশ কে দিবে ?...

বাড়ীর পাশে সন্ধ্যার পর সহসা কান্নার রোল উঠিল। রঘু আসিয়া কহিল,—ওদের একটি ছেলে মারা গেল, মা...

বিস্ফারিত চক্ষে রমা কহিল,—কি হয়েছিল ?

রঘু কহিল,—ইল্‌ফুল্‌জা। দু'বুক একেবারে ভরে গেছলো, মা... নিশ্বেস নিতে পারলে না বলে মরে গেল।

রমা ভয়ে কাঠ! রঘু কহিল,--বেরামটা খুব জোর হচ্ছে...ছটুকু যে-বাড়ীতে কাজ করে, সে-বাড়ীর জামাই বাবু মারা গেছে দু'দিনের জ্বরে।

রমার পায়ের তলায় সারা দুনিয়া দুলিয়া উঠিল। সে যেন চক্ষে দেখিল, আকাশ ফাটিয়া গিয়াছে, আর তার মধ্য হইতে একটা প্রকাণ্ড রাক্ষসী দুই হাত বাড়াইয়া দুনিয়ার দিকে তীব্র বেগে নামিয়া আসিতেছে! কালো কালির মত তার বর্ণ, বিকট হাঁ.. ভয়ে রমা চক্ষু মুদিল।

হরেন্দ্র ডাকিল— কারা এসেচে, ছাখো...

রমা ভাবিল, সেই রাক্ষসীটাই তবে..

ভয়ার্ত্ত বুকে হরেন্দ্রের কাছে সে সরিয়া আসিল।

হরেন্দ্র কহিল,—একটা ট্যাক্সি থেকে কারা নামলো—মেয়ে আর পুরুষ। চিনতে পারলুম না।

—কে? বলিয়া রমা বারান্দায় ছুটিল। হরেন্দ্র ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

রমা তখনি ফিরিল; ফিরিয়া কহিল,—কাকাবাবু আর কাকিমা। তুমি বেরিয়ে এসো। দুজনে একসঙ্গে ওঁদের নিয়ে আসি।

দুই জনে গিয়া তাঁদের প্রণাম করিল। কাকাবাবু ও কাকিমা আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কাকিমা বলিলেন,—ভুনুর বিয়ে, মা...হঠাৎ ঠিক হলো। এই সামনের রবিবারে বিয়ে। পরশু গায়ে-হলুদ। তোমার না গেলে নয়।

কাকাবাবু কহিলেন,—এর আগে আসবার আর সময় পেলুম না। কাল সকালে কথা ঠিক হলো। কালই দু'পক্ষের আশীর্ব্বাদ সারা হয়েচে। তার উপর বাজার-টাজার করচি..

কাকিমা বলিলেন,—এই আমার শেষ কাজ। জামাই না গেলে আমার মনে ক্ষোভ থেকে যাবে।

কাকাবাবু কহিলেন,—তোমাদের কাজ। তোমাদেরই সব দেখে-শুনে করতে হবে মা।

রমা কহিল,—তারা কি দিচ্ছে?

কাকিমা কহিলেন,—আমরা কিছু চাইনি। মেয়েটি চমৎকার। বাপ গরীব, কেরাণীগিরি করে। দেড়শোটি টাকা মাইনে পায়। তোমার কাকাবাবু তো বলে দেছেন, মেয়েব হাতে শুধু শাঁখা। ব্যস্! তাছাড়া আব কিছু দিলে ভারী রাগ করবেন। তারা বলেছিল, বিশ ভরি সোনা, বরের ঘড়ি, ঘড়ির চেন, আংটি, বেনারসী দেবে। তা উনি বলেচেন, না, ও-সব কিছু নয়...খবর্দ্দার।

রমা কহিল,—এ কিন্তু অন্যায়। তোমরা তো চাইছো না, বাপু। তারা যদি দেয়? সামর্থ্য-মত দেবার সখ তাদের যদি হয়?

কাকাবাবু কহিলেন,—না রে, বেচারার আর একটি মেয়ে আছে; সকলেই তো ছেড়ে কথা কবে না। আমি বলে দিচ্ছি, ও সোনা-দানা রেখে দিন, ছোট মেয়ের বিয়েয় দিয়ে সাধ মেটাবেন। বরযাত্রী খাওয়ানোর খরচ আছে তো। সে খরচ এখন এমন হয়েচে যে, তাতে আর একটা বিয়ে দেওয়া চলে। কমড়োর ছক্কা, মাছের কালিয়ায় আর বরযাত্রীর মন ওঠে না—তারা চায় এখন ভেট্‌কি মাছের ফ্রাই, কাটলেট্, চপ, ওম্‌লেট্...অত নামও জানি না, ছাই, তোদের একালের খাবারের।

হাসিয়া রমা কহিল,—সবাই ভালো খাওয়াতে চায়, কাকাবাবু; তা, বৌয়ের গহনা কি বৌ এখানে এলে দেবেন? তাঁরা দান করবেন নিরাভরণা...?

কাকিমা কহিলেন,—আমি বলেছিলুম, আমাদের এখান থেকে কিছু গহনা পাঠিয়ে দাও...

বাধা দিয়া কাকাবাবু কহিলেন,—না, না। তাতে গরীবকে উপহাস করা হয়, ব্যথা দেওয়া হয়, অপমান করা হয়। মেয়ের বাপ কিছু দিলেন না, তাই আমি দানের ঘটায় তাক লাগিয়ে তাকে যেন কৃতার্থ করে দিচ্ছি!

রমা কহিল,—তোমরা কি দিচ্ছ গায়ে-হলুদে?

কাকিমা কহিলেন,—কেবল কতকগুলো পুতুলই দেবো না, খাবার জিনিষ আমি বেশী করেই দেবো। কাপড়-চোপড়, এয়ো-সজ্জা ভালোই যাবে। আর ঘী-তেল, আনাজ-তরকারী—এগুলো বেশী দি...বরযাত্রী তো অল্প যাবে না। এতে তাঁদের খরচের যতখানি সুসার করতে পারি!

আরো আলাপ চলিল। কাকাবাবু সহসা উঠিলেন, কহিলেন,—রমা, আজ কি কাল যেতে যদি না পারিস্ তো পরশু ভোরে যাওয়া চাইই। তোর না গেলে নয়, তুই গিয়ে গায়ে-হলুদের ব্যবস্থা করবি। বাড়ীর মেয়ে...বেলা নটায় গায়ে-হলুদ।

হরেন্দ্রর দিকে চাহিয়া কাকাবাবু কহিলেন,—তুমিও যাবে, বাবাজী...তোমাদেরই কাজ।

কাকিমা কহিলেন,—যেয়ো বাবা। তোমরা না দাড়ালে আমি মহা ফাঁপরে পড়বো। দু'দিন থাকলেই ভালো হয়। তোমার যদি থাকার সুবিধে না হয়, রমাকে যেন রাখতে পারি। অমত করো না।

কাকাবাবু কাকিমা আর বসিতে পারিলেন না—বহু জায়গায় এখনো যাইতে হইবে। তাঁরা উঠিলেন।

তাঁরা চলিয়া গেলে রমা কহিল,—যেতে হবে, সত্যি। না গেলে ওঁরা মনে ভারী দুঃখ করবেন।

হরেন্দ্র কহিল,—হুঁ কিন্তু আমি যাবো সেই বিয়ের দিন...

রমা কহিল,—আমি পরশু যাচ্ছি। সকালেই যাবো। অবশ্য, তোমার সব ঠিক-ঠাক করে রেখে যাবো। যাতে তোমার কোনো অসুবিধা না হয়!

হরেন্দ্র কহিল,—কাল কিন্তু কি বলেছিলে, মনে আছে?

রমার মনে পড়িল না। রমা কহিল,—কি?

হরেন্দ্র কহিল,—নলুদের নেমন্তন্ন করেচো এই রবিবারে...

রমার দুই চোখ যেন ঠিকরিয়া পড়িবে—এমন দৃষ্টিতে সে স্বামীর পানে চাহিল।

রমা কহিল,—লক্ষ্মীটি, কাল তুমি সেখানে গিয়ে ব্যাপার বুঝিয়ে নেমন্তন্ন বন্ধ করে এসো। ওদের বিয়ে চুকে যাক, তার পর আনবো। আপিস থেকে ফেরার মুখে যেয়ো! কেমন?

হরেন্দ্র কহিল,—আচ্ছা।

রমা কহিল,—কালই যেয়ো, ভুলো না।...ভালো কথা, ভুনু-দার জন্য ভালো ধুতি-উড়ানি চাই...আইবুড়ো-ভাতের তত্ত্ব। তা ছাড়া বৌ দেখবো কি দিয়ে? একখানা গহনা, কিম্বা শাড়ী...

হরেন্দ্র কহিল,—গহনাই ভালো। লালবাজারে কিম্বা রাধাবাজারে, নয় তো পার্ক ষ্ট্রীটে ঢের দোকান আছে। কিনো একটা...

রমা কহিল, কি দি, বলো তো?

হরেন্দ্র কহিল,—আমায় ও প্রশ্ন করো না। ও-দিকে আমার মূঢ়তার সীমা নেই!

রমা কহিল,—আমায় সঙ্গে নিয়ে যেয়ো কাল আপিসের পর বাড়ী এসে···কি বলো? না হলে একেবারে শিরে-সংক্রান্তি করে কোনো কাজ ঠিক নয়।

হরেন্দ্র কহিল,—তাই হবে গো, তাই...

৫

পরের দিন অফিস হইতে হরেন্দ্র সোজা গৃহে ফিরিল। বৌভাতের জন্য গহনা কিনিতে হইবে। অফিসে বাহির হইবার সময় রমা বলিয়া দিয়াছিল, রাত্রে জিনিসের জৌলুষ চেনা যায় না, তাই বেলা থাকিতে।

রমা সাজিয়া বসিয়া ছিল। হরেন্দ্র আসিতে জলখাবার ধরিয়া দিয়া কহিল,—খেয়ে নাও...দেরী করো না।

হরেন্দ্র কহিল,—কাত্তিক এসে বসে আছে বাইরের ঘরে...

কাত্তিক বন্ধু। বহুকাল পরে দেখা।

রমা কহিল,—এখন বন্ধু নিয়ে বসলে আজ আর জিনিষ কেনা হবে না।

হরেন্দ্র কহিল,—জিনিষটা না হয় শনিবারেই কিনো। সেদিন সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরবো তো .

রমা কহিল,—না, না। ও-রকম মাথায় মাথায় কাজ আমি কোনোকালে ভালোবাসি না। তা-ছাড়া নানা ঘটনা ঘটতে পারে। হয়তো কাকিমা সেদিনও যেতে বলবেন. তা-ছাড়া কত বিঘ্ন ঘটতে পারে।

হরেন্দ্র কহিল,- অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান!

রমা কহিল,—তাই। আমার মত গৃহিণী পেয়ে বর্তে গেছ! তোমায় হাতের তেলোয় রেখেচি। কোনো দিকে কিছু দেখতে হয় কখনো? আচ্ছা, সত্যি করে বলো...

...না, তা হয় না। সেজন্য আমার কৃতজ্ঞতার কি সীমা আছে!

—ভাবী খোসামুদির কথা জানো! সাহিত্য-সেবা করতে কি না!

বন্ধুবর কার্ত্তিককে খুঁজিয়া আসিতে বলিয়া হরেন্দ্র রমাকে লইয়া গহনা কিনিতে বাহির হইল

একটা দামী নেকলেশ কিনিয়া বাড়ী ফিরিল, রাত তখন আটটা বাজিয়াছে।

কার্ত্তিক বাহিরের ঘরে বসিয়া ছিল। হরেন্দ্র কহিল,- বেচারী আবার এসেচে গো। ঠিক করে একবার শুনে আসি কথাটা...

রমার কিন্তু প্ল্যান ছিল, কাল সকালেই নিমন্ত্রণে যাইবে, কি সাজে সাজিবে, কোন্ শাড়ীখানা পরিবে, কি গহনা...তার বিশদ আলোচনা জুড়িয়া দিবে। সে আলোচনায় কত মান-অভিমান—সেই সঙ্গে স্বামীর মুখের সেই কথা—কেন গা, সেই লাল শাড়ীটা তুমি কেন পরচো না? লাল শাড়ীতে তোমায় তো খাশা মানায় ..

স্বামীর মুখে রূপের এই স্তুতিটুকু শুনিবার জন্য মন তার আজো তেমনি কাঙাল রহিয়া গিয়াছে !

হরেন্দ্র বাহিরের ঘরে যাইতেছিল, রমা কহিল,—নলুদের বাড়ী যাওনি ?

বিবর্ণ মুখে হরেন্দ্র কহিল,—ঐ যাঃ ! সে যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে ! কহিল,—কখন যাবো, বলো ? অফিস থেকে সটান বাড়ী ফিরতে বলেছিলে, ফিরেই নেকলেশ কিনতে গেলুম...

অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া রমা কহিল,—তুমি না বলেছিলে, ও ভারটুকু নেবে ! আমি কি লোক পাঠাতে পারতুম না ?

হরেন্দ্র কহিল,—যাবো, ভেবেছিলুম ! কিন্তু তোমার গহনার জন্যই না .

রমা কহিল,—বেশ,...নলুরা এসে ফিরে যাক...আমি ব্যাভ্রম হই !

হরেন্দ্র কহিল,—আচ্ছা, আমি এখনি যাচ্ছি

রমা কহিল,—এখনি যাবে কি করে ? তোমার কে বন্ধু এসে বসে আছেন...

হরেন্দ্র বুঝিয়াছিল ! এইখানেই রমার যত বাধে ! বন্ধুরা মাতাল, না কি, যে তাদের সংসর্গে হরেন্দ্র সময় কাটাইবে, রমা যেন তা বরদাস্ত করিতে পারে না...হরেন্দ্র বোঝে না ! অথচ তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনে মুখোমুখি বসিয়াও সময় কাটায় না !...

হরেন্দ্র ভাবিল, নারী-চরিত্র রহস্যময় বটে ! সে কহিল,—আমি নলুদের ওখানেই তা হলে চললুম গো, ওদের খপর দেওয়া উচিত ।

রমা কহিল,—বেশী রাত করো না যেন । আজ ঠাকুর আবার ছুটি চেয়েছিল একটু সকাল-সকাল যাবে । ওর দেশের কে এসেচে, কালই দেশে যাবে...

—আচ্ছা। বলিয়া হরেন্দ্র নামিয়া গেল।

কার্ত্তিক কহিল,—ব্যাপার কি হে? আমি এসে বসে আছি কখন্ থেকে! বহু সাধনার ধন হয়ে উঠেচো, আজ-কাল! দেখা পাওয়া প্রায় অসম্ভব!

হরেন্দ্র কহিল,—কাজের ঝঞ্ঝাট ভাই, লোক-লৌকিকতা-রক্ষা। এসো···একবার যাবো এখন সেই গড়পারের দিকে..

ড্রাইভার গাড়ী আনিল। হরেন্দ্র কার্ত্তিককে লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

কার্ত্তিক কহিল,—আমাদের নতুন বাড়ী তৈরী হয়ে গেছে। গৃহ-প্রবেশও হয়েচে। সেজন্য কাল একটা পিক্‌নিক হচ্ছে,...সারাদিন আমোদ-প্রমোদ, খাওয়া-দাওয়া··· পুরোনো বন্ধু-বান্ধবে মিলে আমাদের বাগানেই পিক্‌নিক্...

হরেন্দ্র কহিল,—সেই বেলগেছেয়...?

—হ্যাঁ।

হরেন্দ্রর মনে পূর্ব্বস্মৃতি উথলিয়া উঠিল, তার বিপুল সৌন্দর্য্যে, অপরূপ মাধুর্য্যে,—মাছ ধরা, গান-বাজনা, গাছে চড়া, খাওয়া দাওয়া, রঙ্গ-রহস্য···জীবনে মুক্তির সে কি অবাধ ধারা বহিত!

কার্ত্তিক কহিল,—তোমার যাওয়া চাই, নিশ্চয়।

হরেন্দ্র কহিল,—আমার যে অফিস···

—দাদাশ্বশুরের অফিস্...ছুটি নিয়ো। একদিন বৈ তো নয়।

হরেন্দ্র ভাবিল, একদিন একটু ছুটি! ঠিক! সুবিধাও আছে।

রমা যাইবে তার কাকাবাবুর বাড়ী। সে জানিবে না...অফিস-কামাই রমা সহিতে পারে না। তার গৃহিণীপনা ভারী কড়া।...

নলুর বাড়ী গড়পারে। নলু হরেন্দ্রর মাসতুতো বোন্; গড়পারে শ্বশুরবাড়ী। হরেন্দ্রর মেসো থাকেন হাজারীবাগে। মাসখানেক হইল নলু সেখান হইতে শ্বশুর-গৃহে আসিয়াছে। হরেন্দ্র ও রমাকে নলু ভারী ভালোবাসে!

কার্ত্তিক কহিল,—আমি তা হলে গড়পারে গিয়ে কি করবো? আমায় সেই সুকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়ে নামিয়ে দিয়ো...

হরেন্দ্র কহিল,—বসো না, ব্রাদার। সেখানে আমার পাঁচ মিনিট মাত্র সময় লাগবে। তার পর মাঠের দিকে একটু যাবো'খন—কতদিন পরে মুক্তি!

—বেশ।

কার্ত্তিকের নামা হইল না।

গড়পারে হরেন্দ্র কথা ঠিক রাখিল, পাঁচ মিনিটেই ফিরিল; ফিরিয়া ড্রাইভারকে কহিল,—ময়দান চলো।

সোজা আসিয়া কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে গাড়ী বাঁকিল।...এই পথ দিয়া সিধা একেবারে ময়দান...

বায়োস্কোপের সামনে ভারী ভিড়। গাড়ীতে গাড়ীতে পথ প্রায় বন্ধ।

কার্ত্তিক কহিল,—উঃ, কত দিন যে বায়োস্কোপে যাইনি! কি ফিল্ম হচ্ছে? এত ভিড়?

হরেন কহিল,—টকি দেখেচো? খাড়ি, শুনেচো?

—না। কেমন?

—খাশা। আমি একবার গিয়েছিলুম।

কার্ত্তিক কহিল,—আজ আছে?

হরেন্দ্র কহিল,—দেখি·· ড্রাইভারকে কহিল—এম্পায়ারমে চলো।

এম্পায়ারের সাম্নে ঐ যে মস্ত প্লাকার্ড...শো-বোট !

হরেন্দ্র কহিল,—যাবে ? শো-বোট, না, গানের নৌকা ! splendid !

কার্ত্তিক কহিল,—চলো...

উৎসাহের আতিশয্যে হরেন্দ্রর মন হইতে দুনিয়া, ঘর, সংসার, রমা, বামুন-ঠাকুর সব অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। বহু দিন পরে পুরানো বন্ধুর সঙ্গ...পুরানো স্মৃতির উগ্র বিহ্বল নেশা জাগিয়াছিল !...

টকির পূর্ব্বে ছোট একটা ফিল্মে ঘর-সংসারের ছবি ছিল। নিজের ঘরেরই যেন ছোট্ট একটু ফটো ! সে ছবি দেখিয়া হরেন্দ্রর সহসা খেয়াল হইল, রমা বলিয়াছিল, শীঘ্র ফিরিতে···বামুন-ঠাকুর ছুটি চাহিয়াছে !

কিন্তু কি বলিয়া এখন ওঠে ?...রমা রাগ করিবে ! অভিমানিনী রমা ! হরেন্দ্রও নিরুপায় ! আর এক ঘণ্টা, না হয় দেড় ঘণ্টা বড় জোর ! দেরী যা হইবার, তা তো হইয়াছে !...

ফিল্ম দেখিয়া কার্ত্তিককে স্ট্রকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়ে নামাইয়া হরেন গৃহে ফিরিল। স্তব্ধ গৃহ যেন রমার অভিমানের স্পর্শে গৃহও অভি-মানে গুম্ হইয়া আছে !

হরেন্দ্র বিমূঢ়ের মত ঘরে আসিয়া ঢুকিল। রমা বিছানায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, খাটের পাশে সেই মশা-মারী ক্যাটিলের ধোঁয়া ! রমার বুকের উপর একখানা বাঙলা নভেল। রমাকে জাগাইতে হরেন্দ্রর সাহস হইল না। ঘরের মেঝেয় আসন পাতা ছিল, ঢাকা-চাপা খাবার—মুখ-হাত ধুইয়া সে আসনে বসিল। এ কি...এ যে দুজনের খাবার ! রমা তবে খায় নাই ? মুস্কিল বাধিল।

হরেন্দ্র নিজের ভাগটুকু শেষ করিয়া উঠিল, উঠিয়া মুখ-হাত ধুইল ; তার পর রমার অধরপুটে ধীরে ধীরে

চমকিয়া রমা জাগিয়া উঠিল, কহিল,—আঃ...

হরেন্দ্র কহিল,—খাও গো। অনেক রাত হয়েচে যে। না খেয়ে ঘুমোয় এমন...

রমা স্থির দৃষ্টিতে হরেন্দ্রর পানে চাহিল, কহিল,—তোমার খাওয়া হয়েচে?

—হয়েচে।

রমা পাশ ফিরিয়া শুইল। হরেন্দ্র অপরাধ-কুণ্ঠিত স্বরে কহিল,—খাবে না?

—না।

—রাগ করেচো? কি করবো, বলো? নলুরা কিছুতে ছাড়ে না... কত গল্প করছিল! খেতে বলেছিল, তা খাইনি। বললুম, না, তুমি বসে আছো। কাল সকালেই আবার বেরুতে হবে...

রমার গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর হইল। রমা কহিল,—কোনো কৈফিয়ৎ তো আমি চাইনি। কেন শুধু-শুধু এত মিথ্যা কথা বলচো...

—মিথ্যা কথা! হরেন্দ্র গর্জ্জিয়া উঠিল!

রমা কহিল,—নয়? নলুরা এখানে এসেছিল তোমার ওখান থেকে চলে আসবার পরেই। তুমি সেই নেকলেশটা ওখানে ফেলে এসেছিলে...সেটা নিয়ে...

নেক্‌লেশ! ওঃ, ঠিক! সেটা হরেন্দ্রর পকেটে ছিল। নেক্‌লেশের কথা সেখানে উঠিয়াছিল, নলু দেখে, তার পর তার শাশুড়াকে দেখাইতে যায়, অবশেষে তাড়ার মুখে নেকলেশের কথা ভুলিয়া জামাইয়ের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে হরেন্দ্র আসিয়া মোটরে চড়ে। এবং এম্পায়ারে

সেই নেকলেশ..। লজ্জায় হরেন্দ্র একেবারে এতটুকু হইয়া গেল।

কোনো কথা না বলিয়া নিঃশব্দে সে বিছানায় শুইয়া চক্ষু মুদিল।

৬

পরের দিন সকাল-বেলা : সাতটা বাজিয়াছে হরেন্দ্র তখনো বিছানায় পড়িয়া। রমার ব্যস্ততার সীমা নাই। এ-দিককার ব্যবস্থা পাকা করিয়া তাকে এখনি ছুটিতে হইবে কাকাবাবুর বাড়ী। তাকেই গিয়া গায়ে-হলুদের তত্ত্ব সাজাইতে হইবে।

বেশভূষা করিবার জন্য রমা আসিয়া ঘরে ঢুকিল; হরেন্দ্রকে বিছানায় দেখিয়া কহিল, ব্যাপার কি! আজ আর উঠতে হবে না?

হরেন্দ্রর মনে একটা অভিসন্ধি তাল পাকাইতেছিল কার্ত্তিকের বাগানে পিক্নিক্...বন্ধুর দল. অফিসে ছুটিটা কি করিয়া...

রমা একে রাগ করিয়া আছে! কাল রাত্রে ঐ অপরাধ, তার উপর আজ অফিস কামাই করিলে···দাদামশায়ের আদর্শ রমার মনে এমন গাঁথিয়া আছে যে, তার এতটুকু এদিক-ওদিক হইবার জো নাই! স্ত্রৈণ হওয়ায় আনন্দ থাকিলেও বিপদও বড় অল্প নয়!...স্বাধীনতাকে এতখানি সে খর্ব্ব করিয়াছে...এ তার খেয়াল ছিল না।

রমা কহিল,—কাল থিয়েটার দেখা হয়েছিল, বুঝি?

হরেন্দ্র কহিল,—থিয়েটার! তুমিই বলো...বাঙলা থিয়েটারে আমি কখনো যাই?

রমা কহিল,—বায়োস্কোপ গো, বায়োস্কোপ!...

হরেন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল। রমা কহিল,—ভোরেই একটা মিথ্যা কথা বলে দিনটাকে কালি-মাখা করে তুলো না।

হরেন্দ্র থামিল। পরে কহিল,—শরীরটা কেমন ম্যাজ-ম্যাজ করচে ! গলায় এমন ব্যথা...কফ জমে রয়েচে। গলার সে পেণ্টটা আছে ? মাথাও একটু ধরেচে দেখচি। হুঁ !

মাথা ধরা, গলায় ব্যথা...রমা প্রমাদ গণিল। রমার সাহস দুর্জ্জয়, রমা তা জানে। ঘরে চোর-ডাকাত, বা পথে গোরা, মাতাল দেখিলেও ভয়ে তার বুক দমিতে জানে না...কিন্তু রোগ, বিশেষ হরেন্দ্রর···তাব সূচনা জাগিবা মাত্র শঙ্কায় তার বুক একেবারে ভরিয়া ওঠে। রমা আসিয়া হরেন্দ্রর কপালে হাত দিল। কহিল,—কৈ, গা তো গরম নয়।

—না। ভিতর কিন্তু পুড়ে যাচ্চে যেন। মুখটাও কেমন বিস্বাদ ! গলাটা ভ্যাখো তো...

রমা একেবারে বসিয়া পড়িল, কহিল,—ডক্টর চ্যাটার্জ্জীকে খপর দি...

হরেন্দ্র কহিল,—না। পাগল হয়েচো তুমি ! জেনাস্প্রিন্ দাও ..আব ঐ স্প্রে...আর গলার পেণ্ট !

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে বমা হবেন্দ্রব পানে চাহিয়া রহিল ; পরে কহিল,—গায়ে-হাতে ব্যথা আছে ?

গা মুড়িয়া ভাঙ্গিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া হরেন্দ্র কহিল,—একটু যেন কেমন ব্যথা বোধ কবচি—তবে সামান্যই।

রমার মন অশ্রুর বাষ্পে ভরিয়া উঠিল। সে কহিল,—বিচিত্র নয়...রাতে ঠাণ্ডা লাগিয়েচো।. এই চারিদিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্চে···নাঃ, তোমার জন্য মাথামুড় খুঁড়ে মরবো আমি। এত সাবধানে রাখি···

কবে সেই বায়োস্কোপে-দেখা হাসপাতালের এক করুণ দৃশ্য রমার চোখেব সাম্নে জ্বল্-জ্বল্ কবিয়া ফুটিয়া উঠিল। রমা একটা নিশ্বাস ফেলিল। হতাশ্বাসে সে শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িল।

হরেন্দ্র কহিল,—বসলে যে···যাবে না ?

—কি করে যাই ? এমন শত্রুতা সেধে বসলে

সর্ব্বনাশ ! হরেন্দ্র কহিল,—এ কিছু নয়। তুমি যাও। আমি সাবধানে থাকবো'খন ...অফিসে নয় যাবো না······

রমা স্বামীর পানে চাহিয়া কহিল,—তাই করো। আপিস যেয়ো না—সেই ভালো। স্প্রে-টা দি। নাও..জেনাস্প্রিন্ খাও। আর একটু চা। খুব বেশী খিদে হলে ওভালটিন্ খেয়ো, আর কিছু নয়। আমি রঘুকে বলে দিয়ে যাই।...কি করবো ? একবার যেতেই হবে—না গেলে নয়, তাই ! তা যত শীগ্‌গির পারি, ফিরে আসবো। লক্ষ্মীটি, বিছানা ছেড়ে উঠো না...আমি তোমার মুখ ধোবার বন্দোবস্ত করে দি। তার পর চা খাইয়ে তবে যাবো...

তাহাই হইল। রমা বারবার নিষেধ করিল,—আপিসে যেয়ো না আজ। আর বিছানা থেকে নড়ো না...লক্ষ্মীটি...আমার কথা রাখবে ? বলো...

—তাই হবে।—হরেন্দ্র আশ্বাস দিল,—বিছানা ছেড়ে উঠবো না ··

ভৃত্য-পরিজনকে খুব হুঁশিয়ার সচেতন করিয়া রমা নিমন্ত্রণে বাহির হইল। ঘড়িতে তখন আটটা বাজিতেছে।...

ন'টা বাজিলে হরেন্দ্র সাজিয়া বাহির হইল। রঘু অবাক্ ! হরেন্দ্র কহিল,—বড্ড কাজ আছে রে. একবার বেরুতে হবে। ডাক্তার বাবুর ওখানে যাবো, একটা ট্যাক্সি ডেকে দে চট্ করে...

ট্যাক্সি আসিলে সেই ট্যাক্সিতে চড়িয়া হরেন্দ্র বাহির হইয়া গেল।

রমা কিন্তু সেখানে প্রমাদ গণিতেছিল। কেন, খুলিয়া বলি।

গায়ে-হলুদের উৎসবে আত্মীয়-কুটুম্ব জমিয়াছিল অনেকগুলি। তত্ব চলিয়া গেলে তাঁদের গল্প জমিল এই ইনফ্লুয়েঞ্জা লইয়া...যেমন ভয়ঙ্কর রোগ, তেমনি তার নানা উপসর্গ...

বলাইবাবুর গৃহিণী বলিতেছিলেন,—সেবারে যখন ঐ রোগ এলো···আমরা তখন পাটনায়। কি কাণ্ড, বাব্বাঃ! আমার চোখের সাম্নে যা ঘট্লো! আমাদের পাশের বাড়ীতে গদাধর বাবুরা থাকতো ...তা, কর্ত্তার হলো ঐ অসুখ। বিছনায় থাক্বে না...ঘরে নয়... বাইরে যেতে চাইবে। পাহারায় কড়াক্কড় পড়লো। বিকারের ঝোঁক আর কি! শেষ রাত্রে সকলে যখন ঘুমে অচেতন, তখন কর্ত্তা সেই রোগের ঝোঁকে ওপর থেকে নেমে গিয়ে রান্নাবাড়ীর কাছে যে পাৎকো-তলা, সেখানে গেছে। সকালে লোকজন এসে দেখে—প্রাণ নেই! প্রাণটুকু কখন্ বেরিয়ে গেছে, কেউ জানেও না! ডাক্তার এসে বল্লে, এ রোগে ভেতর যেন জ্বলে যেতে থাকে...সেই জ্বালার চোটে আর কি...সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

হাবুর মা কহিলেন,—যা বলেচো, দিদি! আমাদের পাড়ার ঐ হালদারদের ছেলেটার কি হলো? জোয়ান বয়েস···এই পোড়া রোগ ধরলো। গায়ের জ্বলুনির চোটে বাড়ী ছেড়ে পাড়া ছেড়ে ছেলে হেদোর জলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ..দিনে দুপুরে গো! আহা! দিন-রাত পাখা চালিয়ে চালিয়ে মা-মাগীর সবে একটু তন্দ্রা এসেছিল..

কথাগুলা রমার কাণে প্রবেশ করিতেছিল। রমার মন একেবারে আকুল হইয়া উঠিল। এমন লক্ষণ! হরেন্দ্রও যে বলিতেছিল, গায়ের ভিতর যেন জ্বলিয়া যাইতেছে! যদি ঐ জ্বালার চোটে ..?

সে উঠিয়া পড়িল। তার গৃহে কি ঘটিতেছে, কে জানে!

অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল! কাকিমার কাছে গিয়া সে কহিল,—আমি এখনি বাড়ী যাবো কাকিমা, ওঁর অসুখ দেখে এসেচি।

কাকিমা কহিলেন,—সে কি মা ..নেমন্তন্নর মেয়েরা সব আস্‌চে! তুমি বাড়ীর মেয়ে...

রমা কহিল,—আমার মন সুস্থির হচ্ছে না কাকিমা, আমি বাড়ী যাই। যদি দেখি, ভালো আছেন, তা হলে সেই ওবেলায় আবার আস্‌বো...

—তাই তো মা—জামাইয়ের অসুখ···জোর করে থাকতে বলতেও পারচি না। তবে আসিস্‌ মা. ঠিক···না এলে আমার মরা-মুখ দেখ্‌বি ..

—তাই, তাই, তাই হবে, কাকিমা...

রমা বাহির হইয়া পড়িল। সারা গাড়ী বুকে ধুকপুকানির অন্ত নাই! সে শুধু ডাকিতে লাগিল—হে মা কালী, হে হরি, গিয়ে যেন দেখতে পাই...

এত ডাকা সত্ত্বেও কিন্তু হরি বা কালী মুখ তুলিয়া চাহিলেন না। গৃহে ফিরিয়া রমা দেখে, সর্ব্বনাশ! হরেন্দ্র গৃহে নাই! কোথায় রে? রঘু কহিল, ডাক্তার বাবুর বাড়ী যাইতেছেন বলিয়া বাহির হইয়াছেন···

বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে...এখনো ডাক্তার বাবুর বাড়ী? বলিস্‌ কি রে হতভাগা? রমা কাঁদিয়া ফেলিল। রঘুকে বলিল,—যা, যা, গাড়ী নিয়ে ছোট্‌ সব বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী।...তারা কেউ আসে নি?

—না মা! কেউ আসে নি।

—কিসে বেরুলেন?

—আমায় ট্যাক্সি ডেকে দিতে বললেন। আমি ডেকে দিলুম। সেই ট্যাক্সি করে...

রমার চোখ কপালে উঠিল। আর্ত্ত স্বরে সে কহিল,—ওরে যা, যা, যা,—চারিদিকে সন্ধান কর্ ..বাবুর খোঁজ যে নিয়ে আস্বে, তাকে এই গলার হার বকশিস দেবো...

রমা গলার হার দেখাইল। অফিস? না অফিসে যাইবেন না বলিয়া তো সে নিজেই দাদামশায়কে ফোন্ করিয়া দিয়াছে। তবে? কোথায়? কোথায় গেলেন?

ওগো, রাগ করিয়া গেছ? লুকাইয়া জব্দ করিবে? কালিকার সেই রূঢ়তার পাপে? না, না,...এসো, ফিরিয়া এসো গো! তোমার দুপায়ে ধরিয়া মাপ চাহিতেছি।

রমা গিয়া ঠাকুর-ঘরে পড়িল। রাধা-কৃষ্ণের একখানি ছবি দেওয়ালে ঝুলিতেছিল। সেই ছবি মাথায় ঠেকাইয়া বুকে ছোঁয়াইয়া আকুল আর্ত্ত স্বরে রমা ডাকিল,—হে হরি, আমার সর্ব্বনাশ করো না. রক্ষা করো...তাঁকে এনে দাও, এনে দাও, ঠাকুর...আমি তাঁর দাসী, দাসীর মত তাঁর পায়ের তলায় মিশে থাকবো!...

লোক-জন ওদিকে হিমসিম খাইয়া গেল...দাদামশায় আসিলেন, দিদিমা আসিলেন; কাছাকাছি হরেন্দ্রর যে ক'জন বন্ধু ছিল, তারাও আসিল। সন্ধান চলিল বিষম বেগে। শেষে থানায় অবধি খবর গেল। থানা হইতে হাসপাতালে-হাসপাতালে টেলিফোন, লোক ছোটা...তবু হরেন্দ্রর কোনো পাত্তা নাই!

রমা কাঁদিয়া দাদামশায়ের পায়ে পড়িল—দাদামশায়...

দিনের আলো নিবাইয়া সন্ধ্যা আসিয়া ক্রমে নীরবে ধরণীর দ্বারে দাঁড়াইল। স্তব্ধ গৃহ ভীষণ অমঙ্গলের কথা ভাবিয়া যেন শিহরিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে! দাসী-চাকরের দল নীরব। বহু সন্ধানেও হরেন্দ্রর পাত্তা পাওয়া যায় নাই! হাল ছাড়িয়া আবার নূতন করিয়া

হাল ধরার উদ্যোগ চলিয়াছে! সকলে অবাক্! মানুষ কখনও এমন-ভাবে উবিয়া যায়!

রমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বাড়ীময় মহা সোরগোল! দ্বারে ডক্টর চ্যাটার্জ্জীর মোটর অবধি আসিয়া উপস্থিত!...

হঠাৎ একখানা ট্যাক্সি। ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া হরেন্দ্র গাড়ী হইতে নামিল, ডাকিল,—রোঘো!...

অন্দরে রঘু এ-ডাক শুনিল, শুনিয়া পাগলের মত ছুটিয়া বাহিরে আসিল।

হরেন্দ্র কহিল,—গাড়ী থেকে ঐ মাছটা নামিয়ে নে...

মস্ত একটা কাৎলা মাছ। মাছ ও বাবুকে দেখিয়া রঘুর চক্ষুস্থির! হরেন্দ্র কহিল,—নে মাছ .এই যে ডাক্তার চ্যাটার্জ্জীর গাড়ী! বাঃ! ভালোই হয়েচে। ওঁকে মুড়োটা দিবি। উনি কাৎলা-মাছের মুড়ো ভারী ভালোবাসেন। কিন্তু ব্যাপার কি রে? বাইরে আলো জ্বলে নি...তোর মাঠাকরুণ ফেরেনি এখনো?...

রঘু কোনো কথা কহিল না। হরেন্দ্র অন্দরে প্রবেশ করিল—একতলায় জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই!

সে দোতলায় উঠিল, পিছনে রঘু। রঘুর হাতে কাৎলা মাছ! তার ঘরের সামনে বারান্দায় লোকারণ্য! দিদিমা বারান্দায় আসিতেছিলেন, হরেন্দ্রকে দেখিয়া কহিলেন—এই যে হরেন্দ্র ..

হরেন্দ্র কহিল,—ব্যাপার কি দিদিমা? কারো অসুখ না কি?

দিদিমা কহিলেন,—বাড়ীতে অসুখ নয়।

—তবে? ঐ যে ডক্টর চ্যাটার্জ্জী ..

হরেন্দ্র কহিল,—আপনার পয়ে আজ কত বড় কাৎলা গেঁথেছি, দেখুন! সারা দিন ছিপ নিয়ে কম কশরৎ করেচি...কার্ত্তিকদের পুকুরে। ওঃ...কিন্তু...

ডাক্তারের মুখে হাসি! হরেন্দ্র ভালো করিয়া চাহিয়া দেখে, সোফায় বসিয়া রমা...অবসন্ন মূর্ত্তি! আর তার পাশে দাঁড়াইয়া দাদামশায়...

হরেন্দ্র কুতূহলী দৃষ্টিতে চাহিল, না, কারো অসুখ নয় তো! দাদামশায় হাসিতেছেন।

দাদামশায় কহিলেন,—ঐ ছাখ্ রমা...

রমা চাহিয়া দেখে, ভুনিয়া আবার ধীরে ধীরে আঁধারের পর্দ্দা ঠেলিয়া তার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। সেই সঙ্গে হরেন্দ্রর মুখও...

রঘুর হাত হইতে মাছটা লইয়া হরেন্দ্র তুলিয়া ধরিল, কহিল,—দেখেচো রমা, কত বড় কাৎলা গেঁথেচি আজ...ছিপে, একলা!

এমন বিপদ! তা সত্ত্বেও ঘরের মধ্যে হাসির রোল উঠিল। হরেন্দ্র সে-হাসির অর্থ বুঝিল না; কাৎলা-মাছ-হাতে বিস্ময়-বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

—

এক পশলা

দু'মাস রোগে ভুগিবার পর সারিয়া শরীরে একটু বল পাইতে শ্রীশ গেল এলাহাবাদে হাওয়া বদলাইতে। এলগিন্ রোডে বন্ধু দীননাথের বাড়ী। দীননাথ এলাহাবাদের উকিল। তার গৃহে গিয়া সে উঠিল।

পনেরো দিনে শরীর মজবুত হইয়া উঠিল। খুশী-মনে শ্রীশ বলিল,—এবার দেশে ফেরা যাক্।

সেও নূতন উকিল, মক্কেলের পয়সার সদ্য স্বাদ পাইয়াছে। তাদের কথা মনে হইলেই বুক হু-হু করিয়া ওঠে—ভাবে, আর পাঁচটা উকিল বুঝি মক্কেলদের সব পয়সা লুটিয়া লইল!

দীননাথ কহিল,—এখনো দিন পনেরো ও-কথা মুখে উচ্চারণ করো না। নিঝ্ঝাটে আরো কিছু দিন কাটিয়ে তবে...না হলে আবার ডিগবাজী খেয়ে পড়া বিচিত্র নয়।

শ্রীশ কহিল,—বেশ।

কোনো কাজ ছিল না। সকালে দীননাথ মক্কেল লইয়া বসিত, শ্রীশ বেড়াইতে বাহির হইত। ঘুরিয়া এলাহাবাদের ম্যাপখানাকে সে একেবারে রপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। কোথায় কোন্ মাঠে কোন্ ফশল বোনা হইতেছে, কোন্ মাঠ খালি—অনায়াসে সে বলিয়া দিতে পারে! বেড়ানো কি অল্প? পাঁচ সাত মাইল—সে অতি তুচ্ছ ব্যাপার! শ্রীশ অবাক্ হইয়া ভাবিত, তার পা দু-খানায় চলার এমন শক্তি ছিল, অথচ কলিকাতায় মোটর ছাড়া চলিবার কল্পনায় সে গলদ্ঘর্ম্ম হইত! হ্যারিসন রোডের মোড় হইতে বহু-বাজারের মোড়ে

যাইতে গাড়ী চাই! ট্রাম—ট্রামই সই! শ্রীশ স্থির করিল, এবার কলিকাতায় ফিরিলে আর জবুথবু থাকা নয়—দু'বেলা টানা পাড়ি…

সেদিন ত্রিবেণী ঘুরিয়া দারাগঞ্জের দিক্ দিয়া সে ফিরিতেছিল। পথ যে খুব জানা, তা নয়। তবে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন হোক পৌঁছাইলেই হইল! কোনো রকম তাড়া যখন নাই!...

বেলা প্রায় দশটা বাজে। আষাঢ় মাস। দেশটা বাঙ্লা নয়—কাজেই আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নাই। রৌদ্রের এমন তেজ যে, বাবু-লোক তাহাতে ঝল্সাইয়া ওঠে! শ্রীশ নাকি নূতন স্বাস্থ্যসঞ্চয় করিতেছে, তায় সম্প্রতি মনে একটা গর্ব্ব জন্মিয়াছে যে, হাঁটায় তাকে কাবু করিবে, এমন রৌদ্র এলাহাবাদে নাই! তাই ……

দু'ধারে মাঠ। মাঝে মাঝে গরিবের বস্তী। শ্রীশ সেই পথে চলিতে চলিতে দেখে, এক প্রকাণ্ড বাদাম গাছের তলায় এক প্রৌঢ়া নারী বসিয়া ধুঁকিতেছেন। তাঁর পাশে একখানি গামছায় বাঁধা তরি-তরকারী। মোটটি নেহাৎ হাল্কা নয়! নারী বাঙালী। চেহারা দেখিলে ভদ্রঘরের বলিয়া মনে হয়, তবে সে-ঘর তেমন অবস্থাপন্ন নয়। অবস্থা ভালো হইলে কি আর এই রৌদ্রে একলা তরকারীর মোট বহিয়া পথ চলেন? এটা শ্রীশের অনুমান। নারী সধবা—তাঁর পরণে চওড়া লালপাড় শাড়ী, সীমন্তে সিন্দূরের উজ্জ্বল বিন্দু টক্টক্ করিতেছে।

শ্রীশ থমকিয়া দাঁড়াইল। কাছাকাছি কোনো বাঙালীর বাড়ী দেখিয়াছে বলিয়া তার মনে হইল না। রমণীকে সে প্রশ্ন করিল,—আপনি এখানে এমন বসে কেন, মা?

বয়সে তরুণ হইলেও শ্রীশের এটুকু জ্ঞান ছিল যে, অপরিচিতা প্রৌঢ়াকে 'মা' বলিয়া না ডাকা সমীচীন হইবে না। এ-ডাক একেবারে

তাঁর মর্ম্মে গিয়া পৌছিবে। নারী কহিলেন,—বড্ড গরম লেগেচে, তাই।

শ্রীশ কহিল,—একখানা এক্কা ডেকে দেবো? আপনার বাড়ী যাবেন?

নারী কহিলেন,—না বাবা, এক্কায় চড়তে পারবো না। শেষে বুড়ো বয়সে অপঘাতে মরবো কি?

শ্রীশ কহিল,—তা হলে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। এধারে ঘোড়ার গাড়ী মিলবে বলে মনে হয় না। আপনার বাড়ী কোন্ মহল্লায়?

নারী কহিলেন,—নাম জানি না বাবা। এসেছিলুম আরো ক'জনের সঙ্গে ত্রিবেণীতে। চান করে বটুকনাথের মাথায় জল দিতে গিয়ে দেখি, দিব্যি তরকারী রয়েচে, টাট্‌কা, আর বেশ শস্তা। বাজার থেকে খোট্টা চাকর যে তরকারী আনে—কোনো ছিরি-ছাঁদ থাকে না। তাই ভাবলুম, কিনে নিয়ে যাই। কিনে-কেটে এসে দেখি, সবাই চলে গেছে। কাকেও পেলুম না। তাই একলা ফিরছিলুম।

শ্রীশ কহিল,—এ পথ আপনি চেনেন?

নারী কহিলেন,—না. বাবা।

শ্রীশ কহিল,—তা হলে যাবেন কি করে? মহল্লার নাম জানেন না! কার বাড়ী বলতে পারবেন? তা হলে নয় চেষ্টা করে দেখি।

নারী কহিলেন,—কার নামই বা করবো! যার বাড়ীতে এসে উঠেচি—না, তার নাম তো জানি না।

শ্রীশ কহিল,—তা হ'লে আমি অপেক্ষা করি। আপনি জিরিয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে চলুন। আপনি পথ হারিয়েচেন, দেখচি। রোদ্দুর এই ঝাঁজ—তায়...

নারী কহিলেন,—জিরিয়েচি বাবা···যেতে পারবে'খন। তবে আমার এই পুঁটলিটি যদি কেউ··

শ্রীশ কহিল,—বেশ. ওটা আমার হাতে দিন্। পথে চল্‌তে যদি বাড়ী মেলে, ভালো—না হলে আমার ওখানেই উঠবেন। তারপর... কারো নাম এখানে জানেন না ?

নারী কহিলেন,—না বাবা, আমরা 'এসেচি হালিসহর থেকে। হুগলির কাছে হালিসহর, জানো ? সেই হালিসহর।

শ্রীশ কহিল,—হালিসহর জানি, আমার বাড়ী কলকাতায়। আসুন তা হলে···এই ছাতার মধ্যে। না হলে যে রোদ...

নারী একটু সলজ্জভাবে কহিলেন,—মেয়েমানুষ, ছাতা মাথায়... না বাবা...

শ্রীশ কহিল,—এখানে কে-বা বাঙালী আছে ! ছেলের ছাতায় মা যাবেন,—

শ্রীশের কথাগুলা বড় মিষ্ট, তার প্রাণে দরদ আছে, মায়াও বিলক্ষণ ! নারী সে-কথায় বিগলিত হইলেন। ভাবিলেন, ক্ষতি কি ! যে-রৌদ্র...ছাতা নহিলে মাথা রাখা দায় !

শ্রীশ তাঁর তরকারীর পুঁটলি হাতে লইল, লইয়া কহিল, --আসুন তা হলে।

নারী ধীরে ধীরে শ্রীশের সঙ্গে চলিলেন।

২

অতি-কষ্টে প্রায় এক ঘণ্টা চলিবার পর ডান দিকে মস্ত ফটকওয়ালা পুরানো এক দোতলাবাড়ী। নারী কহিলেন,—এই বাড়ী বাবা।

শ্রীশ বাহির হইতে লক্ষ্য করিল, এ-বাড়ীতে লোকজনের বাস আছে কি ? সামনের পথে অমন জঙ্গল—রেলিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে মাকড়সার প্রকাণ্ড জাল...একতলার ঐ বারান্দার দেওয়ালে সবুজ স্যাঁতানি...দেওয়ালের গা ফুঁড়িয়া ঐ-সব চারা গাছ গজাইয়াছে ! সবিস্ময়ে শ্রীশ বলিল,—এই বাড়ী...?

—হ্যাঁ বাবা। বলিয়া ফটকের পাশে উঁচু চাতালের উপর নারী বসিয়া পড়িলেন।

শ্রীশ কহিল,—বড্ড কষ্ট হচ্ছে ? তা, আর এই একটুখানি...

নারী কোনো কথা না বলিয়া চক্ষু মুদিলেন। তাঁর মুখের গৌরবর্ণ পাকা সোনার মত লাল !

পুঁটলিটা সেই চাতালে রাখিয়া শ্রীশ ফটকে ঢুকিল, ঢুকিয়া ডাকিল,—বেয়ারা...বেয়ারা...

স্তব্ধ বাড়ী। কাহারো সাড়া নাই।

শ্রীশ দু'পা আরো অগ্রসর হইয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল,—বাড়ীতে কে আছেন ?...

কোনো উত্তর নাই। শ্রীশ ফটকের পানে চাহিল—নারী ততক্ষণে কোনোমতে ঝুঁকিয়া নুইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া ফটকের মধ্য দিয়া সামনের বারান্দায় উঠিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন।

শ্রীশ দেখিল, দেখিয়া ভাবিল, সর্দ্দি-গর্ম্মিতে মারা যাইবেন না তো ? বাড়ীর বাহিরে···? বাড়ীর লোক-জনই বা কেমন—ইনি ফিরিলেন না স্নান করিয়া, সেজন্য একটা উদ্বেগ বা আশঙ্কা কিছু নাই ? আশ্চর্য্য ! আসিয়া সে প্রৌঢ়ার নাড়ী পরীক্ষা করিল। নাড়ীতে স্পন্দন আছে। রৌদ্রের ক্লান্তি··অভ্যাস নাই—পশ্চিমী রৌদ্র···তাই বোধ হয় !

কিন্তু এভাবে উঁহাকে ফেলিয়া রাখিয়া সেই-বা চলিয়া যায় কি বলিয়া ? সামনে একটা ঘরের দ্বার খোলা দেখিয়া সে সেই দ্বার-পথে এক-পা এক-পা করিয়া অগ্রসর হইয়া ঘর দিয়া অন্দরের দালানে আসিয়া পৌঁছিল ।...দালানের এক কোণে সিঁড়ি—দোতলায় উঠিয়াছে ।

সেইখানে দাঁড়াইয়া শ্রীশ ডাকিল,—বেয়ারা...

দোতলায় পায়ের শব্দ শুনা গেল । সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর,—না, না, না...কখ্খনো শুনবো না আমি—মরে গেলেও না ! তুমি যাও, বলচি...

স্বর তরুণী-কণ্ঠের । খুব ঝাঁজালো ! শ্রীশ ভড়কাইয়া গেল । যে-ঘর দিয়া অন্দরে ঢুকিয়াছিল. আবার সে সেই ঘরে ফিরিল । ফিরিয়া ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিল । একধারে বাল্‌তি। শ্রীশ লক্ষ্য করিয়া দেখে, বাল্‌তিতে জল আছে ! আঃ !

বাল্‌তি তুলিয়া সে বাহিরের বারান্দায় আসিল । বাল্‌তি হইতে আঁজলা ভরিয়া জল লইয়া প্রৌঢ়ার মাথায় মুখে দিল । নারী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—আঃ ! তার পর তিনি চোখ চাহিলেন, চাহিয়া আর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন । কহিলেন,—একটু ভালো বোধ করচি বাবা ।

—দেখি, কাকেও পাই কি না—বলিয়া শ্রীশ আবার সেই ঘর দিয়া অন্দরে চলিল । কিসের ভয় ? সে তো চোর নয়, বা কোন দুরভিসন্ধি লইয়াও আসে নাই !

দোতলায় আবার সেই স্বর—আর্ত্তনাদের মত !—ছাড়ো, ছাড়ো, বল্‌চি ! না হলে আমি হাতে এমন কামড়ে দেবো... চালাকি নয় ।

এ-কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ-কণ্ঠে আর্ত্ত রব—উঃ গেছি, গেছি···রাক্ষসী না কি রে, বাবা!

ব্যাপার কি ? শ্রীশের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। নীচে এই মূর্চ্ছাহতা প্রৌঢ়া—উপরে দোতলায় আবার ও কি নাটকের অভিনয় চলিয়াছে ! দোতলায় সে যাইবে না কি ? কোনো নারীর উপর অত্যাচার চলিতেছে না তো ?···এই নিঝুম বাড়ী···ওই আর্ত্ত স্বর ···! শ্রীশ যন্ত্রচালিতের মত দোতলার সিঁড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইল।

একটা দ্রুত পদশব্দ···আতঙ্কে শিহরিয়া শ্রীশ দেখে, তরুণ-বয়সী এক ছোকরা সভয়ে ছুটিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে আসিতেছে—খালি পা ! সে আসিয়া চকিতের জন্য শ্রীশের পানে চাহিল, কহিল,—আমার কর্ম্ম নয়। বাপ্ ! যেন মানোয়ারী গোরা ! কথাটা বলিতে বলিতে ছুটিয়া সে চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শ্রীশ বিস্ময়ে অবাক্, চেতনাহীন ! তার চমক ভাঙ্গিল একটা বড় আঘাতে। এক-পাটি পুরানো ডার্ব্বি-শু উপর হইতে সবেগে আসিয়া তার মাথায় পড়িল। ··সে ভয়ে হটিয়া আসিল। ..ভৌতিক ব্যাপার ? ..বোধ হয়, তাই ! নহিলে পরক্ষণেই অমন নিঃসাড়, স্তব্ধ...

শ্রীশ নিশ্বাস রোধ করিয়া উৎকর্ণ দাঁড়াইয়া রহিল—কোনো সাড়া নাই। একটু পূর্ব্বে দোতলায় ঐ যে ঝাঁজালো স্বর ফুটিয়াছিল ..? তার পর বাড়ীখানা এমন স্তব্ধ যে, সেই প্রবাদ-কথা মনে পড়িল—একটা পিন পড়িলে বুঝি সে-শব্দও শুনা যাইবে !...

শ্রীশ ভাবিল, সে কি স্বপ্ন দেখিতেছিল ?...কিন্তু না...ঐ যে জুতা পড়িয়া আছে—যার একটি ঘাযে কপালের বাঁ দিকটা এই মার্ব্বেলের মত ফুলিয়া উঠিয়াছে ! সে আঘাত প্রত্যক্ষ। স্বপ্নের আঘাতে কপাল

ফোলে না!...শ্রীশ আবার ধীরে ধীরে বাহিরের সেই বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

বারান্দায় প্রৌঢ়ার সঙ্গে সেই ছোকরা কথা কহিতেছিল। ছোকরা বলিতেছে,—খিম্‌চেছে বৈ কি। এই যে, হাতে দাগ···রক্ত! এই দেখুন না...বাপ্‌ রে! মেয়ে তো নয়, খাণ্ডারী!

হাত খুলিয়া সে ক্ষত-চিহ্ন দেখাইল।

প্রৌঢ়া কহিলেন,—তাই তো, তা কিছু দাও, বাবা ..

ছোকরা কহিল,—হ্যাঁ, দিচ্ছি বৈ কি! এই পেকে ঘা হোক—হাত পচে খসে যাক্‌! বেশ হবে'খন। বললুম মেজ কাকাকে—যে, ও-মেয়ের সঙ্গে আমি পেরে উঠি কখনো? তোমরা পারলে না ও-মেয়েকে,—বোঝাবো আমি? আমি গিয়ে বলবো...তারা পারে, এসে বোঝাক। আমার বয়ে গেছে আর চেষ্টা কর্‌তে। বাঘের সঙ্গে আমি লড়তে রাজী, তা বলে ঐ মেয়ের সঙ্গে? বাপ!

ছোকরা বকিতে-বকিতে বাহিরে চলিয়া গেল। শ্রীশ একেবারে থ! প্রৌঢ়াকে কহিল,—ব্যাপার কি?

প্রৌঢ়া মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন,—কে জানে, বাবা? মরি আমি এধারে নিজের জ্বালায়···ছাখো না কাণ্ড! আমার বোধ হয় বাড়ী ভুল হয়েচে—এদের তো চিনতে পারচি না!

তিনি আবার শুইয়া চক্ষু মুদিলেন। শ্রীশ ভাবিল, এখন কি করা যায়? বাড়ী ফিরিবে?···কিন্তু এখানে যে কাণ্ড চলিয়াছে...নেহাৎ তুচ্ছ করিবার নয়! তার একটা কিনারা ..

ফটকের সাম্‌নে একখানা এক্কা আসিয়া দাঁড়াইল; দাঁড়াইতেই একজন লোক টক্‌ করিয়া লাফাইয়া পথে নামিল; এবং নামিয়াই দ্রুতপদে বারান্দায় আসিয়া উঠিল। শ্রীশকে কহিল,—নীলা কোথায়?...

লোকটির বয়স আটত্রিশের কাছাকাছি। গোঁফে বেশ পাক্ ধরিয়াছে। দাড়ি দুই-চারি দিন কামানো হয় নাই—খোঁচা-খোঁচা!

শ্রীশ লোকটির মুখের পানে চাহিল,...মনে মনে কি একটা অনুমান করিয়া কহিল,—দোতলায়।

লোকটি কহিল,—সুরথ চ'লে যাচ্ছে, দেখলুম—রাগে গোঁ হয়ে কোনো কথা বললে না। তা···

বলিয়া সে অন্দরে চলিল। শ্রীশ কি ভাবিয়া তার অনুসরণ করিল; কিন্তু সিঁড়ির নীচেই দাঁড়াইয়া পড়িল। দোতলায় উঠিতে আর ভরসা হইল না।...

উপরে আবার কথাবার্ত্তা...এই লোকটিই বুঝি! এ বলিল,—একটা কেলেঙ্কারী করতে চাস্! অবুঝ হোস্‌নে, মা, শোন্..

উত্তরে ঝঙ্কার উঠিল—সেই তরুণী, নিশ্চয়! সেই কণ্ঠ!—আবার এসেচে জ্বালাতে। দাদাকে আমি সাফ বলে দিছি—মরে গেলেও না।..

লোকটি কহিল,—সকলকে পথে বসাবি?

তরুণী কহিল,—বসুক পথে! আমি কি করবো! সকলকে বাঁচাতে আমি হাড়-কাঠে মাথা দিতে পারি না তা বলে!

লোকটি কহিল,—হাড়কাঠে মাথা দেওয়া কি! কত পয়সা! জড়োয়া গহনায় তোর গা ভরিয়ে দেবে! যা চাইবি, তাই পাবি। রাজ্যেশ্বরী হবি।

তরুণী জবাব দিল, তেমনি সঝঙ্কারে,—রাজ্য তুমি নাও গে। খবর্দ্দার, আমার কাছে ও-সব কথা বলো না আর। ঘেন্না হয় না এতটুকু? উনি আবার কাকা—কাকাগিরি ফলাতে এসেচেন্!···যাও, চলে যাও এখনি!

তার পর ক্ষণিক স্তব্ধতা।

পুরুষ কথা কহিল, স্বর যথাসাধ্য কোমল করিয়া—বেশ মা, চলেই যাবো। তা তুমি একলা এ-বাড়ীতে থাকবে? সে কি হয়? আমি একা এনেচি। চলো, ঐ গাড়ী করে বাড়ীতেই চলো।

—হ্যাঁ, যাচ্ছি তাই! আর তোমরা আমায় ধরে. .

—না মা, না। তোমার যখন এমন অমত, তখন থাক্ এ বিয়ে!...

—আমি যাবো না।

—যাবে না? নিমেষে পুরুষের স্বর রাগে সপ্তমে চড়িয়া বসিল। সে কহিল,—যাবে না? আচ্ছা, যেয়ো না.. এইখানেই আমি সব ব্যবস্থা করবো। দোরে দরোয়ান রেখে দেবো। দেখি, তুমি কত বড় জাঁহাবাজ মেয়ে! লোকনাথ চক্রবর্ত্তী নিজেও আসচে। দু'হাজার নগদ দিয়েচে। গায়ে-হলুদের সব ঠিক, তত্ত্ব এসে হাজির—এক-বাড়ী লোক। হৈ-হৈ পড়ে গেছে একেবারে। পাচজনের কাছে মাথা হেঁট করাবি! দেখি, গায়ের জোরে তুমি আঁটো কেমন ..

কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি। তরুণীর আর্ত্ত স্বর,—ও বাবা গো, খুন করলে গো...এবং পুরুষের তীব্র হুঙ্কার,—তবে রে মেয়ের নিকুচি করেচে! দু'পাতা বই পড়ে স্বাধীন হয়েচো! না? দেখাচ্ছি মজা...

না, এ তো ঠিক নয়। মেয়েটির দোষ যত থাক্, তা বলিয়া এমন নির্ম্মম অত্যাচার...

শ্রীশ ছুটিয়া দোতলায় উঠিল। সামনে মস্ত বারান্দা। বাতির ঝাড় দুলিতেছে। ক'টা চেয়ার, টেবিল, সোফা...পুরানো, তবু এককালে সৌষ্ঠবে সৌখীনতায় এ গৃহ সুসজ্জিত রাখিয়াছিল। লোকটি

সবলে দু'হাতের মধ্যে চাপিয়া এক তরুণীকে বন্দী করিয়াছে...আর মুক্তির জন্য তরুণীর কি সংগ্রাম চলিয়াছে ! ..

শ্রীশকে দেখিয়া পুরুষটি কহিল,—আপনি লোকনাথ বাবুর লোক ? এই দেখুন মশায়, মেয়ের কীর্ত্তি! এমন একগুঁয়ে বেয়াড়া মেয়ে কখনো দেখেচেন ? আপনি লোকনাথবাবুকে বলবেন, আমরা সম্পূর্ণ তাঁর দিকে...কিন্তু দেখচেন তো মেয়ের গোঁ...

তরুণী আপনাকে ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে ও তীব্র স্বরে বকিতেছে,—খুন হবো আমি, রক্তগঙ্গা হবো। দেখি, কে বাধা দেয়! বিয়ে দেবেন জোর করে এক বুড়ো হতভাগার সঙ্গে! তার চেয়ে... অবশেষে সে পুরুষের হাতে সজোরে দংশন করিয়া দিল। পুরুষ আর্ত্তনাদ তুলিয়া সরিয়া গেল—মেয়েটিও অমনি ছুটিয়া একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সশব্দে ভিতর হইতে খিল্ আঁটিয়া দিল। লোকটি হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া সেই দ্বারের পানে চাহিয়া, তার পর আসিয়া হাতের ক্ষত শ্রীশকে দেখাইল। দেখাইয়া কহিল,—শয়তানী! দেখেচেন কাণ্ড ?

শ্রীশ কহিল,—ব্যাপার কি, বলুন তো...একটু আগে আর-এক পশলা হয়ে গেছে...

লোকটি কহিল,—হয়ে গেছে ? ঐ সুরথ...তাকেও এমনি...?

শ্রীশ কহিল,—হ্যাঁ।

লোকটি কহিল,—ব্যাপার এমন কিছু নয়। লোকনাথ বাবুর লোক তো আপনি ?

শ্রীশ কহিল,—কে লোকনাথবাবু ?

লোকটি কহিল,—ঐ যে লায়াল রোডের কাছে থাকেন—লোকনাথ চক্রবর্ত্তী। কাশীর মস্ত জমীদার। এ-বাড়ীও তাঁর ..

শ্রীশ কহিল,—তা, এ মেয়েটি এখানে একলা...?

লোকটি কহিল,—ইটি আমার ভাইঝি। মেয়ের বাপ পাগল... মা'র সামর্থ্য কি, বলুন? কন্যাদায়। তা, আমাদেরই দেখতে হবে তো। তাই এই পাত্র স্থির করেচি। একটি পয়সা দিতে হবে না —উল্টে পাঁচ হাজার টাকা মেয়ের বাপকে দিচ্ছে। দাদার আরো ছেলে-মেয়ে আছে—কম হিল্লে! তা মেয়ে তো এই ধিঙ্গি! যাক্, এখন লোকনাথবাবুকে কি যে বলবো গিয়ে? আজ গোধূলি-লগ্নে বিয়ে... গায়ে-হলুদ এই বেলা বারোটার সময়। তা, মেয়ে এ-বাড়ীতে এসে যা ঢুকেচে, কিছুতে বেরুবে না...

শ্রীশ কহিল,—তা হঠাৎ এ খালি বাড়ীতে এসে মেয়ে ঢুকলো কি করে...?

বাহিরে একটা কলরব শুনা গেল। লোকটি শ্রীশের কথার জবাব না দিয়া কহিল,—দেখি,...বলিয়া সে হাতের পানে করুণ নয়নে চাহিয়া নামিয়া গেল। শ্রীশ নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত সেইখানে দাড়াইয়া রহিল।

৩

লোক-জন আসিয়া দোতলায় উঠিল- পুরুষ ও নারী। দলটি নেহাৎ ছোট নয়। তাদের মুখে-চোখে ভঙ্গীর কি বৈচিত্র্য! বায়োস্কোপের crowd-এর দৃশ্য শ্রীশের মনে পড়িল। কারো দৃষ্টিতে বিরক্তি, কারো রাগের ঝাঁজ, কারো বা দৃষ্টি ম্লান, করুণ!...

সেই সঙ্গে প্রমত্ত কোলাহল—কৈ? কোন্ ঘরে? আহ্লাদি পুতুল! রঙ্গ পেয়েচেন! পাগল বাপ ঘরে, আর মেয়ে দোতলায় সাপের নাচ নাচচেন ..

দ্বারে দুম্-দাম্ করাঘাত, তিরস্কার-আস্ফালন...সেই সঙ্গে আদেশ,—খোল্, দরজা খোল্, বলচি...না হলে লাথি মেরে দোর ভাঙ্গবো...

ভিতর হইতে তীব্র স্বর—ভাঙ্গো দরজা—আমি খুল্‌বো না।...বেশী জ্বালাও তো আঁচলের ফাঁশ্ গলায় জড়িয়ে এইখানে মরবো।

সকলে নিরুপায় হতাশভাবে শ্রীশের পানে চাহিল। শ্রীশের ভদ্র চেহারা, গম্ভীর ভাব...হতাশের দলে আশার আভাস জাগাইল।

শ্রীশ কহিল,—এই রকম করে আপনারা মেয়ের বিয়ে দেবেন?

এক প্রৌঢ়া নারী, হাতে নূতন তাগা—তাগা জোড়া আঁটিয়া লইয়া কহিল,—ভাগ্যি, ভাগ্যি—ওর সাত পুরুষের ভাগ্যি, তাই এমন বর পাওয়া গেছে। ঢং করচেন, ঢঙানি! এখন সকলের হাতে দড়ি দেবার মতলব! তখনি ওঁকে বলে ছিলুম যে, এ বিয়ের কথায় তুমি থেকো না। তা শুনলেন না। বললেন, আহা, আমি না দেখলে কে দেখবে? এখন ভাখো। মেয়ে বেঁকে আছে কি রকম! আজ সন্ধে বেলায় বিয়ে—মেয়ে বিইয়ে এখন বিয়ে দাও...

দলের মধ্য হইতে আর এক-জন নারী মিনতিপূর্ণ দুটি করুণ নেত্রের দৃষ্টি মেলিয়া প্রৌঢ়াকে কহিলেন—একটু চুপ করো মেজো বৌ। আমি দেখচি ভাই। তোমরা একটু সরো তো...বুঝিয়ে আমি রাজী করাচ্ছি।

এক-নম্বরের প্রৌঢ়াটি মেজ বৌ। শ্রীশ বুঝিল। সেই যে মেজ-কাকার কথা শুনিয়াছিল, ইনি তাঁর সহধর্ম্মিণী! আর ঐ যে লোকটি...কাঁচা-পাকা গোফ, যুদ্ধ করিতেছিলেন, শেষে হাতে কামড়ের ঘা খাইয়াছেন, তিনিই পূজ্যপাদ মেজ কাকা!

মেজ বৌ বলিল,—এমনি করে বোঝাতেই থাকবে কি সারা দিন? একটা মঙ্গলের কাজ, গায়ে হলুদ ছোঁয়ানো...তা...জানি না বাপু, যা ভালো বোঝো, করো। বিয়ের সঙ্গে খোঁজ নেই, মেয়ের

কুলোপানা চক্কর! থুবড়ি ধাড়ি মেয়ে...বোঝে না কিছু যে তাকে আবার বোঝাতে হবে?

মিনতির দৃষ্টিতে দ্বিতীয় নারী আবার কহিলেন,—বুঝেছিল বেশ...মেজ-ঠাকুরপোর চিঠি পেয়ে এলোও তো মৌরাট থেকে। বুঝেই এলো। তার পর কি যে হলো...

পুরুষের দল কহিল,—বোঝাক্-সোঝাক্—এসো, আমরা নীচে একটু দাঁড়াই...

মেজ বৌ কহিল,—করো তোমরা রঙ্গ...তোমাদের মান তো যাবে না, সে যা যাবে, এঁর, আর সেই সঙ্গে আমার...বলিতে বলিতে মেজ বৌ এবং সেই সঙ্গে সেনানীদল নীচে নামিয়া গেল। দোতলায় রহিলেন শুধু সেই দু'নম্বরের মহিলাটি!

শ্রীশও নামিয়া যাইতেছিল। তাকে কেহ নামিতে বলে নাই, তবু থাকা ভালো দেখায় না!

দু'চার ধাপ সে নামিয়াছে, শুনিল, দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া নারী কহিলেন,—মা, ও-মা নালা, মা গো, দরজা খোলো মা। আমি মা, ডাকচি। এখানে আর কেউ নেই। কথা শোনো মা...

ইনি ওই মেয়েটির মা! বেশ শান্ত শ্রী...নম্র, করুণ, স্নিগ্ধ মায়ের মূর্ত্তি বটে! শ্রীশের বুকটা দুলিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে মস্ত এক রহস্য আছে নিশ্চয়, নহিলে, ঐ রুদ্র-রস এভাবে উথলিবে কেন, এক বিবাহের ব্যাপারে? বিশেষ, যেখানে এমন অভাবনীয়ভাবে সে বিবাহ ঘটিতেছে! বর-পণ নাই, কন্যার পিতার ঐ অবস্থা—কন্যার পিতাকেই বর-পক্ষ নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিতেছে! তার কৌতূহল তীব্র হইয়া উঠিল। শ্রীশ আর নামিল না, সিঁড়ির সেই ধাপেই দাঁড়াইয়া রহিল।

মা আরো দু'চারবার মিনতি জানাইলেন। মেয়ে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া চারিধারে চাহিল, তার পর ঝাঁপাইয়া মা'র বুকে পড়িয়া মুখ গুঁজিল।

মা ডাকিলেন,—নীলা, মা · মা'র স্বর বাষ্পার্দ্র।

মেয়ে কহিল, কেন, মা ?

মা কহিলেন,—কোনো উপায় নেই যে মা। কেন এমন করচিস্? তুই যে দুঃখীর ঘরে জন্মেচিস্ মা এই বাঁদীর পেটে। কোথাও যে কেউ সহায় নেই...

মেয়ে কাঁদিয়া ডাকিল – মা মুখে তার আর কথা ফুটিল না।

শ্রীশ চাহিয়া দেখে, চোখের জলে মেয়ের পাকা আপেলের মত দুই গাল ভাসিয়া যাইতেছে। সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

এই নাটকের দর্শকমাত্র হইয়া সে আর থাকিতে পারিল না। ইহার পাত্র-পাত্রীদের দরদে সারা মন ভরিয়া উঠিল। সে আসিয়া অত্যন্ত বিনয়ের সহিত কহিল,- আমার একটু নিবেদন আছে।... মানে

মা ও মেয়ে দু'জনেই শ্রীশের পানে চাহিলেন। শ্রীশ কহিল,— আমি কিছু জানি না, তবে একটু যা বুঝেচি, তা এই যে এঁর বিবাহের সব আয়োজন স্থির হয়েচে, বিবাহ আজ রাত্রে, কিন্তু ইনি বেঁকে বসেচেন, এ-বিবাহে মত নেই। তাই না?

ঘাড় নাড়িয়া মা জানাইলেন, তাই। মেয়ের দুই চোখে তখনো অশ্রুর ঝর্ণা! গৌর বর্ণ, যৌবনের স্পর্শে নিটোল স্বাস্থ্যে সারা অবয়ব পরিপূর্ণ – নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা একখানি ছবি যেন। চোখের জলে রূপসীর রূপশ্রী শিশিরে-ধোওয়া টাটকা ফুলের মত শতগুণ উছলিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীশ কহিল,—তার পর শুন্‌চি, বরপক্ষ আপনাদের পাঁচ হাজার টাকা নগদ দেবে। তবু...?

মৃদুস্বরে মা কহিলেন,—বরের বয়স একটু বেশী হয়েচে, বাবা। তা ভেবেছিলুম, দূর হোক ছাই, সে দুঃখ করে লাভ তো নেই! মহাদেবও যে বুড়ো। পয়সার বল যখন নেই, আর যাঁর মেয়ে, তিনিও কাজের বার,—তখন পাঁচজনের দয়ায় যদি···

সমস্ত ব্যাপারখানা শ্রীশের চোখের সামনে জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া উঠিল। বুড়া বর, তাই...

সে একটা নিশ্বাস ফেলিল। আইন পাশ করিয়া সে নূতন উকিল হইয়াছে...আইনের ধারাগুলা সরীসৃপের মত মাথায় কিল্‌বিল্ করিয়া উঠিল। সে কহিল,—আপনিই মেয়ের অভিভাবিকা।...আর মেয়ের বয়স...

এই অবধি বলিয়া সে থামিয়া গেল। মেয়েদের বয়স লইয়া পুরুষের কোনো কৌতূহল সাজে না।...মা কিন্তু তাকে এদায়ে বাঁচাইলেন, কহিলেন,—তা, মেয়ের বয়স সতেরো চলেছে, বাবা—লুকুবো না। মা একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—পয়সা নেই। সময়ে বিয়ে দেবো কি দিয়ে?···ওঁরা বলেন, মেয়ে তো তোমার কচি খুকী নয়, ডাগর,—বেমানান হবে না।

শ্রীশ কহিল,—আপনারা মীরাট থেকে এসেচেন, বললেন না?

মা কহিলেন,—হাঁ, বাবা। সেখানে একটু আস্তানা আছে। বড় ছেলেটি এখানে আমার মেজ ছাওরের কাছে থাকে। পড়াশুনা করছিল,—গেছে। এখানে রেলে যদি একটা চাকরি-বাকরি মেলে...

শ্রীশ কহিল,—এ সম্বন্ধ কে স্থির করলে? আপনার ঐ মেজ ছাওর বুঝি?

মা কহিলেন,—হ্যাঁ, বাবা!

শ্রীশ কহিল,—বর-পক্ষ আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবে বলেচে?

মা কহিলেন,—তা আমি জানি না বাবা। তবে বিয়ের সব খরচ দেবে, শুনেচি। আর দু'শুট্ গহনা...

মেয়ে চোখের জল মুছিয়া কহিল,—ও-টাকা ঐ কাকাই নেবেন। আজ আমায় ধমকাতে এসে প্রথমে বললেন, দু' হাজার টাকা পেয়েচেন, আরো তিন হাজার টাকা পাবেন...

শ্রীশ কহিল,—ও! বুঝেচি। এ টাকাটা উনিই ট্যাঁকে গুঁজবেন—আপনাকে জানান্ নি!..এ মন্দ নয়। উনি ভাইঝীকে বেচ্‌চেন! এ তো ভাল কথা নয়, মা...

মা'র চোখে অশ্রু ঝরিল। মা কহিলেন,—উপায় কি, বাবা? মেয়ে আমার লেখাপড়া জানে। তখন তো ওঁর মাথা খারাপ হয় নি। ডাক্তারী করছিলেন, দু'পয়সা রোজগার করতেন, মেয়েকে মেয়েদের ইস্কুলে পড়িয়েছিলেন...

শ্রীশ কহিল,—সব বুঝলুম। তা, এ বিয়ে কি রদ হয় না মা?

মা সাশ্রুনয়নে কহিলেন,—কি করে হবে, বাবা? এত খরচ-পত্তর...গায়ে-হলুদের তত্ত্ব অবধি তারা পাঠিয়েচে...

শ্রীশ কহিল,—হুঁ।...তা এ তত্ত্ব কোথায় এলো?

মা কহিলেন,—আমার মেজ দ্যাওরের বাড়ী। সে থাকে ওই ইষ্টিশানের কাছে। রেলে চাকরি করে কি না!...

শ্রীশ কহিল,—আপনার মেয়ে সকালে এ-বাড়ীতে একলা এলেন কি করে—সে বাড়ী ছেড়ে?

মা কহিলেন,—সকালে আমার দ্যাওরপো বললে, নীলা, তোর

বাড়ী দেখেচিস···দারাগঞ্জে ? খাশা বাড়ী, চ' দেখবি—বলে সে একটা গাড়ীতে করে ওকে এখানে নিয়ে আসে। মেয়ে আর ফিরে যেতে চাইছে না। ভ্যাওরপো গিয়ে বাড়ীতে খপর দিলে। আমার বড় ছেলে সুরো এসেছিল ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে যেতে...তার দেরী দেখে আমরা শেষে···

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এ-বাড়ীতে আসিয়া যেটুকু অভিনয় শ্রীশ দেখিয়াছে, এ পরিচয়ে সেটুকু সুস্পষ্ট আকারে প্রকাণ্ড একখানি নাটকের বেশে ফুটিয়া উঠিল—কোথাও তার এতটুকু ফাঁক রহিল না! এই মেজ ভ্যাওরটি একখানি চীজ্—অক্ষম দাদার নিরুপায় পরিবারটির মস্ত দায় ঘুচাইবার অছিলায় বেশ মোটা টাকা উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়াছে! পাজী, শয়তান! শ্রীশের রক্ত নাচিয়া উঠিল। আর কিছু না হোক্, এই শয়তানের ফন্দী যেমন করিয়া হোক্ সে ফাঁশাইবে! শ্রীশ কহিল,—কোনো ভয় করবেন না মা। এ বিয়ে দেবেন না আপনি। ওঃ মান বেঁধে বলে ঐ তাগা-পরা মেয়েটি চ্যাচাচ্ছিলেন! তাগাজোড়া নতুন... দেখলুম!

মেয়ে নীলা কহিল,—হ্যাঁ, কাল গড়ে এসেচে। এই তক্কেই...

শ্রীশ কহিল,—বুঝেচি। এমন শয়তানও আছে মা—নিজের ভাইঝীর সর্ব্বনাশ করে রাজ্যলাভ করতে চায়! এই বাড়ীখানা আপনার মেয়ের নামে লিখে দেবে...বটে? বুড়োকে আপনি দেখেচেন? মানে, এই বর...?

মা বলিলেন,—না বাবা। আমায় বলেচে, পাঁচ মাস হলো, তার বৌ মারা গেছে। জামাইয়ের এলাহাবাদে কি কারবার আছে, তা ছাড়া এল্‌গিন রোডে মস্ত বাড়ী···সেই বাড়ীতে থাকেন।

শ্রীশ কহিল,—আর-পক্ষের ছেলেমেয়ে ..?

মা কহিলেন—তাগর ছেলেমেয়ে আছে—নাতি-নাতনীও। তা বলচে—তাদের নাকি আলাদা করে দেছে। যা কিছু আছে, সব আমার মেয়ের হবে!

উত্তেজিত স্বরে শ্রীশ কহিল,—না, না না। গহনা আর টাকাই সর্ব্বস্ব নয়। বিশেষ আপনার মেয়ে লেখাপড়া শিখেচেন ওঁর মন এ-বিবাহে বিদ্রোহী হবেই তো। যাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে পারবো না—ভালোবাসা তো দূরের কথা, একটা লোভী বুড়ো—কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত, বেহায়া, নির্লজ্জ, বাপের চেয়ে বয়সে বড়—সে হবে স্বামী? বন্ধু? না, এ হতে পারে না!

ছল-ছল চোখে মা কহিলেন,—কিন্তু আমি একা, সহায়হীন। আর ওরা..

শ্রীশ কহিল,—কুচ পরোয়া নেই। আমি আপনার সহায় আছি। আমি আইন জানি, উকিল। আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জিদ্ করে কোনো ব্যাটা আপনার মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে না!..

কথাটা বলিয়া শ্রীশ কেমন অপ্রতিভ হইল। উত্তেজনার ঝোঁকে মা'র দ্যাওরকে—ঐ পূজ্যপাদ মেজবাবাকে সে অভদ্র গালি দিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীশ নীলার পানে চাহিল- এমনি. তার মুখ-মাথা চোখে একটু যেন খুশীর আভাস! শ্রীশের মনের ভার নামিল। সে ভাবিল, এ গালিটা নীলা উপভোগ করিয়াছে! যাক. ভাবনা নাই!

শ্রীশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল যেন ছেলেমেয়েদের রূপকথার কোন্ মায়াবী যাতুকর. মনে মনে যেন মন্ত্র জপিতেছে রাজ্যের অভিসন্ধি সে-মন্ত্রে আকাশ ফাঁড়িয়া, পাতাল ফুঁড়িয়া সদলে এখনি আসিয়া তার মনে উদয় হইয়া তাকে ঠিক পথে চালিত করিবে!..

শ্রীশের চেতনা ফিরিল মা'র আহ্বানে। মা বলিলেন,—তা হলে এদের কি বলি, বাবা ?

শ্রীশ কহিল,—এঁদের ? হ্যাঁ, সাদা কথা বলুন যে, মেয়ে রাজী হলো না এ বিয়েতে। মেয়ে ডাগর—তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ বিবাহ দেওয়া বে-আইনী কাজ হবে !...

মা বলিলেন,—আর ওই যে গায়ে হলুদ পাঠিয়েচে—হলুদ, তবে অত জিনিষ-পত্তর ..?

শ্রীশ মা'র পানে চাহিল—খুব তীব্র সন্ধানী দৃষ্টিতে। তাঁর মনে কোনো লোভ, কোনো আগ্রহ...? নারী তো·· কে জানে !

শ্রীশ কহিল,—আপনার কি মত আছে এ বিয়ের ?

মা কহিলেন,—না বাবা। মনের কথা যদি বলো তো, মোটে নেই। আমায় যেন পাগল করে তুলেচে ! কি করচি, তার কিছু বুঝচি না !...তবে এ ছাড়া এ দায়ে উপায়ই বা আর কি আছে ? ...বে ? আমি যেন অকূল সাগরে ভাসচি।

শ্রীশ কহিল,—ভাববেন না। আপনার যদি মত না থাকে, তা হলে আর কোনো দ্বিধা নয়। সটান্ তাই বলে দিন। তারপর গায়ে-হলুদ, জিনিষ-পত্তর ?...পূজ্যপাদ মেজকাকা মশায়ের যদি মেয়ে থাকে, স্বচ্ছন্দে তার বিনিময়ে তিনি রাজ্যলাভ করুন ! .

মা কহিলেন,—ওর তো বিয়ের যুগ্যি মেয়ে নেই ..

শ্রীশ কহিল,—পাঁচ বছরের ? চার বছরের ? দেড় বছরের মেয়ে ? তাও নেই ?

মা কহিলেন,—একটি মেয়ে আছে, তার বয়স...সে এই ছ'মাসের হলো, বুঝি .

শ্রীশ কহিল,—তার গায়ে হলুদ ছুঁইয়ে ছান্‌লাতলায় ছ্যাড্‌ড্যাং

করে দিন্ তবে। আপনার সে-চিন্তায় দরকার কি? যাঁরা এ সম্বন্ধ স্থির করেচেন, তাঁরা উপায় দেখুন ..

মা অবাক্ হইলেন—এ ছেলে বলে কি? তার পরে তাঁর দশা? কি করিয়া মীরাটে ফিরিবেন? ..মা কিছু বলিলেন না—দুই চোখের সম্মুখে শুধু সমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গ দেখিলেন।

শ্রীশ কহিল,—আপনি মেয়ে নিয়ে মীরাট চলে যান। বলেন, আমি রেখে আসতে পারি। উপস্থিত আমার কোনো কাজ নেই। এখানে হাওয়া খেতে এসেচি—নিষ্কর্ম্মা, হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছি।

৪

আবার জুতার সেই দুপ-দাপ শব্দ। সিঁড়ি বহিয়া সেই ভিড় ঠেলিয়া উপরে উঠিল।...মেজ দ্যাওর মশায় আসিয়া কহিলেন,—মত হলো বড় বৌ?

বড় বৌ হতাশ-চক্ষে স্নেহাস্পদ দেবরের পানে চাহিয়া কহিলেন,—না, ভাই।

মেজ দ্যাওর কহিলেন,—না ভাই তো বয়ে গেছে! সরো তুমি। একটা একরত্তি মেয়ের গোঁ এত বড় হবে যে দাঁড়িয়ে শুদ্ধ অপমান হবো? তা হয় না...

তাগাপরা মেজ জা কহিলেন,—শুধু তাই! হাতে দড়ি পড়বে না? এই ছেরাদ্দের জোগাড়ের দরুণ নগদ টাকা গুণে দেছে না?... হাত পেতে নাও নি?

মেজ দ্যাওর কহিলেন,—লোকনাথ বাবু নিজে এসেচেন, তাঁর ম্যানেজার, লোকজন ..

মেয়ে নীলা ছুটিয়া আবার সেই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দ্বারে হুড়কো আঁটিয়া দিল।

ভিড় ঠেলিয়া—কৈ ? কোথায় ? বলিয়া এক বৃদ্ধ সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মেয়ের মা মাথায় ঘোমটা টানিয়া একপাশে সরিয়া গেলেন, অত্যন্ত লজ্জা-কুণ্ঠিত ভাবে।

শ্রীশ দেখিল, আগন্তুকের চেহারা হুবহু সেই পুরানো সংস্করণ শিশুবোধকের পৃষ্ঠায় কাঠের ব্লকে ছাপা চাণক্য পণ্ডিতের মত ! মাথায় মস্ত টাক, পিছনে কতকগুলা চুল, চুলের বর্ণ যেন সিরাজগঞ্জের দেশী পাট ! চর্ম্ম লোল, বাঁটুল আকৃতি !...ইনিই লোকনাথ চক্রবর্ত্তী ? এ বিবাহের বর ?

মা'র সামনে দাঁড়াইয়া লোকনাথ ডাকিল,—মা-জননি...

মা-জননী জড়োসড়ো—গায়ের কাপড় আরো একটু টানিয়া আপনাকে যথাসাধ্য ঢাকিলেন।

লোকনাথ কহিল,—আমি তেমন বুড়ো হইনি মা-জননি · কেন অমন করচেন ?...মার চোখে ছেলে কি কখনো বুড়ো হয় ? তা ছাড়া আপনার মেয়েকে না দেখেই আমি পছন্দ করেচি। শুধু ছবি দেখে ! আপনার কন্যাকে রাজ্যেশ্বরী করবো। বিষয়-সম্পত্তি আমার অল্প নয়। সে-সবের মালিক উনিই হবেন।

মা কোনো কথা বলিলেন না। শ্রীশ কহিল,—ওঁদের এ-বিয়েতে মত নেই। মানে, ওঁদের সঙ্গে যখন আপনার কোনো কথা হয় নি এ-সম্বন্ধে...

মেজ দ্যাওর আগাইয়া আসিল, কহিল—আপনি কে মশায়, ওকলতি করতে দাঁড়ালেন ?

শ্রীশ কহিল,—আমি উকিল।

মেজ দ্যাওর কহিল,—এটা কাছারি নয়। কাছারি বন্ধ নেই। ওকালতি করতে হয়, সেখানে গিয়ে করুন।

শ্রীশ কহিল,—এ মামলা যখন কাছারিতে গড়াবে, তখন তার ওকালতি কাছারিতে চল্‌বে। আপাততঃ ভালো কথায় বোঝাচ্ছি...

মেজ জা ফোঁশ করিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—ঢের দরদ দেখা গেছে! এ্যাদ্দিন দরদ-দেখানীরা সব কোথায় ছিলেন?

শ্রীশ কহিল,—ঘটকালি করে নতুন তাগা তো হাতে পরতে পাইনি, কোথা থেকে দরদ হবে, বলুন?

কথাটা তপ্ত লোহার মত মেজ বৌয়ের গায়ে লাগিল। মেজ বৌ শাড়ীর ভাঁজ টানিয়া হাত ঢাকিয়া তাগাজোড়া গোপন করিলেন।

লোকনাথ কহিল—এ-সব কথা কেন তুলচেন? শুভকর্ম্ম... একটা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, উৎসব...এ সময় .

শ্রীশ কহিল,—আপনার পক্ষে উৎসব বটে, কিন্তু অপর-পক্ষ এটাকে ঠিক উৎসব বলে গ্রহণ করতে পারচে না কি না!

লোকনাথ কহিল,—কিন্তু মেয়ে যা বল্‌বে, তাই তো শিরোধার্য্য করা চলে না। ছেলেমানুষ, তার কি বুদ্ধি-বিবেচনা যে..

শ্রীশ কহিল,—তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা আপনাদের পক্ককেশদের চেয়ে বেশী, দেখ্‌চি।

মেজ দ্যাওর গোঁফ মুচড়াইয়া কহিলেন,—ইনি আপনার পক্ষের লোক?

লোকনাথ নাকে চশমা টিপিয়া ধরিয়া শ্রীশকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল,—না। এঁকে কখনো দেখেচি বলে তো মনে পড়চে না।

মেজ দ্যাওর কহিল,—উনি তবে পথের লোক! এ-বাড়ীর মধ্যে এলেন কি করে? এ বে-আইনী।

শ্রীশ কহিল,—আমায় আইন দেখিয়ো না। ওঃ, কুলধ্বজ কাকা! ভাইঝীর বিয়ে দিয়ে ফাঁকতালে পাঁচ হাজার টাকা ট্যাঁকে পুরচেন ..

উনি এসেচেন আইন দেখাতে!...এ পাঁচ হাজারের জন্য গবর্ণমেণ্ট তার অতিথশালায় না ধরে নিয়ে গিয়ে রাখে!...

মেজ শ্বাওরের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। পাঁচ হাজারের তিন হাজার এখনো লোকনাথের সিন্দুকে, তবে দু'হাজার তাঁর হাতে আসিয়াছে! সে দু'হাজার শেষে...?

লোকনাথ কি ছাড়িয়া কথা কহিবে? নিজের মেয়েরও বয়স এমন নয় যে...! রাগ ধরিল। ঐ ছেলেটা...হাবুল...তার বয়স তেরো বৎসর। ওটা যদি ছেলে না হইয়া মেয়ে হইত! খুকী এখন ছ' মাসের। লোকনাথ চক্রবর্ত্তীর মত পাত্র প্রতি বৎসর কিছু বাজারে আসে না! হাজার বছরে একটা যদি···ওঃ, এই বাড়ীখানা, তার উপর গহনা, টাকা, শেয়ার, ডিবেঞ্চার...

মেজ শ্বাওরের চোখের সামনে হইতে লোকজন-গাড়ী-কলরব-ভরা এই এলাহাবাদ সহরটা চকিতে সরিয়া সাহারা মরুভূমির মত ধূ-ধূ মূর্ত্তি ধারণ করিল!...

এ বিবাহ না ঘটিলে রাজ্য না হোক্—ঐ পাচ হাজার...তারপর মাঝে মাঝে আরো কিছু না কোন্...

কিন্তু এ মেজাজে ফল হইবে না!...মেজ শ্বাওর নরম হইয়া ভ্রাতৃজায়াকে বুঝাইলেন—তুমি বরং এখানে থাকো বড় বৌ·· মেয়েকে ভুলিয়ে ওর মাথা ঠাণ্ডা করাও। এই তো স্বচক্ষে পাত্র দেখলে—কেমন শক্ত সমর্থ শরীর—এমন কি বুড়ো? আমি হলুদটুকু এখানে পাঠিয়ে দি,—মেয়ের কপালে ছুঁইয়ে দাও—একটা মাঙ্গলিক কাজ!···কি বলেন আপনি লোকনাথবাবু?

লোকনাথ কহিল,—তার পর মুস্কিল হয়েচে এই যে, আজকের লগ্ন ছাড়িলে দু' মাস আর আমার অবকাশ ঘটবে না। এক হপ্তা

পরেই আমায় গয়ায় যেতে হবে। জমী জরীপ হচ্ছে। ওখানে ক'টা তালুক আছে। তারপর গয়া হয়ে বেরেলি, বেরেলির পর আবার কাশী। কাশী থেকে জৌনপুর, প্রসাদগাঁও, ঝুলনচৌকি, সাতপুরা, গৌমুণ্ডা...সেই আশ্বিন নাগাদ্ যদি ছুটী মেলে!

মেজ জ্যাওরের চোখের উপরে আবার সারা ইউ-পির ম্যাপখানা ভুলিয়া উঠিল। মেজ জ্যাওর কহিলেন,—শুনচো বড় বৌ? ছি, তুমিও মেয়ের সঙ্গে অবুঝ হচ্ছো!...তোমাব স্থরথ, জবু, সিন্ধু—এদের শুদ্ধ কত বড় হিল্লে হয়ে যাবে, সে-কথা ভেবে দেখচো না...?

লোকনাথ কহিল,—ভালো কথায় না হয় যদি তো আমার ম্যানেজার থানায় খবর পাঠিয়েচে—পুলিশ এলো বলে...শেষে কি পুলিশ ডাকিয়ে বিয়ে করতে হবে! কি করবো? উপায় নেই। আমার যে আর অবকাশ মিলবে না। দেহাতে একলা কখনো যাইনি...পরিবার বরাবর সঙ্গে গেছে. .আমার খাওয়া-দাওয়া—লোকজন দিয়ে তা হয় না বলেই না আবার এ বয়সে ..

লোকনাথ আরো কি বলিতেছিল, তার কথা শেষ হইল না। ঝড়ের ঝাপ্টার মত এক জোয়ান ছোকরা আসিয়া উপস্থিত! সে কহিল,—কৈ? কোথায় সে বুড়ো বর?

লোকনাথ চমকিয়া তার পানে চাহিল। সর্ব্বনাশ! এ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভোলানাথ। ভারী বদ্, বেয়াড়া মেজাজ—কারো তোয়াক্কা রাখে না!

ভোলানাথ কহিল,—কি হচ্ছে? বিয়ে করতে এসেচো না কি আবার এইখানে?...

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভোলানাথের কথায় বেশ জোর আছে! ভোলানাথ কহিল,—আমরা আপনাদের সঙ্গে কোনোরকম

শত্রুতা করি নি তো, তবে, আপনারা অহেতুক আমাদের সর্ব্বনাশ করেন কেন ?...

মানুষ যত বড় পাষণ্ড হোক, এ কথায় মন সঙ্কোচে একটু নুইয়া পড়ে! এটা হয়তো আদিম চক্ষুলজ্জা—ছুনিয়ার সর্ব্বপ্রকার ফন্দী-ফিকিরের আগে এ-চক্ষুলজ্জা মানুষকে অভিভূত করিয়া থাকে। মেজ কাকামশায়ও একটু মুষ্‌ড়াইয়া গেলেন। লোকনাথ কহিল,—তুমি এ সময় কাশী থেকে হঠাৎ এলে যে ?

ভোলানাথ বেশ সপ্রতিভভাবে জবাব দিল,—আপনার জ্বালায়। আপনাকে একলা ছেড়ে দেওয়া দায় হলো দেখচি! ..বলিয়াই সে সমবেত জনমণ্ডলীর পানে চাহিয়া কহিল,— আপনাদের সব কথা তা হলে খুলে বলতে হয়। ওঁর একবার মাথার ব্যামো হয়—জন্মের মত পাগল হবেন, এমন ভয় হয়েছিল। তা হলো না, ওঁর ভাগ্য। কিন্তু তার বদলে যা হলেন, আমরা-শুদ্ধ তাতে পাগল হয়ে দ করচি

সকৌতূহলে সকলে লোকনাথের পানে চাহিল।

ভোলানাথ কহিল,—ওঁর কেমন ধারণা হলো যে, ওঁকে যত্ন করবার কেউ নেই!...বছর চারেক আগে একবার কলকাতায় যান্, সেখানে গিয়ে চুপি চুপি একটি বিবাহ করে আসেন। তার পর আর-বছর কানপুরে এক ভদ্রলোকের কন্যাদায় উদ্ধার করেচেন। তাঁরা ছু'জনেই আমাদের ওখানে কাশীর বাড়ীতে বাস করচেন! দেখুন তো...বুড়ো বয়সে ছু'ছুটো মেয়ের সর্ব্বনাশ করলেন ..

ভিড়ের মধ্য হইতে মেজ বৌ কথা কহিলেন, বলিলেন,—তোমাদের সর্ব্বনাশ, বলো! বিষয়ে ভাগীদার—

ভোলানাথ কহিল,—তা তো বটেই! ভাগীদার কে সহ্য করে,

বলুন ? অহেতুক ? বিশেষ আমার মা-ঠাকরুণ এখনো জীবিত আছেন। ভাবুন তো তাঁর মনের অবস্থা। এখানে আবার...

শ্রীশ কহিল—উনি যে বলেচেন, পাঁচ-ছ মাস হলো, ওঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েচে

ভোলানাথ কহিল,—পিতৃনিন্দা মহাপাপ। কাজেই কিছু বলতে পারবো না। এইটেই হলো ওঁর বাতিক!...আমরা চার ভাই, দুই বোন—দুই বোনেরই বিবাহ হয়েচে...তাদের তিন-চারটি করে ছেলে-মেয়ে...বুঝুন...

মেজ-কাকামহাশয় কহিলেন--তা হলে আপনি বিবাহ করুন। আমাদের এ-ভাবে জাত নষ্ট করা ? ওঁর স্ত্রী মারা গেছেন বলেই না আমরা...ওঁর ম্যানেজারও তাতে সায় দিলে...

ভোলানাথ কহিল,—কে ম্যানেজার ? ঐ খোট্টা গোপীচাঁদ ? ও বেটা তো মোসাহেব ! কাশীতে ঢোকবার ওর সাধ্য নেই। ও আমাদের শনি...

মস্ত ব্যাপার ! শ্রীশ ভাবিতেছিল, কি সে নাটক ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছিল ! নাটকে বড় জোর পাঁচটা অঙ্ক...যত দৃশ্যই জুড়িয়া দাও, ওই পাঁচ অঙ্ক ছাড়াইয়া ছয়ে তার যাইবার উপায় নাই ! আর এ যে সাত সর্গে মহাকাব্য রচিবার মত প্লট ! নানা শাখা-প্রশাখায় যেন সেই শিবপুর বোটনিক্যাল গার্ডেনের সুপ্রাচীন বৃহৎ বটবৃক্ষ !

শ্রীশ কহিল,—কর্ত্তা যে পুলিশে অবধি খবর পাঠিয়েচেন।

ভোলানাথ কহিল,--পুলিশ আসুক। তাদের সাহায্যে ওঁকে কাশী নিয়ে যাই। মাথা খারাপ হওয়া-ইস্তক আদালতে দরখাস্ত দিয়ে জজের হুকুমে আমরা ওঁর গার্জ্জেন নিযুক্ত হয়েচি। বিষয়-সম্পত্তি না হলে কোথায় কি ভাসিয়ে দিতেন...

মেজকাকা মহাশয় একটি মাত্রশব্দ উচ্চারণ করিলেন,—এঁ্যা...সেই একটি শব্দে কতখানি নৈরাশ্য—শ্রীশ তা বুঝিল ; বুঝিয়া হাসিল।

মেজকাকা বলিলেন,—তা হলে আমাদের উপায় করে দিন, ভোলানাথবাবু। জ্ঞাতি-কুটুম্বে বাড়ী ভর্তি। আজ বিয়ে...

ভোলানাথ কহিল,—খরচ করেচেন, তা আদায় হয়ে গেছে নিশ্চয়। না হলে আপনাকে দেখলে এমন মনে হয় না যে, খামোকা এই পাত্রে কন্যাদান করতে এগিয়ে এসেচেন!

শ্রীশ কহিল,—কন্যা ওঁর নয়, ওঁর ভাইয়ের। এবং উনি স্বেচ্ছায় বিনানুরোধে গার্জেন-স্থলাভিষিক্ত হয়ে এই সুমহান্ ব্রতে...নগদ দু'হাজার টাকা অগ্রিম পেয়েচেন, শুনেচি।

ভোলানাথ কহিল,—টাকাটা? এতগুলো টাকা নিশ্চয় খরচ করেন নি?

—সেগুলো...বটে? হাঁ্যা! এমনি কতকগুলা অসম্বদ্ধ উক্তিমাত্র স্ফুলিঙ্গের মত মেজকাকার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল ; তার পর মেজকাকা সাক্ষী-সাবুদ, না কি ডাকিবেন, এমনি বলিয়া সদর্পে নামিয়া গেলেন...বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। তাঁর প্রত্যাগমন আর ঘটিল না।

পুলিশ আসিল—কিন্তু ব্যাপার শুনিয়া নিরাশ চিত্তে ফিরিয়া গেল। মেজ বৌ উহার মধ্যে কখন্ এক সময়ে...সেনানীদলও তাঁর সঙ্গে কর্পূরের মত উবিয়া গেছে।

লোকনাথের হাত ধরিয়া ভোলানাথ তাকে লইয়া বিদায় হইল।

তখন মা ডাকিলেন,—নীলা..

মেয়ে বাহিরে আসিল। মা শ্রীশের পানে চাহিলেন, কহিলেন,—কি হবে বাবা? এর পর ও-বাড়ীতে আর..

শ্রীশ কহিল,—না, আমিও নিষেধ করি।

মা কহিলেন,—কিন্তু মীরাট যাবার পয়সা...

নীলা কহিল,—আমার এই চুড়ি দু'গাছার কত দাম হতে পারে? এ গিনি সোনার—গিল্‌টি নয়। দেখুন...বলিয়া চুড়ি খুলিয়া নিঃসঙ্কোচে সে শ্রীশের হাতে দিল।

শ্রীশ নীলার পানে চাহিল। আষাঢ়ের বৃষ্টি থামিলে বাঙলার আকাশ যেমন দীপ্তশ্রীতে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে...নীলার মুখে তেমনি দীপ্তি!

শ্রীশ কহিল—আপনি আমার সঙ্গে আসুন। ও-চুড়ি বেচতে হবে না। আমি আপনাদের পৌঁছে দেবো। কিন্তু সুরথ আপনার ভাই তো?···কথাটা বলিয়া শ্রীশ নীলার পানে চাহিল।

নীলা কহিল,—তার যদি কোনো বুদ্ধি থাকে! এমন নির্বোধ...

শ্রীশ কহিল,—আপনারা নীচে আসুন। আমি একখানা গাড়ী ডাকি···আমার সঙ্গেই এখন যাবেন। তার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে আজই নয় মীরাটে ..

নীচে সেই প্রৌঢ়া? শ্রীশ আসিয়া সবিস্ময়ে দেখে, নাই ...কোথায় গেলেন? ..

ফটকের কাছে সেই ছোকরা। এ সুরথ.. নিশ্চয়। শ্রীশ কহিল,—তোমার নাম সুরথ?

ঘাড় নাড়িয়া সে জানাইল, হ্যাঁ।

—এখানে দাঁড়িয়ে?

কাঁদ-কাঁদ মুখে সে কহিল,—মেজকাকা বলে গেছে, তাঁর বাড়ীতে যদি ঢুকি তো জুতো মেরে সকলকে বার করে দেবেন। লোকনাথবাবুর ছেলে নালিশ করে টাকা আদায় করবে, বলে গেছে।

হুঁ! ব্যাপার তাহা হইলে এইখানেই হয়তো চুকিবে না!

শ্রীশ কহিল,—তুমি দাঁড়াও। তোমার মা আর দিদি রইলেন।

আমি গাড়ী ডেকে আনচি। খবর্দ্দার, কারো কথায় কারো সঙ্গে এখান থেকে নড়বে না!

সুরথ কহিল,—না।

শ্রীশ গাড়ী করিয়া দীননাথের গৃহে ফিরিল। বেলা তখন প্রায় তিনটা। দীননাথ বাহিরের ঘরে ছিল। সে কহিল,—ব্যাপার কি? মর্নিং-ওয়াক থেকে ফিরলে অবশেষে?

শ্রীশ কহিল,—অনেক কথা আছে ভাই···আপাততঃ একটা টাকা দাও...গাড়ী ভাড়া। তা তুমি এর মধ্যে কোর্ট থেকে ফিরলে যে?...

দীননাথ কহিল—এক হাকিম মারা গেছেন বলে কোর্টের হাফ-হলিডে···তাঁর অনারে।

—বটে! তা, বিস্তর অতিথ এনেচি। তাই দেরী হলো।

রাত্রে মীরাট যাইবে বলিয়া শ্রীশ বাহির হইতেছে, দীননাথ হাসিয়া কাণে-কাণে কহিল,—একেবারে সস্ত্রীক ফিরচো তা হলে?

শ্রীশ হাসিয়া জবাব দিল,—ধেৎ!

দীননাথ কহিল,—কেন! চিরকাল কি এমনি একলা থাকবে? যখন ঘটনাচক্র এমন দাঁড়ালো...উপন্যাসেও যে এমন হয় না হে! তাছাড়া খাশা হবে...a thing of beauty. শিক্ষিতা...বলো তো একটু ইঙ্গিত দি।

শ্রীশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামন—হবো কি?

দীননাথ কহিল—আমার গৃহিণী বলছিলেন, দ্যাখো, তোমার বন্ধু মীরাটেই বা থেকে যান্..

শ্রীশ কহিল,—ভবিতব্য! যদি তা ঘটে, আমি তাতে খুশীই হবো!

নিশির ডাক

গোড়ার কথা

দীননাথের কাগজের কারবার,—দোকান বাধাবাজারে। যত বড় বড় ছাপাখানা তার দোকান হইতে কাগজ লয়, সে-কাগজে একালের কত গল্প-উপন্যাসই যে ছাপা হয়! পাঠক-পাঠিকা সে-সব গল্প-উপন্যাস পড়িয়া মুগ্ধ হন্—কিন্তু দীননাথের দোকানের কাগজে যে সে গল্প-উপন্যাস ছাপা, এ খবর তাঁদের ক'জনই বা জানেন! এই কাগজের মারফৎ বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে দীননাথের পরিচয় এবং সে-পরিচয় যে ঘনিষ্ঠ, এ-কথা অনেক প্রকাশক ভালো করিয়া জানেন।

দীননাথের বয়স চল্লিশ বছর। যে-ভাবে সে মানুষ হইয়াছে, এবং ব্যবসায়-সূত্রে আধুনিক সাহিত্যের যে-হাওয়া তার গায়ে পরশ বুলাইতেছে, তাদের রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফলে সমাজ-বিধি-সম্বন্ধে ঘরে সে রহিয়া গিয়াছে সনাতন সেকেলে, এবং বাহিরে হইয়াছে পুরাপুরি আধুনিক। অর্থাৎ পরের ঘরের নারীকে সে পর্দ্দার বাহিরে দেখিতে চায়,—আলাপে-আচরণে তাঁদের কোনো কুণ্ঠা থাকিবে না! সঙ্গীত ও প্রেমের চর্চ্চায় তাঁদের সকল দিক দিয়া উৎসাহিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য! কিন্তু ঘরের মধ্যে নিজের পত্নী বিলাস-ভূষণের কোনো আব্দার তুলিবে না, কায়মনোবাক্যে স্বামীর দাসাবৎ জীবন যাপন করিবে, পর্দ্দার আবরণ এতটুকু শিথিল করিবে না, মুক্ত আলো ও হাওয়ার উপর কোনো দাবী রাখিবে না, ইত্যাদি।

ইহার ফলে দীননাথ থিয়েটারে যায়, বায়োস্কোপ দেখে, তরুণ-সভার বৈঠকে হাজিরা দিয়া নারীর অবাধ স্বাধীনতার আলোচনায় সহস্রমুখ হয়; এবং ঘরে পত্নী বনলতা ময়লা কাপড়-চোপড় পরিয়া

বাটনা বাটে, রান্না করে, ঘর ঝাঁট দেয়, এবং পতিকে দেবতা-জ্ঞানে তাঁর সর্ব্ববিধ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলে,—পথের ধারের জানলাগুলার কাছে ভুলিয়া দাঁড়ায় না—পাছে কেহ কোথা হইতে দেখিয়া ফেলে! এমনিভাবে দিন চলিতেছিল।

দীননাথের বাড়ী ঠিক সদর রাস্তার উপর নয়। সদর রাস্তা হইতে একটা সরু গলি পূর্ব্বমুখে চলিয়া গিয়াছে; সে গলিতে গাড়ী ঢোকে না। এই গলির মধ্যে তার বাড়ী।

দীননাথের একখানি মোটর-গাড়ী আছে। গাড়ীখানি ছোট আদালতের একটা দেন্‌দাবী-নিলামে নগদ সাতাশি টাকা মূল্যে সে খরিদ করিয়াছিল। ভারতে যখন প্রথম মোটর-গাড়ীর আমদানি হয়, এ গাড়ীখানি তখন এ-দেশে আসে। সুতরাং রহস্যপ্রিয় লোকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ যত করুক, ইতিহাসে এ-গাড়ীর রীতিমত মূল্য আছে। গাড়ী সে নিজে হাঁকায় না, সোফার আছে। সোফারটি খুব হুঁশিয়ার—নাম নফরা। দীর্ঘকাল গাড়ী হাঁকাইয়াও নফরা কোনোদিন মানুষ মারে নাই। তবে তার একটু মুদ্রাদোষ আছে—থাকিয়া থাকিয়া সে কেমন ঘুমাইয়া পড়ে। ষ্টিয়ারিংয়েও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। এজন্য দীননাথকে সর্ব্বক্ষণ গাড়ীতে একটু হুঁশিয়ার থাকিতে হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্যসখী

বেলা দশটা বাজিয়াছে। আহারাদি সুসম্পন্ন করিয়া দীননাথ কারবার দেখাশুনার কাজে গৃহত্যাগ করিল। পত্নী বনলতা সন্তর্পণে পথের ধারের ঘরের খড়খড়ির পাখী তুলিয়া পথের পানে চাহিল। পথ

ঐ একরত্তি গলি। দীননাথ বাড়ীর বাহির হইয়া দোতলার পানে চাহিল—এধারকার খড়খড়িগুলা বন্ধ আছে। নিত্য সে বাড়ীর বাহির হইবার সময় চাহিয়া দেখে, এধারে খড়খড়ি খোলা আছে কি না। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তার আদেশ যথারীতি পালিত হইতেছে, ইহাতে খুশী হইয়া নিশ্চিন্ত মনে সে যাত্রা করিল।

শাস্ত্রে আছে, পথে নর-নারী-দর্শন শুভযাত্রার লক্ষণ। সে দেখিল, গলির মুখে এক রূপসী তরুণী—একালের ফ্যাশনে শাড়ী-পরা, কাজেই মুখ ঘোমটায় ঢাকা নাই; পায়ে একজোড়া লাল রঙের ভেলভেটের নাগরা; দিব্য স্বচ্ছন্দ গতি! এ গলিতে এমন মূর্ত্তি সে কখনো চক্ষে দেখে নাই। তার বিস্ময় বোধ হইল। এবং মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের অমোঘ নিয়মের ফলে তার এই প্রথম বিস্ময়ে বিভ্রম এবং সে বিভ্রম ক্রমে মোহে রূপান্তরিত হইল! সে ঘাড় কাৎ করিয়া অবিচল নেত্রে এই মূর্ত্তিমতী বিদ্যুল্লতার পানে চাহিয়া থমকিয়া দাড়াইল। রূপসী তরুণীও তার পানে সচকিতে চাহিল। চারি চক্ষুর মিলন হইবামাত্র তরুণীর মুখে হাসি ফুটিল এবং সে গতির বেগ আর একটু ত্বরিত করিয়া দীননাথের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

দীননাথের মোহ ভাঙ্গিল। সে ঈষৎ অপ্রতিভ হইল এবং দ্রুতপদে আসিয়া মোটরে উঠিয়া বসিল। একখানা ট্যাক্সি তার মোটরের সামনে দাড়াইয়া ছিল। সে উঠিয়া নিজের গাড়ীতে বসিবামাত্র ট্যাক্সিখানা হুশ করিয়া চলিয়া গেল। নিজের অজ্ঞাতে দীননাথের দৃষ্টি পড়িল ঐ ট্যাক্সিখানার নম্বরের উপর—T 351. ট্যাক্সিখানা যেন কোন্ অমর লোক হইতে এক ত্রিদিব-বাসিনীকে আনিয়া তার গৃহে নামাইয়া দিয়াছে! কে ইনি?

দীননাথের সোফার গাড়ীতে ঠেশ দিয়া ঘুমাইতেছিল। দীননাথ

তাকে ধাক্কা দিল। সোফার তীর-বেগে উঠিয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। গাড়ী ভীষণ ধোঁয়া ছড়াইয়া প্রচণ্ড আর্ত্তনাদ তুলিল, তার পর সহসা চলিতে সুরু করিল। গাড়ীতে বসিয়া দীননাথ লক্ষ্য করিল, আশ-পাশের যত বাড়ী, দোকান, চলন্ত পথিক···সব মিলিয়া তালগোল পাকাইয়া একটা মাত্র ইংরেজী হরফ ও তিনটি অঙ্কের সৃষ্টি করিয়া চরকির মত ঘুরিতেছে! সে হরফটি T. এবং অঙ্কগুলি 351.

ওদিকে গৃহমধ্যে তরুণী আসিয়া প্রবেশ করিবামাত্র বনলতা ছুটিয়া নীচে নামিয়া আসিল, আসিয়াই তরুণীকে আবেগে বুকে জড়াইয়া ডাকিল—রাণী, রাণী ..

তরুণীর নাম রাণী। রাণী কহিল,—তুই! বনো! এ কি মূর্ত্তি! মাগো! সে শ্রী, সে রঙ্ কোথায় গেল!

বনলতা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—আয্যামির হোমকুণ্ডে সে-সব নিক্ষেপ করেচি, ভাই।

রাণী আপনাকে বনলতার বাহু-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল। পরে সে কহিল,—তার মানে? তোর কি চিরদিনই হেঁয়ালি চলবে?

বনলতা কহিল,—ভাগ্যে এই হেঁয়ালিটুকু আছে, নাহলে কি নিয়ে দিন কাটাতুম···!

রাণী কহিল,—খুলে বল্ দিকিনি সব।

বনলতা কহিল,—সে অনেক কথা। দাঁড়িয়ে কথা শোনার প্রথা বাঙলা থিয়েটারেই শুধু আছে। তা, এ তো থিয়েটার নয় ভাই, কঠিন সংসার। আর আমরাও জীবন্ত মানুষ, থিয়েটারের নাটকের পাত্র-পাত্রী নই। কাজেই সব কথা শুনতে হলে তোমায় উপরের ঘরে এসে বসতে হবে।

রাণী কহিল,—চলো।

দুজনে দোতলার ঘরে আসিয়া বসিল। মেঝের একধারে দীননাথের উচ্ছিষ্ট পড়িয়া আছে। বনলতা কহিল,—খাবি তো?

রাণী কহিল,—না। আমি খেয়েই আসচি। তোর খাওয়া হয়েচে?

বনলতা কহিল,—না।

রাণী কহিল,—তবে খেতে বোস্। খেতে খেতে তোর ভাগ্যের কাহিনী বলবি আর আমি তোর সাম্‌নে বসে খাওয়া দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে-কাহিনী শুনবো।

বনলতা কহিল,—তাহলে একটু অপেক্ষা কর্, আহারের জোগাড় দেখি।

রাণী কহিল,—বামুনকে ডেকে বল্ না।

বনলতা কহিল,—বামুন তো নেই।

রাণী কহিল,—কেন? কোথায় গেল? উড়ে বামুনদের রকম কি সর্ব্বত্রই এক! বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর!

বনলতা কহিল,—বামুন আমার নেই, তা যাবে কোথায়! এ আর্য্য-গৃহ, বুঝলি! আমি আর্য্য-গৃহিণী—নিজের হাতে স্বামীকে রেঁধে খাওয়াতে হয়, স্বামীর খাওয়া হলে তাঁর পাতে প্রসাদ পাই…

রাণী কহিল,—অবাক্ করলি ভাই! অথচ তোর স্বামীর অবস্থা তো ভালোই…

বনলতা কহিল,—তা হোক। তিনি আর্য্যজাতীয়.. এবং আর্য্যামির গর্ব্ব তাঁর ষোল আনা!

রাণী কহিল,—তাই এই পাত পাড়া হয় নি, বুঝি? ও! তা বেশ, বসো—দেরী করলে ওই দেব-বাঞ্ছিত পাত্রখানি রোগের খনিতে

পরিণত হবে। যে-রকম মক্ষিকার প্রাদুর্ভাব...একালের পাশ্চাত্য শাস্ত্রে বলে, মক্ষিকাই সকল রোগের বাহন এবং রোগের ব্যাসিলি ভক্তি-টক্তির কোনো তোয়াক্কা রাখে না!

বনলতা হাসিয়া নীচে নামিয়া গেল এবং আহার্য্য আনিয়া পাতে ঢালিয়া ভোজনে মনোনিবেশ করিল।

রাণী কহিল,—কিন্তু তোর স্বামী এমন...! একবার দেখতে হবে।

বনলতা কহিল,—চোখে চোখে মিলন তো হলো বাড়ী ঢোকবার মুখে...

রাণী সকৌতূহলে প্রশ্ন করিল,—তার মানে?

বনলতা কহিল,—ওই তো তুই আসছিলি, আর উনি বেরুচ্ছিলেন...

রাণী কহিল,—যে মিন্সে ওই...মাপ কর্ ভাই, তোর দেবতার উদ্দেশে একটা অভদ্র ইতর কথা বলে ফেলেচি—যে-রকম চোখে চাইছিল, যেন চোখ দিয়ে খেয়ে ফেলবে...তার ব্যবহারকে লক্ষ্য করে বলেচি...

বনলতা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তার জন্য অত সঙ্কোচ কেন! তুই তো ব্যাকরণ ভুল করিস্ নে ..

রাণী কহিল,—ওই তোর স্বামী-দেবতা! বেশ রসিক দেখলুম ...আমার পানে যে কটাক্ষ হান্‌ছিলেন, আমার এই আধুনিক সাহিত্যের নায়কগুলোর কথা মনে পড়ছিল। শুধু চেহারার যা তফাৎ...নাহলে আচরণ...

বনলতা কহিল,—অথচ জান্‌লার ধারে আমার দাঁড়াতে মানা। পাছে...

রাণী কহিল,—চোখের ইঙ্গিতে দুনিয়া ওলোট-পালোট করে দাও! তাহলে খাশা আছিস্, দেখ্‌চি।

বনলতা কহিল,—তা আর বলতে! সব সয় ভাই, শুধু এই ইতর নিষেধগুলো গায়ে যেন কাঁটার চাবুক মারে! এর চেয়ে মরণ ঢের ভালো।

রাণী কহিল,—এমন অভদ্র মনও মানুষের হয়! ছি! তা একটা ফন্দী এঁটে জব্দ করে দেবো?

বনলতা কহিল,—তাতে আমিই বেশী জব্দ হবো।

রাণী হাসিল, হাসিয়া কহিল,—না লো না,···বাঙ্‌লা ছোট গল্প পড়িস্ না? তারি একটা প্লট একটু এদিক-ওদিক করে খাশা বেকুব বানিয়ে দিতে পারি...তোমার এই প্রাণসখাটিকে...

বনলতা কহিল,—তাতেই নিয়ম পাল্‌টাবে?

রাণী কহিল,—তার সঙ্গে থাকবো আমি...ছাখ্ না মজা!

বনলতা কহিল,—তুই যে বাঙ্‌লা ফার্শ গড়ে তুলবি, ভাবচিস্...! জীবনটা ফার্শ নয়। মানে, ফার্শে দেখিস্ না, একজন পদে পদে আস্পর্দ্ধার পরিচয় দিয়ে চলেছে, তার পর শেষ দৃশ্যে একটু বেকুবির অবতারণা, অমনি হীরো নাক-কাণ মলে বলে উঠলো, বটে! ব্যস্! আর নয়—আস্পর্দ্ধার চরম হয়েচে, আজ থেকে আমি নতুন মানুষ!...এ-সব আজগুবি পরিবর্ত্তন আনাড়ির লেখা বইয়ে চলে—বুদ্ধিমান্ বিধাতার কলমের মুখে এ-সব আজগুবি অনাসৃষ্টি কখনো বেরোয় না ভাই।

রাণী কহিল,—স্কুলে পড়েছিলি না—যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কুত্র দোষঃ! একটু মজা—তোর এ একটানা অন্ধকার জীবনে আলোর একটু বিদ্যুৎ-বিকাশও ঘটবে তো!

বনলতা কহিল,—ছাখ্...

রাণী কহিল,—আজ উপক্রমণিকা সেরে চলে যাবো। কাল সকাল-সকাল আসবো. বেলা আটটায়। তাহলে তোর ওঁর সঙ্গে দেখা হবে তো?

বনলতা কহিল,—হবে।

রাণী কহিল,—সেই কথাই তবে রইলো!

তার পর বনলতার আহার সম্পন্ন হইলে দুই সখীতে বসিয়া বহু কথা হইল এবং বেলা পাচটায় রাণী বিদায় লইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চিত্ত-চাঞ্চল্য

সন্ধ্যা ছ'টায় দীননাথ বাড়ী ফিরিল। হাত-মুখ ধুইয়া নিজের ঘরে আসিয়া দেখে, টেবিলে একখানা চিঠি, খামে আঁটা। ডাকে আসে নাই। খামের উপর তারই নাম—মেয়েলি হাতের লেখা।

—সকৌতূহলে খাম ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িয়া সে দেখে, চিঠিতে লেখা আছে—

ওগো মন-বনের বিহঙ্গ, কি সুরে ভোলালে আমায়, তা তুমিই জানো। কে বলে, তরুণ না হলে প্রেম জাগে না! তরুণ নেহাৎ কাঁচা! তোমার প্রেমের আশায় প্রাণে মণিদীপ জেলে আমি বসে আছি! তোমার প্রীতি পাবো না?

পায়ে নিষেধের শত শিকল ঝম্‌ঝম্ বাজে। এ শিকলের ভার কত আর বহি, বলো? বাহিরের ওই উদার মুক্ত হাওয়ায় ডানা মেলে বেড়ানোর আশা কি একান্ত দুরাশা?

কাল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের ফটকে থাকতে পারবে? নীল-শাড়ী পরা তরুণী তাহলে মনের কথা কবার অবকাশ পায়। শুনলে এমন কোনো অনর্থ ঘটবে না—এ আশা অকুতোভয়ে দিতে পারি। ইতি

সুর-ভোলা অবলা

দীননাথের অঙ্গে রোমাঞ্চ হইল—এ কি সম্ভব! এ চিঠি তার? হাঁ, খামে এই যে তারি নাম! কিন্তু কে এ অবলা? কোথায় থাকে? কোথায় তাকে দেখিল?...কারো ফন্দী নয় তো?

কিসের ফন্দী? সে কারো সঙ্গে কোনো দুশ্‌মনি করে নাই! তবে...?

যাইতে হইবে! আজকালকার উপন্যাসে-গল্পে এমন তো ঘটিতেছে! তার প্রতিধ্বনি জীবনে জাগিতে পারে, এ কল্পনা তার মনে কখনো স্থান পায় নাই!...প্রাণটা খুশীতে ভরিয়া উঠিল; পাঁচশো রীম কাগজের অর্ডার পাইযাও সে কখনো এমন খুশী হয় নাই!...

কাল! আজই দেখা করিতে বলিল না কেন? তার হাতে এমন কোনো কাজ ছিল না! কাল? তার মানে, এখনো চব্বিশ ঘণ্টা!...সে যেন এক যুগ!

বনলতা পানের ডিপা হাতে প্রবেশ করিল। দীননাথ কহিল,—রেখে চলে যাও। আমায় বিরক্ত করো না। একটা কাজের কথা ভাবচি!

বনলতা হতাশ দীন-নেত্রে দীননাথের পানে চাহিল। দীননাথ তখন প্রেমের স্বপ্নে এমন মশ্‌গুল যে, সে দৃষ্টি তার নজরে পড়িল না!

দীননাথ ভাবিল, এই একটানা নীরস জীবন মানুষের পক্ষে বহা অসম্ভব! কুলজা চাটুয্যে ঠিক কথা লেখে—তার লেখায় কোথাও বাধা-নিষেধ নাই তাকে এবার বিনা-লাভে কাগজ সাপ্লাই করিব!...

পলে পলে তরঙ্গ বিস্তারে চিন্তা সাগরের মত উত্তাল হইয়া উঠিল। দীননাথের ছোট বুকে সে তরঙ্গের উদ্দাম নৃত্য-লীলা...বহিয়া বেড়ানো সম্ভব নয়! দীননাথ ডাকিল,—নফরা..

নফরা নীচে বাসন মাজিতেছিল; মনিবের ডাকে উঠিয়া আসিল। মনিব বলিল,—গাড়ী ঠিক আছে?

নফরা কহিল,—আছে।

দীননাথ কহিল,—তৈরী হয়ে নে। এখনি বেরুতে হবে। বিশেষ দরকার।

নফরা গাড়ী ঠিক করিতে গেল। দীননাথ মুখে সাবান ঘষিল, তার পর শুভ্র বেশে সজ্জিত ভূষায় বাহির হইয়া পড়িল। পাশের বাড়ীতে গ্রামোফোনে গান বাজিতেছিল,—লয়লা কি খেলা খেলে, এ যে নতুন খেলা!...

নফরার নিদ্রার মধ্য দিয়া সেই মোটর চালানো—এবং মোটর আসিয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের সামনে দাঁড়াইল। দীননাথ গাড়ী হইতে নামিল, নামিয়া চারিধারে চাহিল। সাহেব-মেমের ভিড—ছেলেমেয়েরা ঐ ছুটাছুটি করিতেছে! দীননাথের সাবেক মোটর সেখানে দাঁড়াইতে তার শ্রী দেখিয়া মেমেরা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল, তাদের ছেলেমেয়েরা নিদ্রালু নফরাকে লক্ষ্য করিয়া মাটীর ঢেলা ছুড়িতে লাগিল। নীল শাড়ীর চিহ্ন কোথাও দেখা গেল না! নীল ফ্রক দু-চারিটা দেখা গেল—কিন্তু সেদিকে চোখ তুলিয়া চাহিতে প্রাণে শঙ্কা জাগে!

সহসা দীননাথের খেয়াল হইল, তার ঐ মোটর এখানকার লোকগুলির মনে অনেকখানি কৌতুকের সঞ্চার করিয়াছে! এ গাড়ী রাধাবাজারের পথে নিরুপদ্রবে দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু এ সৌখীন পাড়ায় বহু বিঘ্ন।

'সুর-ভোলা অবলা' এ জায়গা মনোনীত করিল কি বলিয়া? এই ভিড়ে প্রাণের গোপন কথার নিবেদন অবাধে চলা কি সম্ভব!

তার চেয়ে ইডন্ গার্ডন—এখন অনেকটা পরিত্যক্ত, উপেক্ষিত, কাজেই সে জায়গা নিরালা হইত! ঠিকানাও চিঠিতে দেওয়া নাই। থাকিলে এক লাইন লিখিয়া সবিনয়ে দীননাথ এ ভুলটুকু দেখাইয়া দিত!

দাঁড়াইয়া বসিয়া ঘুরিয়া বহুক্ষণ কাটিল ...আশ-পাশের হাস্য-কলরব কমিয়া আসিল। প্রণয়ী-প্রণয়িনীর আবিভাবে স্থানটুকু ক্রমে তার পক্ষে দুর্বহ হইয়া উঠিল। কারণ, এরা ইংরাজ প্রণয়ী-প্রণয়িনী...কালা লোকের সান্নিধ্যে মেজাজ হয়তো সহসা চটিয়া উঠিতে পারে! গাড়ীতে চড়িয়া দীননাথ নফরাকে কহিল,—বাড়ী চল্ ..

আহারাদি সারিয়া শয্যার আশ্রয়ে চক্ষু মুদিয়া 'সুর-ভোলা অবলা'র একখানি মুখ সে কল্পনার তুলিতে বুকের উপর আঁকিতে লাগিল। যতই রঙ ফলাক, তবু নাক-মুখ-চোখ হুবহু দাঁড়ায় ওই বিবাহিতা পত্নী শ্রীমতী বনলতার মত! দীননাথ বিরক্ত চিত্তে সে-মুখ মুছিয়া সকালের সেই গলি-পথ-চারিণী কিশোরীর মুখ স্মরণ করিবার প্রয়াস পায়, কিন্তু হায়রে, চকিত-চরণার সে-মুখ তেমন ভালো করিয়া দেখিতে পায় নাই যে .

গাঢ় নিদ্রার মধ্য দিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল,—যেহেতু সময় কাহারো মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে না! এবং প্রভাতে দীননাথের চিত্ত আশায়-পুলকে সজীব সরস হইয়া উঠিল। বনলতাকে সে বারবার বলিয়া দিল, আজ বাড়ী ফিরিতে রাত হইতে পারে—বিশেষ জরুরি কাজ আছে। হয়তো বাহিরে খাইয়া আসিবে। সে যেন ওবেলায় আহারাদি সারিয়া লয়!

বেলা আটটা...তেল মাখিয়া দীননাথ স্নান করিতে চলিল। বনলতা কহিল,—এত তাড়াতাড়ি যে?

দীননাথ অপ্রতিভ হইল; কিন্তু সে-ভাব চাপিয়া কহিল—একটু তাড়া আছে। একটা বড় অর্ডার.

—ওঃ! বলিয়া বনলতা কোটা আনাজগুলো লইয়া রান্নাঘরে ঢুকিল।

স্নান করিয়া নিজের ঘরে আয়নার সাম্নে দাঁড়াইয়া দীননাথ মাথায় ব্রশ চালাইতেছে, এমন সময় বাহিরে রমণী-কণ্ঠে সুমধুর স্বর জাগিল,—কোথায় আমাদের বন্ধুবর—তোমার প্রিয়তম?

সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পগন্ধে চারিদিক সুরভিত করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন—কালিকার গলি-পথচারিণী চকিত-চরণা সেই তরুণী! দীননাথের দুই চক্ষু বিস্ময়ে সুগোল আকার ধরিল এবং তার বিস্ময়ের মাত্রা কমিবার পূর্ব্বেই তরুণী কহিল,—আপনি আমার বাল্যসখী বনলতার স্বামী—সুতরাং আমারো বন্ধু!

পত্নীর উপর চকিতে দীননাথের শ্রদ্ধা জাগিল। এমন সুরূপা, সুবেশা, সুভাষিণী তরুণী তার পত্নীর বাল্যসখী!...বাঃ!

রাণী কহিল,—আপনি অবাক্ হয়ে রইলেন যে! বিস্ময়ের কারণ নেই...যেহেতু কাল সকালে আমাদের চার চক্ষে মিলন ঘটেছিল...যদিও স্থানটা বিশ্রী...আপনার বাড়ীর সামনেকার ঐ নোংরা সরু গলির মধ্যে! ক্ষমা করবেন--আপনাকে চিনতুম না বলে কোনো রকম অভিবাদন করতে পারিনি!

দীননাথের বাকস্ফূর্ত্তি হইল না! এই মূর্ত্তি, আর এমন অলঙ্কার-সরস বাক্‌ভঙ্গী...একালের গল্প-উপন্যাসেই সে যা পড়িয়াছে! ঠিক। জীবনে এমন না ঘটিলে তারা কি আর মিথ্যা কথা লিখিয়াছে!

রাণী কহিল,—মাথায় ব্রশ্‌ চালাচ্ছেন! ও কি. ব্রহ্মতলের চুলগুলো যে বুলবুলির ঝুঁটির মত উঁচু হয়ে রইলো! এ আমার সখীর

দোষ। দেখে ব্রশ করে দিতে পারে না! এই বুঝি স্বামিসেবা! ব্রশটা দিন্ তো আমার হাতে...

ব্রশ দিতে হইল না। রাণী দীননাথের হাত হইতে ব্রশটা টানিয়া লইয়া দীননাথকে কহিল,—আপনি বসুন ঐ চেয়ারে .

যন্ত্র-চালিতের মত দীননাথ তাই করিল। রাণী সাম্‌নে দাঁড়াইয়া দীননাথের মাথায় ব্রশ চালাইতে লাগিল, দীননাথের মাথা যেন ঘুরিতে লাগিল! রাণী বনলতাকে কহিল,—এমনি করে এদিক ওদিক ব্রশ চালাবি। স্বামীর মাথা বলে বেজায় ভক্তি-ভরে স্পর্শ করবি না—এ বা কি রকম? হাজার হোক, মানুষ-দেবতা, মন্দিরের পাষাণ দেবতা তো নয়! এতে কোনো পাপ হবে না। এ সেবাটুকু না করলেই পাপ! আমার কাজ এই—তাঁর মাথা আমিই আঁচড়ে দি...যতবার দরকার, ততবারই ..

দীননাথ ভাবিল, সাথক জন্ম এই রূপসীর 'ওঁর'···এমন যত্নে কেশের পারিপাট্য সাধিত করেন!...

রাণী কহিল,—একটা কথা বলবো। শুনতে হবে...

দীননাথ অকৃতজ্ঞ নয়। সে কহিল,...বলুন...

রাণী কহিল,—আজ বিকেলে আমাদের ওখানে আপনাদের নিমন্ত্রণ.. ঐখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে সেই অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরবেন.. বুঝলেন!

মুস্কিল! ওধারে আজ সন্ধ্যায়···তাই তো! সে, না, সেদিকটায় অমনোযোগী হওয়া ঠিক নয়! একটা মস্ত সুযোগ! অথচ এদিকটাও রক্ষা করা চাই!

দীননাথ কহিল,—তাইতো, ওবেলায় একটু জরুরি কাজ আছে... তা রাত ন'টা দশটায় গেলে চলবে?

রাণী কহিল,—বেশ। সখীকে আমি নিয়ে যাচ্ছি—আপনি রাত নটা-দশটায় যাবেন, খাওয়া-দাওয়া করে ওকে নিয়ে আসবেন।

দীননাথ কহিল,—ঠিকানা ?

রাণী হাসিল, হাসিয়া কহিল,—ঠিকানা দেবো বৈ কি। নাহলে কি করে আপনি যাবেন ?

দীননাথ কহিল,—যে আজ্ঞে।

রাণী কহিল,—সখীকে আমি ছুপুরবেলায় নিয়ে যাবো, কেমন ?

দীননাথ কহিল,—বেশ।

মাথায় ব্রশের কায্য শেষ হইল। রাণী কহিল,—দেখে যা সখী—রোজ ছুবেলা মাথা এমনি ঠিক করে দিবি, বুঝলি ? আপনার অনুমতি আছে তো দীনুবাবু ?

দীননাথ হাসিয়া কহিল,—নিশ্চয়।

—দোকানে এক বিভ্রাট ! প্রকাণ্ড কোন্ সাহেবী ফার্ম্মের অর্ডার পাঠাইয়া বিল তৈরী করিয়া দরোয়ানকে দীননাথ বলিয়া দিল,—টাকা নিয়ে আস্‌বি।

দরোয়ান চলিয়া গেল।

বাড়ীওয়ালার ভাড়ার বিল আসিয়াছিল। টাকা গণিয়া দিতে পাঁচ টাকা বেশী চলিয়া গেল। খুচরা ছ'রীম কাগজ কিনিয়া এক প্রেসওয়ালা কুড়ি টাকার নোট দিল। দাম ষোল টাকা এগারো আনা—তাকে চারটাকা পাঁচ আনার পরিবর্ত্তে পাঁচটাকা সাত আনা ফিরাইয়া দিল। লোকটা অবাক্ হইয়া একবার দীননাথের পানে চাহিল, পরক্ষণে কুলির প্রত্যাশায় না দাঁড়াইয়া নিজেই কাগজের মোট বহিয়া সরিয়া পড়িল !

আধ ঘণ্টা পরে দরোয়ান ফিরিয়া সংবাদ দিল, সাহেব গালি দিয়া মাল ফিরাইয়া দিয়াছে।

—কেন ?

দরোয়ান কহিল,—সাহেব যে কাগজ চাহিয়াছিল, সে কাগজের পরিবর্ত্তে বালির কাগজ দেওয়া হইয়াছে। তাছাড়া বিলের টাকা মোট ৪৩৭৲ টাকার পরিবর্ত্তে যোগ দিয়া ৫১৭৲ টাকা করা হইয়াছে।

দীননাথ বিল লইয়া দেখে, ইঃ, তাইতো, যোগে ভারী ভুল হইয়াছে! দরোয়ানকে হাঁকিল,—বালির কাগজ রেখে ওই বাণ্ডিল নিয়ে যা...

দরোয়ান বলিল,—সাহেব বলিয়াছে, কাগজ কাজ নাই। তার জরুরি দরকার ছিল। সে অন্য দোকান হইতে কাগজ আনাইয়া লইবে!

এত-বড় অভাবটা…! তাইতো!

দীননাথ বিরক্ত হইল। নাঃ—কাজ বেশ চলিতেছিল। এমন ভুল তার কখনো হয় নাই! শুধু ঐ সুর-ভোলা অবলা...

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিল, দূর হোক—কারবার ঢের করিয়াছি। এখন একটু আরাম চাই! মন...মন...মনকে সে আর পিপাসু রাখিবে না!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সে আসে ধীরে,
যায় লাজে ফিরে।

সাড়ে পাঁচটায় আজ দোকান বন্ধ হইল! লোকজন মহা খুশী। বিশ বছরের মধ্যে এ দোকানে এমন কাণ্ড ঘটে নাই! বাবুর এমন সুমতি ঘটিয়াছে......

গাড়ী বাড়ী-মুখো দেখিয়া দীননাথ হাঁকিল,—না, ধর্ম্মতলার দিকে।

নফরা ধর্ম্মতলার দিকে গাড়ী চালাইয়া দিল।

ঐ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল। পথের এক ধারে গাড়ী রাখিয়া উন্মনা দীননাথ বেঞ্চে বসিল। দৃষ্টি চতুর্দ্দিকে ফিরিতেছে। গাড়ীর পর গাড়ী চলিয়াছে—প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী, রিক্‌শ—লোকের পর লোক—সাহেব হইতে কুলি, কেরাণী হইতে পাহারাওয়ালা অবধি! নীল শাড়ীর প্রান্তটুকু শুধু...হাওয়ায় কোনোদিকে তার উড়িবার লক্ষণ নাই! দীননাথ চিঠিখানা বাহির করিয়া পড়িতে বসিল—কাল সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের সামনে...

ঐ যে একখানা লাল মর্শ্‌-কারের মধ্যে...নীল শাড়ীর পাতকা না? হাঁ। আঃ!

দীননাথ ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল. নিজের গাড়ীর কাছে আসিয়া দেখে, নফরা চিরাভ্যাসমত নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। ডাকিয়া ধাক্কা দিয়া তাকে তুলিয়া দীননাথ গাড়ীতে বসিল, কহিল—
—চালা—জোরে চালা, শীগ্‌গির.

নফরা লাফাইয়া নীচে নামিয়া হ্যাণ্ডেল ঘুরাইয়া ষ্টার্ট দিতে উদ্যত হইল। হ্যাণ্ডেল যত ঘোরায় ঘোরে, কিন্তু সেই আশ্বাসে-ভরা ঝর্‌-র্‌-র্‌ রব গাড়ীর অঙ্গের কোনো স্থান ভেদ করিয়া উঠিতে চায় না!

দীননাথ কহিল,—হলো কি?

নফরা কহিল,—আজ্ঞে, ষ্টার্ট হচ্ছে না।

দীননাথ কহিল,—হচ্ছে না!

গলদঘর্ম্ম নফরা জবাব দিল,—না।

হতাশভাবে দীননাথ চারিদিকে চাহিল, ট্যাক্সি...একখানা ট্যাক্সি...

বেচারা সেক্‌শ্‌পীয়রের রিচার্ড দি থার্ড নাটক পড়ে নাই। পড়িলে বুঝিত রিচার্ডের সেই উক্তি,—A horse! A horse! my kingdom for a horse, আজ তার পক্ষেও কেমন হুবহু খাটিয়া যায়! এক...এক সেকেণ্ড···ওঃ, দীননাথ ধারে কাগজ দিতে রাজী, কোথায় কে প্রকাশক আছো, একখানা শুধু গাড়ী দিয়া তার জীবনের এই চরম ও পরম মুহূর্ত্তটিকে সফল করিয়া দাও গো!...

পনেরো মিনিট পরে গাড়ী সেই মধুময় আশ্বাস-বাণী তুলিল। কিন্তু সে মর্ম্ম-কার তখন...?

কোথায় বা নীল শাড়ীর সে বিজয়-নিশান! গাড়ীখানার নম্বরও যদি দেখিয়া রাখিত!...

দীননাথের বুকের উপর যেন ঐ আকাশখানা ঝুপ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল! সঙ্গে সঙ্গে ঐ আধখানা চাঁদ আর তার আশপাশের যত ঝিকিমিকি নক্ষত্রগুলা! মাঠের চতুর্দ্দিক বেড়িয়া গ্যাসের থামে আলোর মালা জ্বলিতেছিল। সেগুলা যেন কার নির্ম্মম আকর্ষণে ছিড়িয়া আঁধারে লুটাইয়াছে! দীননাথের মাথা ঘুরিয়া গেল— সে চক্ষু মুদিল।

যখন চোখ চাহিল, তখন দেখে, বাড়ীর সেই গলির মুখে গাড়ী আসিয়া থামিয়াছে!...অদূরে সেই বাড়ীটায় তেমনি গ্রামোফোন চলিয়াছে—তবে লয়লার গান নয়। গ্রামোফোনে তখন বাজিতেছে,—

কোথা আলো,—ওগো অন্ধ নয়ন,
আলেয়ায় ছলিয়াছে!

ছলনা! শুধু আলেয়ার ছলনা সার! হায়রে, নীল শাড়ী...

রাত ন'টায় সখীর কাছে নিমন্ত্রণ। থাক, আর পারা যায় না! মন অবসাদে আচ্ছন্ন—যাইবার শক্তি নাই!

দোতলায় উঠিয়া দীননাথ দেখে, টেবিলের উপর চিঠি। সেই হাতের অক্ষর! বিভ্রম? না,—চিঠি সত্যই!

চিঠিখানা তুলিয়া পড়িয়া দেখে, লেখা আছে—

নির্ম্মম, পাষাণ……তরুণীর এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলে! তার চেয়ে আমায় গুলি করিয়া মারিলে না কেন? আমায় পথে ফেলিয়া বুকের উপর দিয়া তোমার মোটর গাড়ী চালাইয়া গেলে না কেন? তাতেও বুকে এমন বেদনা বাজিত না! প্রেম-ভিখারিণী নারী……তার যে প্রতিপদে ভয়—তা'ও সে গ্রাহ্য করে নাই। হায় নিষ্ঠুর, তবু এ অবহেলা……

মন মানে না। আবার আঘাত পাইতে চায়! কাল বেলা পাঁচটায় বালিগঞ্জ এভেনিউর কাছে লেকে -ঠিক ঐ মাঝের দ্বীপখণ্ডের সাম্‌নে আসিয়ো। নহিলে লেকের কালো জলে মনের এ জ্বালা নিভাইব। কালিকার নিশানা—লাল শাড়ী! মনে রাখিয়ো।

--সুর ভোলা অবলা

মনের মধ্যে নিমেষে ফাগুন জাগিল! শত বিহঙ্গের কাকলী-কলরবে মন মাতিয়া উন্মাদ হইল। আরাম, আরাম, এ দুনিয়ায় এমন আরাম আছে! আঃ!

আলমারি হইতে সদ্য-প্রকাশিত হালের উপন্যাস-মণি 'গোয়ালা পাড়া' খুলিয়া দীননাথ পড়িতে বসিল। পড়ায় মন লাগিতেছিল না। 'গোয়ালাপাড়া'র প্রথম পরিচ্ছেদে নায়িকা উতলার উদাস মনের গতির তালে দীননাথের মন দোল খাইতে লাগিল।

আবার সেই কণ্ঠস্বর!—বাঃ, খুব গেলেন তো! একজন মহিলার মর্য্যাদার দাম নেই আপনার কাছে!

দীননাথ অপ্রতিভ হইল। সেই নীল শাড়ী এখানে আসিয়াছে! চমকিয়া চোখ তুলিয়া সে দেখে, না, নীল শাড়ী নয়—স্ত্রীর বাল্যসখী সেই রূপসী তরুণী!...দু' নম্বরের চিঠিখানা পাইয়া দুনিয়ায় আর

কোথায় কি আছে, বেচারা ভুলিয়া গিয়াছিল। ফশ্ করিয়া কোনো জবাব তার মুখে জোগাইল না।

রাণী কহিল,—নারী না হয়ে যদি ব্লটিং প্যাড কি টিটাগড় মিলের কাগজ হতুম, তাহলে আমার দাম থাকতো, না ?

দীননাথ কহিল,—খেটে-খুটে...

রাণী কহিল,—পরিশ্রান্ত হয়েচেন! গিয়ে নয় দেখতেন, সে শ্রান্তি দূর করতে পারতুম কি না...

মেয়েটি বেশ! বাঃ! কথাগুলার মধ্যে একালের হাওয়ার মিঠা পবশ! তাই ? না, সুরভোলা অবলার মত এ তরুণীও... ?

রাণী কহিল,—বেশ...আমাদের তো মান নেই, অভিমান নেই... আমরা অবলা নারী মাত্র......

দীননাথ কহিল,—মাপ করবেন। আর একদিন আমায় সুযোগ দেবেন...

রাণী কহিল,—বটে! বেশ, কালই তাহলে...কেমন ? ভুলবেন না যেন! বলেন তো, ওঁকে বল্‌বো, এসে আপনাকে নিয়ে যাবেন...

দীননাথ কহিল,—না, না, তাঁকে আবার কষ্ট দেওয়া কেন! আমি নিশ্চয় যাবো।

রাণী কহিল,—ম্যাটিনী পাঁচটায় ?

চিঠির কথা মনে পড়িল—লেকের ধারে এনগেজ্‌মেণ্ট!

দীননাথ কহিল,—না, তা বোধ হয় হয়ে উঠবে না...তবে ঐ রাত ন'টায়।

রাণী কহিল,—কথা পাকা রইলো .....! কেমন ?

দীননাথ কহিল,—নিশ্চয়।

রাণী কহিল,—আজকের গর-হাজিরের জন্য কিছু জরিমানা চাই।

দীননাথ কহিল,—বলুন...

রাণী কহিল,—আজকের মত কালও সখীকে নিয়ে যাবো। তার পর আপনি গিয়ে তাকে নিয়ে আসবেন।

হাসিয়া দীননাথ কহিল,—আচ্ছা।

রাণী ডাকিল,—সখী...

বনলতা আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। রাণী কহিল,—দেখুন দিকিনি, সখীর সাজ—কেমন মানিয়েচে! আপনার মনের মত সাজাতে পেরেচি?

দীননাথ চাহিয়া চাহিয়া স্ত্রীকে দেখিল। সাজিলে তার এই নিত্যকার স্ত্রীটিকেও নেহাৎ মন্দ দেখায় না তো! কিন্তু না...শুধু সাজে কি হইবে? এ স্ত্রী! দীননাথ কহিল,—দরকার কি..? স্ত্রীর এত বেশ-বিন্যাস...

রাণী হাসিয়া উঠিল, কহিল,—সব স্বামীই যদি স্ত্রীদের সম্বন্ধে এমনি রায় দেন, তাহলে পথে-ঘাটে কি-সুখে বিচরণ করবেন আপনারা? সুবেশা সজ্জিতা সুরূপার দর্শন কোথায় পাবেন? দুনিয়ার শোভাই যে তাহলে আপনাদের চোখে ম্লান নির্জীব হয়ে পড়বে...

কথাটা সঙ্গীন। দু'দিনের দু'খানি চিঠিতে এ-কথার মর্ম্ম দীননাথ হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে। সে কোনো জবাব দিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

টায়ার-বিভ্রাট

পরের দিন আবার তেমনি চাঞ্চল্য। তবে আজ তার মাথায় বিস্তর প্ল্যান খাটিতেছে। প্রথম, নফরাকে আজ সে শুভ্র বেশে সজ্জিত

করিয়াছে ; গাড়ীটা দুপুরবেলার সাফ্ করাইয়াছে—ষ্টার্ট দিতে গতি না ফশ্‌কাইয়া যায় ! কালিকার নিদ্রালুতার জন্য নফরার দু'টাকা জরিমানার হুকুম হইয়া গিয়াছে—সাবধান নফরা, আজ হুঁশিয়ার ! আবার যেন...

বেলা সাড়ে তিনটায় আজ দোকান বন্ধ হইল। লোকজন ভাবিল, সত্য যুগ আবার ফিরিয়া আসিতেছে না কি !. তারা হরির লুট মানত করিল—এক মাস এমনি চলিলে, নগদ সাড়ে সাত আনার বাতাসা...

দীননাথ প্রথমে আসিল ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে এক হেয়ার-কাটারের দোকানে, জুল্‌পি ছাঁটিয়া ভালো করিয়া দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া লইল। তার পর মিউনিসিপ্যাল মার্কেট। সেখানে তারে-গাঁথা প্রকাণ্ড ফুলের মালা কিনিল, নগদ পাঁচ টাকা মূল্যে। পকেটে একটি রঙীন কাগজ ছিল, সেই কাগজটায় বিখ্যাত আধুনিক কবি অশ্রান্তকুমারকে দিয়া দু'ছত্র লিখাইয়া আনিয়াছিল "উতলা রজনীর সচেতন স্মৃতি-ভবা প্রণয়-প্রীতির বিনোদ-মালা—প্রণয়-সুখে সুখী দীন দীননাথ।" মালার সঙ্গে সেই কাগজটুকু আঁটিয়া সে গাড়ীতে আসিয়া বসিল, বসিয়া নফরাকে কহিল,—লেকে চল্ ..

নফরা সবিস্ময়ে প্রভুর পানে চাহিল।

দীননাথ কহিল,—কালীঘাটের ট্রাম-ডিপোর পর মনোহরপুকুর। সেই দিকে...

—ওঃ ! বলিয়া নফরা গাড়ী চালাইল।

ছবির পর ছবি—নানা রঙে রঙীন। দীননাথের বুকের উপর ঢেউ তুলিয়া ছবির মালা ভাসিয়া চলিয়াছিল ! লেকের ধারে আসিয়া দীননাথ জলে রুমাল ডুবাইয়া ফুলের মালায় জল দিল, তার

পর ঘড়ি খুলিয়া দেখিল,—পাঁচটা বাজিয়া দশ মিনিট! আর কুড়ি মিনিট!...

কিন্তু প্রথমেই সে কি কথা কহিবে? 'অবলা' যদি প্রথমে কথা কয় তো সে তার কি জবাব দিবে? কতকগুলো মাসিকপত্র হইতে ক'টা কবিতার পাতা সে ছিঁড়িয়া আনিয়াছিল—সেগুলা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।...

আবার মোটরের ভেঁপু! ঐ যে লাল শাড়ী...নিশানের মত আঁচলের সেই দোলা...ঐটিই নিশানা!...দীননাথ তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া কহিল,—দে ষ্টার্ট...দেরী নয়...

ষ্টার্ট দেওয়া হইল। কিন্তু গাড়ীখানা বহুদূরে আগাইয়া চলিয়াছে! ওখানে ভিড়—ঠিক। আজ গাড়ীর নম্বরটা দীননাথ দেখিয়া লইয়াছে—নম্বর মুখস্থ হইয়া গিয়াছে।

দীননাথ নফরাকে কহিল,—চ' চট্ করে পূবদিকে...ঐ গাড়ীর ঠিক পিছনে...

আগের গাড়ী বেশ জোরে চলিয়াছে। দীননাথ কহিল,—জোরে চালা...

নফরা কহিল,—যে আজ্ঞে!...

মোড়, পথ-চক্র...ওদিক হইতে গাড়ী আসিতেছে—পদে পদে বাধা! সে-বাধা অতিক্রম করিয়া বহুদূর পথে আসিয়া সহসা দীননাথ দেখিল, মুখস্থ-করা নম্বরের গাড়ীখানা দাঁড়াইয়া আছে—গাড়ীর মধ্যে কেহ নাই! তবে...

সাম্‌নে জলের কাছে তরুণীর মেলা! পনেরো ষোলজন...পাঁচ-সাতখানা মোটর দাঁড়াইয়া আছে। লাল শাড়ী? একটা নয়! এক, দুই, তিন—ইস্, সাতখানা! উহাদের মধ্যে কোন্

শাড়ী তার ? শেযে কি...? না . বিপদ আছে ! দীননাথ হতাশ হইল। উপায় ?

নিজের গাড়ীটাকে একটু দূরে দাঁড় করাইয়া দীননাথ নামিল।·· গাড়ীর নম্বরটাই সে নয় জানে কিন্তু এই পত্রের লেখিকা···?

বহুক্ষণ কাটিল। . তরুণী-দলের মধ্য হইতে তার পানে চাহিয়া দেখিতেছে...ঐ যে...! না, সকলেই যে তাব পানে চাহিয়া দেখে ! কৌতুক ?...দীননাথের লজ্জা হইল। দীননাথ সরিয়া আসিল···এ কি প্রমাদ ! জলের ধারে আসিয়াও পিপাসা মিটাইতে পারিবে না··· এ কার অভিশাপ ?

ঐ যে তরুণীর দলে চাঞ্চল্য ! একজন দু'জন করিয়া সকলে পথের দিকেই আসে ! সে দ্রুত নিজের গাড়ী হইতে নগদ পাচ টাকা দামের সেই প্রণয়-প্রীতি-নিবেদনের বিনোদ-মালাটি লইয়া সেই মুখস্থ-করা নম্বরের গাড়ীর মধ্যে রাখিয়া অদূরে এক গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল।

তরুণীরা ঐ যে একে একে চলিয়া যায় ! এই গাড়ীর দিকেই আসিতেছে···একজন···না, দু'জন ! দু'জনেরই পরণে লাল শাড়ী !··· ও চিঠি উহাদের মধ্যে কে তাকে লিখিয়াছে ?···দীননাথ গাছের আড়ালে আরো দু'পা সরিয়া গেল।

তরুণী দুজন আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল—মালা হাতে লইল—হাসিল। ও কি উল্লাস গাড়ীর মধ্যে ! গাড়ী চলিল। ঐ যে করাঙ্গুলির সঙ্কেত···তাকে ডাকিতেছে ? তবে তাকে দেখিয়াছে, নিশ্চয় ! আঃ !

দীননাথ গাড়ীতে উঠিয়া নফরাকে কহিল,—চালা গাড়ী...

নফরা গাড়ী চালাইল! দুনিয়া কাঁপাইয়া সহসা এক প্রবল বজ্রনাদ! দীননাথ চম্‌কাইয়া আকাশের পানে চাহিল—আকাশে মেঘ নাই! কিসের শব্দ? তারপর নফরাকে কহিল,—মেঘ নয়। গাড়ী থামালি কেন?

নফরা গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া কহিল,—আজ্ঞে, টায়ার ফেটেচে।

দীননাথ কহিল,—আমার গাড়ীর?

নফরা কহিল,—হ্যাঁ, কত্তা।

সর্ব্বনাশ!…নাঃ—যাক, এ দুনিয়া রসাতলে নামিয়া! দীননাথ চক্ষু মুদিয়া গাড়ীতে ঠেশ দিয়া শুইয়া পড়িল, মন সকাতরে ডাকিল, বাজ, কোথায় বাজ? এই বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ো…সব শেষ হোক্!

ষ্টেপ্‌নি-হুইল লাগাইয়া নফরা গাড়ী চালাইয়া বড় রাস্তায় আসিল, কহিল,—বাড়ী যাবো?

বাড়ী! দীননাথ চোখ চাহিল—সে গাড়ীর চিহ্নও নাই! কিন্তু বাড়ী? না, তার চেয়ে সেই কিশোরী সখীর গৃহে…মনটা তবু…

দীননাথ কহিল,—না, বাড়ীতে নয়…ঝামাপুকুর।

ঝামাপুকুরে রাণীর বাড়ী।

ঝামাপুকুরে পৌঁছিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া দীননাথ কহিল,—এটা শ্রীশবাবুর বাড়ী?

ভৃত্য কহিল,—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

শ্রীশ রাণীর স্বামী। ভৃত্য কহিল,—আপনি হোগলকুঁড়ে থেকে আসচেন?

দীননাথ কহিল,—হ্যাঁ।

ভৃত্য সবিনয়ে কহিল,—উপরে আসুন…

দীননাথ ভৃত্য-সহ উপরে আসিল। সজ্জিত ঘর··· সোফা, কৌচ···দেওয়ালে ছবি, সবগুলিই ফটোগ্রাফ। রাণীর ছবি, না ?···হাঁ, ইস্, রাণী মোটর চালাইতেছে! কত বেশের কত রকমের ছবি! বাঃ! খাশা!

দীননাথ কহিল,—তোমার বাবু কোথায় ?

ভৃত্য কহিল,—বাবু বিদেশ গেছেন। কাল আসবেন।

দীননাথ কহিল,—ও!

ভৃত্য বিদায় লইল। পরক্ষণে···এই যে সখী! রাণী আসিয়া কহিল,—আজ তাহলে ভুল হয়নি! তবু ভালো!

দীননাথ অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিল, রাণীর পরণে লাল শিল্কের শাড়ী। দুনিয়া আজ লালে-লাল হইয়া গেল না কি ?

রাণী কহিল,—আমাদের আজ একটা পার্টি ছিল—লেকে। এত মেয়েও জড়ো হয়েছিল।

লেক! মেয়েদের পার্টি!···দীননাথের বুকে ছুঁচ ফুটিতে লাগিল।

রাণী ডাকিল,—সখী···

বনলতা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। দীননাথ চাহিয়া দেখে, বনলতার পরণেও লাল শিল্কের শাড়ী ..তার উপর গলায় একটা মস্ত ফুলের মালা! সে শিহরিয়া উঠিল।

রাণী কহিল,—আজ আমাদের একটা এ্যাড্‌ভেঞ্চার হতে বসেছিল। পার্টি সেরে সখী আর আমি আমাদের মোটরে এসে বসে দেখি. এই মালা ছড়াটি আমাদেরি একজনের প্রণয়-কামী কে দীন দীননাথ কবিতা-লেখা টিকিট এঁটে গাড়ীতে রেখে গেছে! দু'জনে মহা-তর্ক...আমি সখীকে বলি, তোর উদ্দেশে এ মালা! ও বলে, না, এ মালা আমার উদ্দেশে!

দীননাথ মাথা নত করিল। তবে এ ফন্দী ?...

রাণী কহিল,—শেষে আমি বোঝালুম, আমার জীবনে প্রণয়-প্রীতির বিনোদ-মালার অসদ্ভাব কোনোদিন ঘটেনি...তোরই বরং অভাব রয়ে গেছে। অতএব, এ মালা তোর...তা ছাড়া দীননাথ নাম লেখা। তা এ-নামের মর্য্যাদা সে রক্ষা করবে না তো কে করবে, বলুন তো ? তাই ওর গলায়...দেখুন দিকিন, কেমন মানিয়েচে।

দীননাথ মাথা তুলিতে পারিল না—কোনো কথা তার মুখে ফুটিল না।

রাণী কহিল,—দেখুন, পরস্ত্রীকে এমনিতেই পুরুষ স্বরূপ দেখে! সুবেশে সজ্জিতা দেখলে তো কথাই নেই! আপনারও সে রোগ আছে। রাগ করবেন না! সেদিন আপনাদের গলির মুখে একাকিনী আমি...আমার পানে কি দৃষ্টিতেই না চাইছিলেন! অথচ বনলতা আমার চেয়ে ঢের সুন্দরী! তাকে ঘরে কি বেশেই রেখেচেন! মাঝে মাঝে স্ত্রীকে সুবেশে সুসজ্জিত করবেন—তাতে মনটা ভালো থাকবে, আরাম পাবেন। এবং নৈরাশ্যের জ্বালা বুকে বয়ে একদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল, আর পরের দিন লেকে মোটরে চড়ে ছুটোছুটি করে অন্ততঃ বেড়াতে হবে না—এ-কথা অকুতোভয়ে বলতে পারি!

দীননাথ চিঠিখানা হাতে লইয়া কহিল,—এ চিঠি তবে...?

রাণী কহিল,—যদি অভয় দেন তো বলি .

দীননাথ কহিল,—বলুন...

রাণী কহিল,—চিঠি আমার পরিকল্পিত...আর শ্রীমতী বনলতা কর্ত্তৃক সুচিত্রিত। . বুঝতে পারেন নি তো। সুরভোলা অবলাকে

লাল শাড়ীতে কেমন মানায়, জানি না। তবে আমার এই সখীকে... দেখুন দিকিনি, কেমন মানিয়েচে...দেখুন চেয়ে! ..

দীননাথকে চাহিয়া দেখিতে হইল—কিন্তু চোখের দৃষ্টি তখনি নামিয়া পড়িল।

রাণী কহিল,—আর্য্যামির নিন্দা করচি না। স্ত্রী স্বামীর ছায়া... তা ছাড়া তার নিজের অস্তিত্ব নেই, এ-কথাও মানি। তবে দোহাই আপনাদের, স্ত্রীকে শুধু মানুষ বলে একটু দরদ করবেন। দাসী-চাকরের ব্যথা-বেদনা বুঝতে পারেন, অথচ স্ত্রীর সাধ-আহ্লাদে সায় দেবেন না—এ কি ঠিক?...কি বলেন? কথা কচ্ছেন না যে!

দীননাথ কহিল,—নিশির ডাক্ বলে একটা কথা আছে না? তার ঘোরে মানুষের বাক্-শক্তি লোপ পায়, শুনেচি। আমাকেও নিশিতে ডেকেছিল। চেষ্টা করবো যাতে ঐ আর্য্যামির গোঁড়ামি ত্যাগ করতে পারি।

বলবান স্বামী

মানুষের জীবন মস্ত পরীক্ষা-ক্ষেত্র।

কথাটা রঙ্গলাল কবে একখানা বাঙ্লা দৈনিক কাগজে বুঝি পড়িয়াছিল। তখন অবশ্য ভাবে নাই, ও-কথাটা তার প্রাণে সাংঘাতিক রকমে সত্য হইয়া দাঁড়াইবে!

সুদূর অতীতের কথা। হালের সাহিত্য সদ্য তখন বিরাট নখর-যুক্ত থাবা বাহির করিয়া কাঁকড়ার মত বাঙ্লার মাটীতে চলা সুরু করিয়াছে, রঙ্গলাল বিবাহ করিল শ্রীমতী চিন্তা দেবীকে।

চিন্তার চিন্তা-ধারায় হালের সাহিত্য তখন ইঞ্জেক্সন দিয়া ফেলিয়াছে। চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, কপালকুণ্ডলার নব-নারীর চরিত্রগুলিকে আঁকড়াইয়া কাছে পাওয়া যায় না—সেই নবাব মীর-কাশিমের দরবার, তালপুকুরের পাড়ে ফষ্টর সাহেব, চটীতে মতিবিবির পাল্কী—ও যে কতকালের ব্যাপার! সূর্য্যমুখীর পলায়ন—সেও কি বিসদৃশ! তার চেয়ে ঐ ছোট-খাট নূতন মাসিকপত্রগুলায় মেসের গল্প, বস্তীর গল্প—সে-সব গল্পের লোকগুলা যেন কত চেনা! পথে-ঘাটে নিত্য তাদের দেখা মিলে! ঐ যে তরকারী-ওয়ালী তরকারীর বাজরা মাথায় পথে চলিয়াছে...চিন্তার মনে পড়িল, এ-মাসের 'সবুজে ছাপ' মাসিকে ছাপা ছোট্ট গল্পটি, 'পশারিণী'! বাজরা-মাথায় তরকারী-ওয়ালী তরকারী হাঁকিয়া পথে চলে, আর মল্লিকদের বড় বাড়ীর দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া মল্লিকদের ছেলে স্বর্ণনাথ তার পানে চাহিয়া থাকে—নিশ্বাসে তার বুক ফুলিয়া ওঠে! একদিন কেহ গৃহে ছিল না;

সেই অবসরে সে তরকারী-ওয়ালীকে ডাকিয়া তার বাজরা খালি করিয়া দিল ; দাম দিতে গিয়া কহিল,—এই দশটাকার নোট নাও.. ভাঙ্গানো টাকা নেই। তরকারী-ওয়ালী কৃতজ্ঞতায় গলিয়া কহিল,—হামারা দিল্ কিন্ লিয়া বাবু-সাব। আদমির হামারা বহুৎ বেমার.. জীয়ে কি ন জীয়ে!

এমনি করিয়া আলাপের সূত্রপাত। সহসা একদিন স্বর্ণনাথ দরদ করিয়া তরকারী-ওয়ালীর আদমিকে দেখিতে চলিল। আদমি বেচারার তখন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত। বাবুকে সেলাম করিয়া স্ত্রীর ভার রঙ্গলালের হাতে দিয়া সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। রঙ্গলাল তরকারী-ওয়ালীর দিকে চাহিয়া দেখিল, চোখে তার কি দৃষ্টি! আশ্রয়-প্রার্থিনীর করুণ মিনতিতে ভরা ডাগর দুটি চোখ! স্বর্ণনাথ দেখিল, ও আজ তুচ্ছ তরকারী-ওয়ালী নয়—তার মাথায় বাজরা নাই,—সে তরকারী হাঁকে না—তার আজ শুধু একটিমাত্র পরিচয়, সে তরুণী, সে প্রিয়া· সে হৃদয়ে আশ্রয় চায়, প্রেমের ভিখারিণী...

গল্পটা মোটামুটি এই,—উহারি উপর লেখার ষ্টাইল আছে, খুব আর্টিষ্টিক ট্যাচ্ আছে, চাঁদের আলো তরকারী-ওয়ালীর ঘরে চালের ফুটা দিয়া ঢুকিয়াছে—রুগ্ন স্বামীর পানে চাহিয়া তরকারী-ওয়ালী নিজের মনের আঁধারে স্বর্ণনাথের দরদ-ভরা চাহনিতে চাঁদের আলোর সাদৃশ্য অনুভব করিতেছে · এমনি বহু ব্যাপার। অর্থাৎ গল্পটা পড়িয়া অবধি পথের তরকারী-ওয়ালী, গোয়ালিনী, বজ্জির্নী প্রভৃতিকে চিন্তা দেবী আর তুচ্ছ করিতে পারে না ..সর্ব্বক্ষণ মনে হয়, উহাদের ঐ আঁধার-ভরা মনের মধ্যে আছে কত ভাবের মণি-মাণিক্যের দীপ্তি!...

শ্রীমতী চিন্তা দেবী আসিয়া যখন স্বামীর পাশে দাঁড়াইল, তখন স্বামী রঙ্গলাল ব্যায়াম-সমিতির সেক্রেটারি। সে বছর ডন্-কশরত্তিতে

বঙ্গলাল বিষম ওস্তাদী দেখাইয়া সেক্রেটারীর পদে প্রমোশন্ পাইয়াছে। সাহিত্যের সে কোনো ধার ধারে না। লোক দেখিলে হাতের গুলি বাহির করিয়া বলে, মারো ঘুষি, যত জোরে পারো! দুরন্ত রৌদ্রে মহিষ ক্ষেপিয়া যখন গাড়োয়ানের লাগাম না মানিয়া দিকবিদিকে ছুটিতে চায় এবং গাড়োয়ান প্রাণপণ বলে যখন তাকে রুখিতে পারে না, তখন বঙ্গলাল ছুটিয়া গিয়া হাতে ধরিয়া সে গাড়ী থামাইয়া দেয়। অর্থাৎ এই নবদম্পতীর গোড়ায় ছিল অমিল—স্বামী বঙ্গলাল মনটাকে তুচ্ছ করিয়া শরীর গড়িতে মত্ত, আর বধূ চিন্তা শরীরের পানে দৃকপাত না করিয়া মনের সাধনায় মশগুল।

ফুলশয্যার রাত্রে বঙ্গলাল স্ত্রীর হাতখানা ধরিয়া কহিল,—কাঠির মত লিক্‌লিকে হাত-পা, মোটে মাশল নেই। ছ্যা! একটা জল-ভরা ঘড়া তুলতে পারো?

প্রশ্ন শুনিয়া চিন্তা ভড়কাইয়া গেল। পনেরো-ষোল বছরের মেয়ে—কাব্য উপন্যাসে আপ-টু-ডেট। কলিকাতার কোন গলি হইতে কোন্ মাসিক-পত্র বাহির হয়, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর তার অবিদিত নয়। ফুলশয্যার রাত্রির মহিমা মনে তার জনজ্যান্ত! আর এই তার স্বামীর প্রথম প্রণয়-ভাষা।

স্বামীর পানে সে কেমন বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বঙ্গলাল কহিল,—তোমায় রীতিমত ব্যায়াম করতে হবে।

ব্যায়াম! চিন্তার চমক লাগিল। বঙ্গলাল কহিল—মেয়েদের ব্যায়ামের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। আমার কাছে বই আছে, ফটো আছে... দেখাচ্ছি।

ব্যায়ামের দু'চারখানা বই পাড়া হইল, সেই সঙ্গে ফটো।

ছবি দেখিয়া চিন্তা স্বামীর পানে চাহিল।

রঙ্গলাল ধাঁ করিয়া শুইয়া পড়িল, শুইয়া পা-দুখানাকে মুচ্‌ড়াইয়া কহিল,—এই প্রথমে এমনি, তারপর পা এমনি করে নামাতে হবে, এই বুড়ো আঙুল দুটো এই এমনি, এমনি—ব্যাস, উঠে বসবে এমনি করে.

চিন্তার দুই চোখ কপালে উঠিল। রঙ্গলাল কহিল,—পর্দ্দা আমরা মানি না। পর্দ্দা ফেলতে হলে কিন্তু নারীর উচিত, শারীরিক ব্যায়ামে রীতিমত শক্ত হওয়া। নারীই হলো শক্তি। খালি পিয়ানো বাজিয়ে আর গান গেয়ে গেয়ে আমাদের দেশের মেয়েরা নিজেদের অপদার্থ করে ফেলচে। এতে জাতির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী।

রঙ্গলালের কথায় এমন তেজ, স্বরে এমন দৃঢ়তা যে চিন্তার মনে হইল, বাঙালীর অন্দরে মড়ক লাগিয়াছে! সেকালে রাজপুতানায় রাজপুত-নারী যেমন সদলে অগুনে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, একালে বাঙালীর ঘরের মেয়েরা তেমনি কল-তলা হইতে জল-ভরা ঘড়া তুলিতে গিয়া দুম্‌দাম পড়িয়া জান দিতেছে! কল্পনায় সে দৃশ্য দেখিয়া চিন্তা শিহরিয়া উঠিল

রঙ্গলাল কহিল—আজ থেকেই হাতে-খড়ি। নাও শোও এমনি করে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমায় দিয়ে আমি বাঙালী নারীকে শরীর-সাধনায় উদ্বুদ্ধ করতে চাই

চিন্তা কহিল,—আমার কিছু কথা ছিল।

রঙ্গলাল কহিল,—কি কথা?

চিন্তা কহিল,—আমি শুনেছিলুম, তুমি খুব ভালো পালোয়ান। তবু আমি একটা কবিতা লিখেচি আজকের রাত্রিকে বরণ করে.

হাসিয়া রঙ্গলাল কহিল—আমায় শোনাবে? পরে শুনবো। আগে ব্যায়াম করো, তার পর

এমনি করিয়া সেই কবির ভাষায় "দুটি হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি" তো ছোট-বড় ঢেউ তুলিয়াই সে বহিবে। নদীর স্রোত যেমন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে না, জীবন-নদীর স্রোতও তেমনি .

তরুণ বয়সের একেই একটা মোহ আছে! তার উপর দু'মাস পরে ফাগুন আসিয়া দেখা দিল। জ্যোৎস্নায় আকাশ ভরিয়া আছে। বিছানায় শুইয়া চিন্তা বই পড়িতেছিল। পড়িতে পড়িতে ঘুমে তার দুই চোখ বুজিয়া গিয়াছে।

ব্যায়াম-সমিতির বার্ষিক অধিবেশন, না, দিগ্বিজয়! তাহা সারিয়া রঙ্গলাল গৃহে ফিরিল। রাত তখন এগারোটা।

ঘরে ঢুকিতে রঙ্গলালের দৃষ্টি পড়িল চিন্তার মুখে। তরুণী! মুখে চাঁদের আলো পড়িয়াছে—মুখখানি খাশা দেখাইতেছিল! সারাদিনের খাটুনি-মারামারির পর শরীরের মাশ্‌ল ঠেলিয়া তরুণ মন রুখিয়া উঠিয়াছিল, এই বসন্ত. এই জ্যোৎস্না-ধারা...ঐ প্রিয়া...

রঙ্গলালের চোখের পাতা পড়ে না! চিন্তার পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মনের দৌর্ব্বল্য বাড়িয়া উঠিল। শরীরের অত শক্তি, পেশীর ঐ অসুর-বল মনকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না! ঘুমন্ত চিন্তার অধর-পুটে রঙ্গলাল...

ধড়মড়িয়া চিন্তা উঠিয়া বসিল। চোখ মেলিয়া দেখে, সামনে রঙ্গলাল! রঙ্গলাল ধরা পড়িয়া একেবারে কাঠ।

রঙ্গলাল কহিল,—তোমায় বেশ দেখাচ্ছিল, চিন্তা ..

হাসিয়া চিন্তা কহিল,—আর তোমাকেই বুঝি বিশ্রী দেখায়?

রঙ্গলাল কহিল,—শুধু এই মাশ্‌ল্। তুমি ব্যায়াম করচো তো—দেখো, দেহখানি এমনি সুগঠিত হবে।

ব্যায়াম-চর্চ্চায় কি লাভ হইতেছিল তা ঠিক নির্ণয় করিতে না পারিলেও চিন্তা স্বামীর মনের নাগাল পাইল না। মাশ্‌লের তলায় সে-মন কোথায় যে চাপা আছে…! অর্থাৎ পুরুষের যে-মনটুকুর ভৌগোলিক পরিচয় সে সখীদের কাছে নিত্য পায়! মণ্টি, রাণী, মায়া, স্নেহ…তারা তাদের স্বামীর প্রণয়-লীলার কত কাহিনীই বলে—সে যেন রূপকথার গল্প! আর চিন্তা? জিউজিৎসু, স্যাণ্ডো, ডেম্প্‌সি…এদের যত কথা স্বামীর প্রণয়-বচনের প্রধান সামগ্রী।

চিন্তা সাহিত্যে মনোযোগ অর্পণ করিল। তরুণ বয়স! পৃথিবীর বর্ণ-গন্ধের বৈচিত্র্য নিজের মনে পুরাপুরি সে উপভোগ করিতে চায়! তার সঙ্গীও মিলিল। রঙ্গলালের গৃহে পর্দ্দার কড়াক্কড় নাই, তার শিষ্যবর্গের ছিল সেখানে অবাধ গতি।

শিষ্য নীরদ আসিয়া কহিল,—আপনি কবিতা লিখচেন বৌদি?

চিন্তা কবিতাই লিখিতেছিল। নীরদের কথায় কবিতার কাগজ রাখিয়া চিন্তা কহিল,—কি চাই? চা?

নীরদ কহিল,—না। আইডিনের শিশি। আঙুলটা একেবারে ছেঁচে গেছে।

চিন্তা আয়োডিনের শিশি আনিয়া দিল। এ পরিচর্য্যা তাকে নিত্য করিতে হয়।

আঙুলে আয়োডিন লেপিয়া নীরদ কহিল,—দেখি না কবিতা!

—না, না! লজ্জায় চিন্তার কর্ণমূল রক্তিম হইয়া উঠিল। অপরাহ্নের অস্তগামী সূর্য্যকিরণে চিন্তার মুখে যে-মাধুরী ফুটিল, নীরদ তা লক্ষ্য করিল। সে কহিল,—লক্ষ্মী বৌদি, দেখি আপনার কবিতা।

তার স্বরে ছিল দরদ। চিন্তা সে-দরদ তুচ্ছ করিতে পারিল না। কবিতা-লেখা কাগজখানি নীরদের হাতে ছাড়িয়া দিল। নীরদ পড়িল,—

হায় এ বসন্ত এলো, প্রাণপুষ্প উঠিল বিকশি—
কে তারে দেখিবে হায়, বিরলে কি দুঃখ-দাহে শ্বসি'

নীরদ চিন্তার পানে চাহিল। কাছেই চিন্তা নতমুখে দাড়াইয়া ছিল।

নীরদ কহিল,—রঙ্গ-দার ভারী অন্যায়! .

নিমেষের চকিত আলাপ! নীরদের কাছে কবিতার এ-কথা শুনিল হরেন, হরেনের কাছে শুনিল লীলাময়; ফলে রঙ্গলালের ব্যায়ামের অবসরে চিন্তার ঘরে ছোট একটি সাহিত্য-সমিতি অচিরে গড়িয়া উঠিল। নিভৃতে কাব্যালাপ, কবিতার ছত্র-সংশোধন এবং সে-কবিতা তাদের মারফৎ দু'চারিখানা মাসিকে গিয়া ছাপা হইতে লাগিল। চিন্তার কাছে এই শিল্পগুলির আদর বাড়িল। তাদের চা, কেক, চপ, মিষ্টান্ন, শরবৎ প্রভৃতি চাহিবার আগেই মজুত থাকে।

রঙ্গলাল আসিয়া ডাকিল,—চিন্তা…

চিন্তা পাশের ঘর হইতে কহিল,—কি?

রঙ্গলাল কহিল,—আমার বাদাম ফুরিয়ে গেছে, আজো আনিয়ে রাখোনি?

চিন্তা কহিল,—আমায় বলো নি তো! তোমার বাদাম তুমি নিজে নিয়েই খাও…

গর্জ্জন করিয়া রঙ্গলাল কহিল,—ওদের চায়ের পেয়ালা, রুটির প্লেট তো ঠিক থাকে! একটা কথা চিন্তার বুকের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎশিখার মত ছুটিয়া গেল। যাকে বলে জেলশি,—তাই! চিন্তা নিশ্বাস ফেলিল।

তারপর এই জেলশির স্ফুলিঙ্গ অবিরাম ছুটিতে লাগিল—ছোট-খাট নানা ব্যাপারে।

তার মনের উপর কে যেন হাতুড়ি ঠুকিতেছিল !

থিয়েটারের সজ্জিত রাজ-সভা পট্‌কার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নিমেষে ভীষণ শ্মশানে রূপান্তরিত হইয়া দেখা দেয়। সোনার আসন, মোঁটা, থাম, ঝুটা জরির পোষাক-পরা মন্ত্রী, অমাত্য, পাত্র-মিত্র, বৈতালিক কোথায় সরিয়া যায়, তার জায়গায় কালি-মাখা ছেঁড়া কতকগুলা পর্দ্দা শুধু ঝুলিতে থাকে ; আর বিকট ইলি-হিলি হিলি-হিলি গান ! সংসারেও তাই ঘটে ! নিশ্চিন্ত আরাম—ফশ্ করিয়া তার জায়গায় অভাব আর দৈন্য এক-রাশ কঙ্কালের মূর্ত্তিতে জাগিয়া খট্‌খট্ আওয়াজ সুরু করিয়া দেয় ! আর্টের স্বপ্নের মাঝখানে ব্ল্যাক আর্টের মস্ত ফাঁকি !...

আনন্দের মত অভাবেও উত্তেজনা আছে ! উৎপলের প্রাণে উত্তেজনার সেই প্রথম ঝোঁক ! উৎপল গিয়া গোলদীঘিতে বসিল। কালো জল . জলের বুকে আলোর ফুল ! অদূরে তীরে লোক-জনের গুঞ্জন-রব ; পথে ট্রাম ও বাসের বিশ্রী কর্কশ-ধ্বনি···দুনিয়া এমন বেসুরা রাগিণীতে ভরিয়া গিয়াছে ! আশ্চর্য্য ! কিন্তু...যে-ভাবে জীবনকে এত দিন চালাইয়া আসিয়াছে, সে-ভাব বজায় রাখা কঠিন ! বন্ধুর দল ? অনেকে অনেক উপদেশ দিয়া গিয়াছে,—জীবনটা স্বপ্ন নয় হে...কবিতার মিল খোঁজাই একমাত্র কাজ নয়।

সংসার...সংসার সত্যই আছে ! সে সংসারে...

মঞ্জরীর কথা মনে পড়িল। গানের সুরে যে মঞ্জরী জীবন বাঁধিয়া রাখিয়াছে ! সে জানে, জীবন একটা সুর, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সুর ! সে যদি এ দৈন্যের কথা শোনে—বেদনায় ঝরিয়া মরিবে ! বেচারী !... সংসারের এ রুদ্র আঘাত তার বুকে না বাজে ! সে স্বামী ! পুরুষ ! এ আঘাত সে সহিতে পারে—মঞ্জরী কি করিয়া সহিবে ?

অথচ উপায় কি !

বন্ধু, আত্মীয়, সকলের কথাই মনে জাগিল। নদীর স্রোতে ফুলের পর ফুল যেমন ভাসিয়া যায়, তেমনি পরিচিত প্রিয়-মুখগুলি! কিন্তু আজ দুর্দ্দিন ..দুর্ভাগ্যের ছিন্ন বেশ গায়ে তুলিয়া কার সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াইবে? এ বেশ দেখিলে সংসার ঘৃণায় সরিয়া যায়, মুখ ফিরায়, মুখের পানে তাকাইয়া দেখে না!...বন্ধু...?

ঠিক! প্রকাশ। এক সঙ্গে কলেজে পড়িতাম। সাহিত্যের আসরে কোনো দিন সে আসে নাই! আজ সে মস্ত লোক—অনেক পয়সা রোজগার করিতেছে...! সেও ফিরাইয়া দিবে? বোধ হয় না!

উৎপল উঠিল।...প্রকাশের বাড়ী বাগবাজারে।

উৎপল গিয়া ভৃত্যকে কহিল—বাবু আছেন?

ভৃত্য কহিল,—আছেন। এখনি উপরে গেলেন. আপনার কাড?

এক টুকরা কাগজে নিজের নামটুকু লিখিয়া উৎপল বলিল,—নিয়ে যাও। বলো, বড্ড দরকার।

ভৃত্য কাগজ লইয়া চলিয়া গেল। উৎপল চেয়ারে বসিল। সাম্‌নে টেবিল। টেবিলের উপর আইনের এক-রাশ বই।

দোতলায় হার্ম্মোনিয়ম বাজিতেছিল—বাজনার সুরে গান চলিয়াছে। নারীর কণ্ঠ। নারী গাহিতেছিল, রবি বাবুর গান—

'সে কোন্ বনের হরিণ
ছিল আমার মনে—'

মঞ্জরীও এ-গান প্রায় গায়। চমৎকার গায়। আর বোধ হয়, গাহিবে না!...গানের কথাগুলা প্রাণে বাজিতেছিল। ভারী ঠিক কথা! তারো মনে বিচরণ করিত, সোনার হরিণ...! আজ সে নাই! অভাবের তীক্ষ্ণ শরে সে সোনার হরিণ জন্মের মত বুঝি মরিয়াছে!...

প্রকাশ নামিয়া আসিল, কহিল,- কি, কবি যে!...

যে বিশেষণ একদিন পুলকে-গর্ব্বে তাকে বিভোর করিয়া তুলিত, আজ সেই বিশেষণই অগ্নি-বাণের মত বুকে বিঁধিল!

নিশ্বাস ফেলিয়া উৎপল কহিল, —আর কবিত্ব নয়, ভাই!

প্রকাশ বিস্মিত হইল, কহিল,—তাই তো হে, ব্যাপার কি?

উৎপলের চোখের পাতা অশ্রুর বাষ্পে ভিজিয়া উঠিল।

উৎপল কহিল,—ব্যাঙ্কের জমা সব খরচ হয়ে গেছে। কাল থেকে কি করবো, ভেবে পাচ্ছি না..

প্রকাশ স্তম্ভিত। তার মুখে কথা ফুটিল না।

উৎপল কহিল,—আমার স্ত্রী বেচারী কিছুই জানে না। আজ দেনা-পাওনা মিলুতে বসে দেখি, কিছু করা চাই। না হলে কলম ধরি যে-হাতে, সে-হাতকে খাড়া রাখা যাবে না!

আরো কথাবার্ত্তা চলিল, সংসারের হাজার খুঁটিনাটি কথা!

প্রকাশ কহিল,—কিন্তু...কি যে করি!

প্রকাশ এটর্ণি। তার পশার ভালো।

উৎপল কহিল,—তোমার আপিসে যে-কোনো কাজ. কেরাণী-গিরি মাথার মণি! চাপরাশীর কাজও আজ শিরোধার্য্য করবো!

প্রকাশ কি ভাবিল,···বহুক্ষণ। ভাবিয়া কহিল,—বেশ, কাল এসো। যাহোক্ কিছু করা যাবে।

উৎপল কহিল, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন...

হাসিয়া প্রকাশ কহিল,—আবার কবিত্ব...! এই বললে. কবিত্ব আর নয়!

ম্লান হাসি হাসিয়া উৎপল কহিল,—বেচারী মঞ্জরী জানে, 'অনাবিলা'র সম্পাদকী নিতে বেরিয়েচি—বিনা মাইনের চাকরি।

প্রকাশ কহিল,—তারা পয়সা দেবে?

উৎপল কহিল,—পাগল হয়েচো! পেলে নেয়। নতুন মাসিক... মাসে পঞ্চাশটি করে টাকা চাঁদা দিতুম।

প্রকাশ কহিল,—তাই কবিতা ছাপতো?...সর্ব্বত্র দেখছি, policy ঠিক আছে!

উৎপল হাসিল। মলিন হাসি! তার. পর করুণ ম্লান দৃষ্টিতে প্রকাশের পানে চাহিয়া বিদায় লইল।

দু'দিন পরে সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া উৎপল ডাকিল,—মঞ্জরী...

মঞ্জরী স্বরলিপির বইগুলা নাড়িতেছিল, কহিল,—কি?

উৎপল কহিল,—অনাবিলার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত হলো।

মঞ্জরী উৎপলের পানে চাহিয়া রহিল।

উৎপল কহিল,—মানে, ওরা ব্যবস্থা করেচে, সম্পাদকের যেমন খাটুনি খুব, তেমনি তার জন্ত একটা allowance না দিলে মন সুস্থির হব না।

মঞ্জরীর দুই চোখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

উৎপল কহিল,—আপাততঃ মাসে একশো টাকা করে দেবে। তার পর উন্নতি হলে...অবশ্য আরো বাড়বে। মন্দ কি!

মঞ্জরী কহিল,—ওদের গ্রাহক তাহলে অনেক...বলো! বছরে তোমাকেই বারোশো টাকা দেবে! তাছাড়া ছাপার খরচ আছে, কাগজের দাম

উৎপল কহিল,—কোথাকার এক রাজাকে নাকি পাকড়াও করেচে, সেই finance করবে। রাজা কবিতা লেখে, তার দুটো করে কবিতা পাইকা অক্ষরে ফী মাসে ছাপতে হবে।

মঞ্জরী কহিল,—তা হোক.. পয়সার বলই আসল বল! ছেপো তার কবিতা!...কিন্তু তুমি? শেষে চাকরি করবে?

উৎপল কহিল,—মন্দ কি! একটা নতুন experience...তা ছাড়া মিছে ঘরের পয়সা ভাঙ্গিয়ে চলি কেন? রোজগার করা পুরুষের একটা কর্ত্তব্য – নয়?

মঞ্জরীর হাসি বাতাসে মিলাইয়া গেল। সে কহিল,—তা বটে!...

মাসখানেক মন্দ কাটিল না...কিন্তু অভাব একবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিলে কোথা দিয়া কেমন করিয়া যে ফাঁপিয়া ফুলিয়া ওঠে—সে এক মস্ত সমস্যা! সে-সমস্যা ক্রমে পাহাড়ের মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল...

মঞ্জরীর ভাই-ঝী পাপড়ি। পাপড়ির বিবাহ। মঞ্জরীকে পাপড়ি ধরিয়া বসিল, শাড়ীর বদলে সে চায় ভালো একটা অর্গান। মাষ্টার রাখিয়া গান শিখিতেছে...অর্গান্ তার চাইই! শাড়ী তো অনেকে দিবে...

মঞ্জরী সন্ধ্যার পর সেই কথা বলিতেছিল। সে-কথায় উৎপলের চোখের সাম্‌নে সমস্ত আলো নিবিয়া গেল!...

বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া মঞ্জরীর পানে সে চাহিল; ডাকিল—মঞ্জু..

এ কি স্বর! যেন কোন্ পাতালের অতল-তল হইতে ভাসিয়া উঠিয়াছে!

মঞ্জরীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয়!

সত্য—কঠিন সত্য...তাকে আর লুকানো চলে না। কিন্তু মঞ্জু যদি ভুল বোঝে?...

উৎপল তাকে সব কথা খুলিয়া বলিল,—প্রকাশের অফিসে ক'মাস ধরিয়া চাকরি করিতেছে—সেটুকু সে গোপন রাখিল। বলিল, যা-কিছু সঞ্চয়..কর্পূরের মত কবে উবিয়া গিয়াছে! 'অনাবিলায়' তাই সে

চাকরি লইয়াছে। দাস্য . এ দাস্য! না লইলে ..প্রকাশের অফিসে চাকরির কথা বলিতে পারিল না···বাধিতেছিল! সে কেরাণীগিরি। এ ..এ চাকরিতে সাহিত্যের সম্পর্ক আছে! আর্টে তার এত জ্ঞান···সেই জ্ঞান তারা মূল্য দিয়া কিনিতেছে! দাস্যেরও নানা ধাপ আছে তো!

মঞ্জরী নিঃশব্দে সব শুনিল—শুনিয়া গুম্ হইয়া রহিল ··তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,- হুঁ...

উৎপল কহিল,—পাপড়ির অর্গানের কি ব্যবস্থা হবে, বলো তো···

মঞ্জরীর দুই চোখের পিছনে জলের রাশি...সে-জল সে ঝরিতে দিল না; কহিল,—কি আর হবে!...ক্ষমতায় যা কুলোয় না, তার আশা করা উচিত নয়!...

মঞ্জরী চলিয়া গেল।···উৎপল মঞ্জরীর পানে চাহিয়া রহিল। বেচারী, বেচারী···কিন্তু সেও কতখানি নিরুপায়! ··

সেদিন অফিসের ছুটী ছিল। উৎপল বাহির হইল না।

মঞ্জরী কহিল,—অফিসে যাবে না?

উৎপল কহিল,—আজ ছুটি আছে।

মঞ্জরী কহিল,—ওঃ!...তা, আমি একটু বেরুবো। মল্লিকদের বাড়ীতে। অনেক করে বলে গেছে। ওদের সিন্ধু শ্বশুর-বাড়ী থেকে এসেচে কি না। দু-একটা গান শিখবে বলছিল ..ভারী মিনতি জানিয়ে চিঠি লিখেচে...

উৎপল কহিল,—বেশ!...

দু'দিন পরে গায়ে বেদনা...উৎপলের জ্বরের মত বোধ হইতেছিল, মাথায় খুব যাতনা...

প্রকাশ কহিল,—বাড়ী যাও উৎপল, দুটো জেনাস্প্রিনের গুলি নাও--মুখে দাও...

টেবিলের ড্রয়ার হইতে জেনাস্প্রিনের শিশি লইয়া দুটা ট্যাবলেট বাহির করিয়া প্রকাশ উৎপলের হাতে দিল। উৎপল সে দুটা গলায় ফেলিয়া চেয়ারে গিয়া বসিল...

প্রকাশ কহিল,—এ হলো warning...মানচো না কেন? A stich in time saves nine. বাড়ী যাও···গিয়ে rest নাও, বুঝলে?

উৎপলকে উঠিতে হইল। মাথায় বেশ বেদনা!···মাথা তুলিয়া রাখা যায় না। চোখও জ্বালা করিতেছে!

উৎপল বাড়ী ফিরিল।

মঞ্জরী?...

গৃহে নাই। কোথায় গেল?

একমাস ঠিকা-ঝী আসিয়া কাজ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। মঞ্জরী ভাবিয়াছিল, সে নিজের হাতে সব করিবে। ভারী তো কাজ... কিন্তু উৎপলের মানা! সে-মানা মঞ্জরী মানে নাই!..

বাড়ী ফিরিয়া উৎপল দেখে, ঠিকা-ঝী বসিয়া বাড়ী চৌকি দিতেছে!

উৎপল কহিল,—তোর মা-ঠাকরুণ কোথায় রে?

শঙ্করী কহিল,—সেনেদের বাড়ী গেছে।

সেনেদের বাড়ী?...পাড়ার মস্ত ধনী এই সেনেরা! তাদের গৃহে মঞ্জরীর কোনো দিন যাতায়াত ছিল না। হঠাৎ?...

মাথার ব্যথায় উৎপল আর প্রশ্ন করিতে পারিল না, গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।···শুইবামাত্র দুই চোখ মুদিয়া আসিল।···

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘুম ভাঙ্গিল। মাথা হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে. ট্যাবলেট দুটায় কাজ হইয়াছে।···

মঞ্জরী আসিয়া ব্যস্ত হইয়া আলমারি খুলিল।

উৎপল কহিল,—কি গা?

মঞ্জরী কহিল,—কিছু নয়।...তুমি শুয়ে আছো যে ?

উৎপল কহিল,—এমনি···

মঞ্জরী আলমারি হইতে কি লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।... ফিরিল প্রায় মিনিট পনেরো পরে ; ফিরিয়া আবার আলমারি খুলিল।

উৎপল ডাকিল,—মঞ্জু...

মঞ্জরী কহিল,—কেন ?

উৎপল কহিল,—সেনেদের বাড়ী গেছলে ?...

মঞ্জরী জবাব দিল না। উৎপল কহিল,—কাছে এসো...

মঞ্জরী কাছে আসিল। উৎপল তার হাতখানি নিজের হাতে লইল। এ কি, মঞ্জরীর আঙুলে ব্যাণ্ডেজ !...

উৎপল কহিল,—হাতে কি হলো ?

মঞ্জরী কহিল,—পুড়ে গেছে।

—কি করে পুড়লো ?

অপরাধীর দৃষ্টিতে মঞ্জরী উৎপলের পানে চাহিল।

—বলবে না ?

মঞ্জরী কহিল,—তুমি বকবে না, বলো...

—না।

মঞ্জরী কহিল,—সেনেদের বাড়ী একটি ছেলের বড় ব্যামো.. টাইফয়েড। তার নার্শিং করতে গেছলুম।

—নার্শিং !···

মঞ্জরী কহিল,—তাই।···

উৎপল অবাক্ ! হঠাৎ···?

মঞ্জরী কহিল,—তোমায় না বলে একটা কাজ করেচি...

—কি কাজ, মঞ্জু ?

মঞ্জরী কহিল,—পাপড়ির জন্য অর্গান কিনিয়ে দিয়েচি...দাম মাসে মাসে দেবো...

দুনিয়া আবার অন্ধকারে ডুবিতেছিল...উৎপল স্থিরদৃষ্টিতে মঞ্জরীর পানে চাহিয়া।

মঞ্জরী কহিল,—পঁচিশ টাকা করে দিতে হবে। তুমি ভেবো না। আমি নার্শিং করচি ওদের ছেলের...রোজ পাঁচ টাকা করে ফী। একদিন লেখা-পড়াও করেচি তো...

ফী!.. উৎপল লাফাইয়া উঠিয়া বসিল। চাকরি!...মঞ্জু চাকরি করিতেছে!... .

মঞ্জরী কহিল,—সংসারের ঝুঁকি তোমার একলার নয়। তুমি চাকরি করচো...আমিও তোমায় যেটুকু সাহায্য করতে পারি। বাজনার দামটা চুকে যাবে। পাপড়ি চেয়েছে—তোমার একটা ইজ্জৎ—নাম-ডাক আছে তো! ভয় নেই। তার পর ঐ মল্লিকদের সিন্ধুকে যদি গান শেখাই তাহলে ওরা মাসে পঁচিশ টাকা দেবে...হপ্তায় এক ঘণ্টা করে। সে চাকরি হাতে রেখেচি।...

উৎপল ডাকিল,—মঞ্জু ..

তার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী তখন দুলিয়া উঠিয়াছে!

মঞ্জরী কহিল,– যেদিন সংসারের ভাবনা ছিল না, সেদিন গানের সুর নিয়ে বিভোর ছিলুম! তোমার সঙ্গে আর্টের চর্চ্চা করেচি... কোনো বাধা-বন্ধ ছিল না। আজ সংসার ডাক দিয়েচে,.. তুমি সে-ডাকে সাড়া দিয়েচো...আমি কিছু বুঝি না,—ভাবো? সংসারের এ-ডাকে আমিও সাড়া দিতে চাই তোমার সঙ্গে।. আমি তো শুধু তোমার সুরের সঙ্গিনী নই...আমি তোমার সহধর্ম্মিণী!

বড়বাবুর বিপত্তি

গলির মধ্যে ছোট দোতলা বাড়ী। পথের ধারের খড়খড়িগুলা পরিষ্কার ঝরঝরে। বাড়ীখানি পুরানো। তা হোক, দেওয়াল বালি-ঝরা নয়। পাড়ার লোক বলে, বাড়ী কেন পরিষ্কার থাকিবে না? কর্ত্তা নিজের হাতে খড়খড়ি সাফ্ করে. দেওয়ালের কোথাও বালি ঝরিলে, নিজে চূণবালি আনিয়া কণিক হাতে মেরামত করে। বাড়ীতে চাকর-দাসীর উৎপাত নাই তো!...

পাড়ার লোকে আরো বহু নিন্দার কথা বলে। তা বলুক। পাড়া-পড়শীর মন চিরদিন হিংসায় ভরা। কবে তারা কার ভালো দেখিতে পারে! তারা কর্ত্তার নাম করে না; এবং সকাল বেলায় মুখ দেখা যথাসম্ভব এড়াইয়া চলে। একেবারে না দেখা সম্ভব নয় বলিয়া তারা আপোসে এটুকু স্থির করিয়াছে, সকালে ও-মুখ না দেখিলেই হইল!

পাড়ায় যখন এতখানি নিষেধ-শাসন, তখন আমরা না হয় নামটা না-ই করিলাম! কুসংস্কার আমরা না মানি, আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো মানেন! তাই...

বড়বাবু বলিয়া যদি তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখ ইঙ্গিত করি, তাহাতে বক্তব্যের মর্ম্ম অপ্রকাশ থাকিবে না। কারণ...

বড়বাবুর রোজগার মন্দ নয়; একটা অফিসের তিনি বড়বাবু। এবং সে-কারণে অফিসে তাঁর প্রতাপ দোর্দ্দণ্ড। কেরাণী চিরদিনই বেচারী...এ অফিসেও তাই।

অর্থাৎ বড়বাবুর সংসারে তিনি আর তাঁর স্ত্রী ; ছেলে-মেয়ে নাই। দাসী-চাকর চোর হয় ; চুরির প্রশ্রয় দিতে তিনি নারাজ ; সেজন্য দাসী-চাকর রাখেন নাই। নিজের হাতে বাজার, নিজের হাতেই ঘর-দ্বার সাফ্ করেন,—ছেলেমেয়ে নাই, লোক-লৌকিকতার বালাই নাই। গৃহিণী রান্নাবান্না করেন, বাসন মাজেন। ঘর-সংসারের আরো পাঁচটা কাজ আছে।...এই কাজের মধ্যেই তিনি তাঁর নারীত্ব বিসর্জ্জন দিয়া গৃহধর্ম্ম এবং সেই সঙ্গে ইহলোকে হিন্দু নারীর কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন।

তাই বলিয়া কেহ যদি মনে করেন, বড়বাবু এবং তাঁর গৃহিণীর জীবন-নাট্যে কোনদিন প্রথম অঙ্ক ছিল না, একেবারে এই চতুর্থ অঙ্ক হইতে এ নাট্যের অভিনয় সুরু হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁরা ভুল করিবেন! তাঁদের জীবনেও ঠিক আর পাঁচজনের জীবনের মত প্রথম অঙ্ক আসিয়াছিল। প্রথম অঙ্কে সেই অজস্র আনন্দ, মিলন-বিরহ, প্রীতি-অভিমান, গল্প-গান, শীত-বসন্ত, রৌদ্র-বর্ষা সবই আসিয়া যথা-সময়ে দেখা দিয়াছিল, তারপর সহসা তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য হইতে দেখা গেল, বড়বাবুর অর্থ-উপার্জ্জন এবং সে-অর্থ অতি সতর্ক হাতে ব্যয়,—গৃহিণীর জীবন সঙ্গে সঙ্গে সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রুর সোপান গড়াইয়া একেবারে এই যন্ত্রবৎ খাটুনিতে আসিয়া আটকাইয়া গিয়াছে। একদম্ বৈচিত্র্যহীন ..ঠিক ইট-কাঠের জীবনের মত...প্রয়োজন সারাতেই তার চরম সার্থকতা!

গৃহিণীর প্রাণে থাকিয়া থাকিয়া ব্যথা বাজে। পাড়ার আর পাঁচজন আসিয়া কাণের কাছে যখন পাঁচ-রকমের পাঁচটা কথা তোলে, তাঁর মন তখন কুয়াশা ঠেলিয়া বিচিত্র-রঙে রঙীন সেই অতীতের কোণে কিসের সন্ধানে যে ঘুরিয়া ফিরে!

কিন্তু উপায় কি! হিন্দুর ঘরে তিনি পুরুষের স্ত্রী হইয়া জন্ম লইয়াছেন, এই পুরুষ তাঁর ইহকাল-পরকাল, তাঁর ধর্ম্ম, তাঁর তপস্যা! এবং মনে প্রতিবাদ জাগিলেও মুখে সে-প্রতিবাদ তোলা চলে না, ধর্ম্মে চিড়্ খাইবে! কাজেই তিনি নিজের ভাগ্যকে ধরিয়া জিজ্ঞাসাবাদে নিজেকে আরো ব্যথিত করিতে নারাজ!

প্রতিবাদ প্রথম-প্রথম চালাইয়াছিলেন, কিন্তু তরুণ বয়সেই স্বামী প্রৌঢ়ত্বে প্রোমোশন্ লইয়া একেবারে পুঁথির দেবতার মত অটল হইয়া উঠিয়াছেন—স্ত্রীর মান-অভিমানের মিঠা অনুযোগ বা কঠিন রোষ পাষাণে মাথা ঠুকিয়া শুধু মরে! স্বামী-দেবতার পাষাণ অঙ্গ সে মান-অভিমান ভেদ করিতে পারে না!

পালা-আরম্ভ

১

অবস্থা যখন এমন, তখন এক ঘটনা ঘটিল। সেই ঘটনার কথা বলিতে বসিয়াছি।

কিন্তু সে-ঘটনা বলার পূর্ব্বে, ছোট একটু দৃশ্যান্তর বর্ণনার প্রয়োজন আছে। সে দৃশ্যটুকু এই,—

সুরেশ গৃহিণীর ছোট ভাই। সুরেশ সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছে, পত্নী এণা বি-এ পাশ। একে বি-এ, তায় বুদ্ধিতে এণা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা! বড়বাবুর গৃহে এণা আসিয়া গৃহিণীর দশা দেখিয়া ফুঁশিয়া উঠিল,—নিজেদের দাবী ছেড়ে তুমি একেবারে নিজেকে স্যাইফার করে ফেলেচো দিদি! ছি! তাহলে আমাদের এই যে কণ্ঠরব আজ, উচ্চ করেচি আমাদের individualityর জাগরণ-প্রচেষ্টায়,—এ প্রচেষ্টা যে একেবারে ব্যর্থ নিষ্ফল হবে!...

গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন,—একদিন ঝাঁজ দেখিয়েছি এণা, কিন্তু শেষে ভাবলুম, আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে। সংসার ছাড়া সুখ-দুঃখ, মান-অভিমানও ছিল! মনে হতো, সেইটেই জীবন—সংসারটা শুধু জীবনের Back-ground. আজ সে-সব সরে সংসারটুকু পড়ে আছে—একেবারে ছাঁদ-হীন, বৈচিত্র্যহীন প্রান্তরের মত! এ-প্রান্তর পায়ে চলে পার হতেই হবে। তাই, এ নড়াচড়া ..

কথা শুনিয়া এণার সম্ভ্রম হইল। দিদির জীবনের স্ফুলিঙ্গ তাহা হইলে একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই! হয়তো উৎসাহের বাতাস পাইলে আবার জ্বলে!...

এণা কহিল,—হতাশ হলে চল্‌বে না দিদি!

দিদি কহিল,—হতাশ ঠিক নয়, ভাই! তবে কার জন্য, কেনই বা জাগা! যদি একটা ছেলে কি মেয়েও থাকতো

এণা দীপ্ত চক্ষে চাহিল—মাতৃত্বের প্রতি দিদির এত মায়া!

দিদি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

এণা কহিল,—আর কিছু না হোক্,—সব বিষয়ে চুপ করে থাকাও ঠিক নয়। ওতে তোমারও যেমন ব্যক্তিত্ব যাচ্ছে, চাটুয্যে-মশায়েরও তেমনি! অন্ততঃ একটু প্রতিবাদ তুলো। তাতে ভগবানের দেওয়া এই মস্তিষ্ক, তার কিছু চর্চ্চা হবে। মস্তিষ্কই মানুষের প্রধান সম্বল।...

দৃশ্য ছোট; কথাগুলা খুব গভীর দার্শনিক নয়—তবু এ কথাগুলা গৃহিণীর মনে কেমন গাঁথিয়া গেল!

শুধু কি কথার জন্যই? বোধ হয়, না। ছোট ভাইয়ের স্ত্রী এণা...আদরের ভাজ; তায় সে রূপসী, বিদুষী তরুণী! এই ব্যক্তিত্বের জোরেই মানুষের কাছে কথার যা দাম!

এণা সেইদিনই চলিয়া গেল। সুরেশ চলিয়াছে রেঙ্গুনে ওকালতি করিতে,—এণা তার রেঙ্গুনের সঙ্গিনী।

২

এণার সঙ্গে গৃহিণীর উক্ত কথাবার্ত্তার পর প্রায় সাত-আট মাস কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে বর্ণনার মত ঘটনা কিছু ঘটে নাই।

সেদিন রবিবার। বেলা প্রায় এগারোটা। কর্ত্তা কলতলার ফাটা চাতালে মনোযোগ-সহকারে সীমেণ্ট ঢালিয়া মাজিয়া ঘষিতেছিলেন, গৃহিণী রন্ধনশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া সে-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

দ্বারে কড়া নাড়িয়া কে ডাকিল—বেয়ারা···

কর্ত্তা কহিলেন,—কে ?

বাহির হইতে উত্তর আসিল—একখানা চিঠি আছে।

কর্ত্তা গৃহিণীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—দ্যাখো তো গা।

এ-কাজে কর্ত্তার অনুমতি ছিল। স্ত্রী-স্বাধীনতার সম্বন্ধে আজ দশ বৎসর কর্ত্তার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে অর্থাৎ নারীর স্থান অন্দরে এবং ঘোমটার মধ্যে! কিন্তু তা হইলেও প্রত্যেক নিয়মের যেমন exception আছে—তেমনি অবরোধের গণ্ডী-বিধিতেও এমনি দু-চারিটা exceptions কর্ত্তার code-এ চলিত হইয়াছে।

কলতলার পর একটা সরু পথ। এই পথের প্রান্তে সদর দরজা।

কর্ত্তার কথায় গৃহিণী আসিয়া সেই সরু পথে দাঁড়াইলেন। দ্বারের কাছে এক মলিনবেশ ছোকরা। গৃহিণী কহিলেন,—ডাকওলা নয়!... কি চিঠি? দাও...

বালক কহিল,– বাবুর চিঠি। তাঁর হাতে দেবার কথা আছে।

বালকের কথায় গৃহিণী কর্ত্তার পানে চাহিলেন, কহিলেন,—ওগো...

'ওগোর' কাণেও কথাটা পৌঁছিয়াছিল। 'ওগো' মুখ খিঁচাইয়া কহিলেন,—ওঁর হাতেই চিঠি দাও। আমি কাজে ব্যস্ত আছি।

বালক কহিল,—আজ্ঞে, আমায় বলে দেছে, বাবুর হাতে ছাড়া আর কারো হাতে এ-চিঠি দিবি না...

কর্ত্তা কহিলেন,—ভালো ফ্যাশাদ! কার চিঠি রে বাপু!...কে লিখেচে?

বালক কহিল,—আজ্ঞে...

গৃহিণী কহিলেন,—কার চিঠি—সত্যি তো! এমন কি যে আমার হাতে দেবে না!

কর্ত্তা কহিলেন,—চিঠি ঐখানে রাখো, তাহলে...

বালক কহিল,—আজ্ঞে, আপনার হাতে দেবো...বলিয়া সে চিঠি দেখাইল।

গোলাপী খাম। গৃহিণী কহিলেন,—খামে কার নাম লেখা দেখি! বিয়ের চিঠি নাকি? গোলাপী খাম! বাড়ী ভুল হয়নি তো?

বালক খামখানা দেখাইয়া কহিল,—আজ্ঞে না। এই যে লেখা—শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। এই নম্বর ৪৯। এ বাড়ীর নম্বর ৪৯ দেখে তবে আমি কড়া নেড়ে ভিতরে ঢুকেচি।

গৃহিণী দেখিলেন, খামের লেখাটুকু মেয়েলি হাতে! এ-চিঠি কে লিখিল?

বালক কহিল,—বিয়ের চিঠি নয়...

কর্ত্তা তখনো কর্ণিক ঘষিয়া সিমেণ্ট মাজিতেছিলেন; কহিলেন,—কার চিঠি, বলোই না...

এ-কথায় বালক গৃহিণীর পানে চাহিল, তার পর কহিল,—মণিমালা দেবীর কাছে থেকে আসচি...

মণিমালা দেবী! গৃহিণীর বিস্ময়ের সীমা নাই! সে আবার কে? কর্ত্তা উঠিয়া দাঁড়াইলেন...

গৃহিণী কহিলেন,—চিঠি দাও। আমি বাবুকে দিচ্ছি।

কর্ত্তা আগাইয়া আসিলেন, কহিলেন,—এ মণিমালা দেবীটি কে?

বালক মৃদু হাসিল; তার পর কহিল,—সেই যে চাঁপাতলায় ক'দিন যেখানে গেছলেন...

কর্ত্তা স্তম্ভিত! গৃহিণীর পানে চাহিলেন। গৃহিণীর মুখে কথা নাই,—দুই চোখের দৃষ্টি স্থির! বালক কহিল,—তাহলে চল্‌লুম।

গৃহিণীর হুঁশ হইল, সেই সঙ্গে কর্ত্তারও। কর্ত্তা কহিলেন,—চিঠি?

বালক কহিল,—লুকিয়ে দিতে বলেছিলেন—কেউ যেন না জানে! যদি আর কেউ দেখে, কিম্বা, জেনে ফেলে, তাহলে দিতে বারণ! যা হোক আমি যাই। আপনি আজই গিয়ে দেখা করবেন। বলে দেছেন, খুব দরকার আছে... বলিয়াই বালক নিমেষে সদর দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

কর্ত্তা ও গৃহিণী হতভম্ব! দুজনেই চেতনাহীন। গৃহিণী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন,—সে নিশ্বাসে তাঁর চেতনা ফিরিল। চেতনা ফিরিতে তিনি দেখেন, কর্ত্তা গিয়া কলতলায় বসিয়াছেন, তাঁর হাতে সেই কণিক। গৃহিণীর চোখের সাম্‌নে এণার মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে এণার সেই কথা—সব বিষয়ে চুপ করে থেকে ব্যক্তিত্ব হারিয়ো না, দিদি!

ঠিক কথা! এমনি চুপ করিয়া থাকিয়া আজ কোথায় নামিয়া আসিয়াছেন! কিন্তু কেন? সত্য, জীবন এখনো

ফুরায় নাই—কতদিন এখনো বাঁচিতে হইবে! এবং বাঁচিতেই যদি হয়...

গৃহিণী কহিলেন,—এ মণিমালা দেবীটি কে, শুনি—

স্বর শুনিয়া কর্ত্তা কহিলেন,—জানি না!...তিনি আবার সিমেণ্টে মন দিলেন।

গৃহিণী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাঁকে লক্ষ্য করিলেন, পরে কহিলেন,—হুঁ!...সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী...

অতীতে নারীর এই ভ্রূভঙ্গীতে কত রাজ্য চূর্ণ হইয়াছে, কত বিপ্লব, কত যুদ্ধ ..তার ইয়ত্তা নাই!

গৃহিণীর ভ্রূভঙ্গী মধু চাটুয্যে লক্ষ্য করেন নাই...তাঁর মাথা তখন মণিমালা দেবীর চিন্তায় বিভোর! তিনি ভাবিতেছিলেন,—

তাই তো! ছেলেটা বাজীর মত শোঁ করিয়া চলিয়া গেল কেন? কে এই মণিমালা?...ঠিকানা ভুল হয় নাই? ৪৯নং বাড়ী...মধুসূদন চাটুয্যে! বয়স হইয়াছে, তবু ঐ নাম-সঙ্কেতে প্রাণ এখনো দোলে!

৩

পরের দিন অফিস খোলা। আহারাদি সারিয়া মধু চাটুয্যে অফিসে ছুটিলেন। গৃহিণীর মৌন মূর্ত্তি...মুখে কথা নাই। বড়বাবু তাহাতে বিস্মিত হইলেন না! এমন তো আরো হইয়াছে! বেশী বয়সে মনের তরলতা ঠিক নয়।

অফিস হইতে ফিরিয়া দেখেন, বাড়ীর সদরে চাবি বন্ধ! ব্যাপার কি? সামনে মুদির দোকান। মুদি আসিয়া বলিল,—মা-ঠাকরুণ বাপের বাড়ী গেছেন। চাবি রেখে গেছেন, আর এই চিঠি...

কর্ত্তা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। চাবি লইয়া দ্বার খুলিয়া গৃহে ঢুকিলেন; পরে মুখ-হাত ধুইয়া কম্পিত হাতে চিঠি খুলিলেন। চিঠিতে লেখা আছে,—

"যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমার ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসের পাত্র, ততদিন আমার বিশ্বাস। তা যখন টুটিল, তখন তোমার সঙ্গে এক গৃহে আর বাস করিতে পারি না।

যদি কোনোদিন বোঝো, নিঃস্বার্থ অকপট প্রেম কোথায়, তবেই সেদিন গৃহে ফিরিব।

তুমি আমারই—মণিমালার নও।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' এমনি কথা পড়িয়াছিলাম। যদি তোমার মনে না থাকে, তাই কয় ছত্র লিখিয়া মনে করাইয়া দিলাম।

বই কাছে নাই বলিয়া কোটেশনে কিছু ভুল থাকিতে পারে; কিন্তু মর্ম্মটুকু ঠিক এই। ইতি

শ্রীমতী নন্দরাণী দেবী

চিঠি পড়িয়া মধু চাটুয্যে প্রথমে স্তম্ভিত, পরে ক্রুদ্ধ এবং অবশেষে হৃষ্ট হইলেন।

হৃষ্ট হইবামাত্র তিনি হিসাবের খাতা খুলিয়া কতকগুলা পাতা উল্টাইয়া কি-সব হিসাব দেখিলেন, দেখিয়া মনে মনে কহিলেন,—এ-মাসে আর সাতটা দিন বাকী। চাল যাহা আছে, তাহাতে বেশ চলিয়া যাইবে। একলা মানুষ! এ-মাসে চাল আর কিনিতে হইবে না। আঃ!

আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি সংসারের তত্ত্ব লইতে চলিলেন। রান্নাঘরে উচ্ছিষ্ট থালা-বাটী পড়িয়া আছে; উনানে রাশীকৃত পাঁশ, ভাঁড়ারে তরী-তরকারীর চিহ্নমাত্র নাই।...চাল-ডাল? আছে... কিঞ্চিৎ।

মধু চাটুয্যে ভাবিলেন, যাক্, আলো জ্বালার প্রয়োজন নাই! আজ রাত্রে নিদ্রা দি, কাল সকালে ভাত, এবং আলু-ভাতে...ব্যস্!

পরদিন কিন্তু অসুবিধা ঘটিল। সকালে সেই উচ্ছিষ্ট বাসন মাজা শেষ করিয়া উনান ধরাইতে গিয়া মধু চাটুয্যে দেখেন, এ এক বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। শিক্ষা নহিলে এ-কাজে সফলতার আশা নাই! মুদিকে খোসামোদ করিয়া আনিয়া তাকে দিয়া উনান ধরাইয়া লইলেন—পরে হাঁড়িতে চাল ও জল ঢালিয়া, সেই সঙ্গে দুটা আলু ছাড়িয়া তিনি গেলেন স্নান করিতে!...অসুবিধা কাঁটার মত বিঁধিলেও ব্যয় কমিয়াছে, এ-চিন্তায় প্রচুর আরাম! আরাম ঠেলিয়া কাঁটার যাতনা মাথা তুলিবে, এমন তার সাধ্য নাই!

আহারে বসিতে সেই শৈশবের অশ্রু দুই চোখ ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়—বুকে-জমা এতদিনকার কত কঠিন নুড়ি-পাথরের গা বহিয়া!...মনকে তিনি বুঝাইলেন, গৃহিণীকে আসিতেই হইবে! গৃহ ছাড়িয়া ক'দিন বাহিরে থাকিবে? গৃহের প্রতি মায়া কি সত্যই নাই ...যে-গৃহের সঙ্গে এতকালের ঘনিষ্ঠতম পরিচয়?

আরো দু'তিনদিন কাটিল,—বড়বাবু প্রত্যহ অফিস হইতে ফিরিবার সময় ভাবেন, আজ গিয়া দেখিব, গৃহিণী...

কিন্তু তাঁর আশা মিটিল না, অর্থাৎ গৃহিণী ফিরিলেন না। বড়বাবু নিশ্বাস ফেলিলেন। যে-মানুষটি শুধু রান্নাবান্না এবং ক্বচিৎ কখনো ছোট একটু অনুযোগ-অভিযোগ লইয়া থাকিত, সে যে

তুচ্ছ-তাচ্ছল্যের নয়, এ-বয়সেও বড়বাবু ক্রমে তাহা উপলব্ধি করিলেন। ভাবিলেন, একবার যাই, গিয়া গৃহে ফিরাইয়া আনি।...পরক্ষণে মনে হইল, না! সাধিয়া আনিলে বহু বিপ্লব সেই সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইবে! তার চেয়ে...

পরদিন তিনি অফিসের দরোয়ানকে ডাকিলেন,—রঘুনন্দন, বাবা...

রঘুনন্দন কহিল,—জী ..

বড়বাবু কহিলেন,—তোমার ঐ ভাইপো· ·ওর চাকরি হলো ?

রঘুনন্দন কহিল,—হাঁ, ওই যশ্‌দানন্দন ? তা, আপ্‌কা মেহেরবাণী হোনেসে...রঘুনন্দন বিনয়ে একেবারে অবনত হইয়া পড়িল।

বড়বাবু কহিলেন,—বেশ, সাহেবকে একবার সময়-মত বলবো। কিন্তু তার আগে...

বড়বাবু দ্বিধা ছাড়িয়া কথাটা পাড়িলেন, কহিলেন—তোমার ভাইপো! তাকে ফেলতে পারি না। তা আপাততঃ আমার বাড়ী দুবেলা দুটী ভাত চড়িয়ে আমায় যদি খাওয়ায়...

রঘুনন্দন বহুবার বড়বাবুর গৃহে গিয়াছে...ফাই-ফরমাশে। বাড়ীর হাল তার অবিদিত নয়। সে কহিল,—মা-জী.. ?

বড়বাবু কহিলেন,—তোমার মা-জী থোড়া তীরথ্‌ করতে গেছেন কিনা...

রঘুনন্দন কহিল,—বহুৎ খুব...

বড়বাবু কহিলেন,—কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, আমরা মছলী খাই —তোমার ভাইপোর খাওয়া আমার ওখানে...শেষে যদি জাত যায় ?

রঘুনন্দন কহিল,—তাতে কি! ও আপিসমে আয়কে খাবে। হামি ভাত পাকাইবে...

হরেনের সাঁতারের পোষাকে সেদিন তার নামের হরফ সেলাই করা চাই। সে আসিয়া ডাকিল,—বৌদি...

চিন্তা কহিল,—কেন ?

হরেন কহিল,—আমার নামের আদ্যক্ষর 'এইচ'···এই লাল সুতোয় পোষাকে তুলে দিতে হবে।

চিন্তা পোষাক লইয়া হরফ তুলিতে বসিল। রঙ্গলাল আসিয়া একরাশ বাদাম আনিয়া কহিল,—এখনি বাদাম-গুলোর খোসা ভেঙ্গে দাও।

চিন্তা কহিল,—দি—আগে হরেনবাবুর এই পোষাকে...

রঙ্গলাল সে-কথা শেষ হইতে দিল না, সবেগে পোষাকটা কাড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিল,—আমি স্বামী, আমার হুকুম আগে।

এমনি ছোট-খাট স্ফুলিঙ্গ নিত্য বর্ষিত হয়! আজ হঠাৎ একটা বড় ড্যালা! চিন্তা কহিল,—ওঁর এখনি দরকার।

রঙ্গলাল কহিল, রেখে দাও এখনি দরকার! কোথাকার কে...

চিন্তা অবাক্। এদের পরিচর্য্যার দিকে তাকে মনোযোগী করিয়া তুলিবার পক্ষে রঙ্গলাল বরাবর প্রচণ্ড উপদেশ দিয়াছে!

রঙ্গলাল কহিল,—আমাদের মনু-পরাশর ঠিক ব্যবস্থা করেছিলেন ...মেয়েদের নাই দিতে নেই!

উৎকণ্ঠায় চিন্তার মন ভরিয়া উঠিল। সে স্বামীর পানে চাহিল; কহিল,—কি বলচো ?

রঙ্গলাল কহিল,—ওদের তুমি মনে মনে ভালোবাসা···আমার তা সহ্য হয় না।

চিন্তা কাঠ! স্বামীর মুখে এমন সব কথা, স্বামীর-দেওয়া নিত্য এমনি ছোটখাট বহু আঘাত সে আঘাত তার গায়ে লাগিত না।

সে-সব আঘাতে সে কৌতুক বোধ করিত! কিন্তু আজ এ কি সব অভদ্র ইঙ্গিত ..

রঙ্গলাল বকিয়া চলিল, যা-তা...কথাগুলা যেন তীক্ষ্ণ কাঁটা! সে-কাঁটায় চিন্তার মন ক্ষতবিক্ষত হইল।

তারপর বেদনা গভীর হইতে লাগিল। যে বন্ধু ও শিষ্য-দলের প্রতি চিন্তার মনোযোগ তিলমাত্র শিথিল হইলে রঙ্গলাল জ্বলিয়া উঠিত, তাদের প্রতি দরদে স্বামীর দিক হইতে আজ টিটকারী-বিদ্রূপ উৎস খুলিয়া দিল! চিন্তা কাঁটা হইয়া থাকিত, পাছে এ-সব কথা বন্ধুদের কানে যায়!

সেদিন কোনোমতে অশ্রু চাপিয়া চিন্তা কহিল,—বেশ, ওঁদের সাম্‌নে আমি আর বেরুবো না।

রঙ্গলাল কহিল,—নাহলে আমায় ওদের সামনে ছোট করে পরম গৌরব উপভোগ হবে না যে!

চিন্তা কহিল, - তবে?

রঙ্গলাল কহিল,—তবে....কি? কার প্রতি কি ব্যবহার উচিত, জানো না?

এমনি পীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া চিন্তা একদিন 'অন্দর' পত্রিকায় এক চিঠি লিখিয়া বসিল, —

"আমি তরুণী বিবাহিতা মহিলা। কাব্য-সুখ জীবনে না পাই, স্বামীর গৃহে আমার কোনো দুঃখ ছিল না। স্বামী আমায় ভালোবাসায় অভিভূত করিয়া না দিলেও স্নেহ করিতেন। গৃহে শান্তি ছিল। তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করি--এ তাঁরই আগ্রহে। বন্ধুরা ভালো লোক, ভদ্র। সম্প্রতি স্বামীর মনে সন্দেহ-বিষ ঢুকিয়াছে। তাঁর বন্ধু-বান্ধবের প্রতি যত্নে আমার এতটুকু ত্রুটি ঘটিলে স্বামী আগে রসাতলে

পাঠাইতেন, এখন তাঁর মতে আমার সেই যত্নই যত অশান্তির মূল। হিংসা ঢাকিয়া তিনি এমন সব মন্তব্য করেন যে, জীবন আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আত্ম-হত্যায় আমার রুচি নাই, আমি বাঁচিতে চাই। কি করিয়া স্বামীর এ রোগ সারিবে, আমায় জানাইলে বড় সুখী হইব। ইতি

বাঙালী বধূ

অন্দরের চিঠি-পত্র কলমে এ-চিঠি এবং সেই সঙ্গে তার জবাব ছাপা হইল। অন্দর জবাব লিখিলেন—

অয়ি ভদ্রে, এই সন্দেহ-বিষ বা হিংসাই ভালোবাসার ছদ্ম-মূর্তি। এই হিংসা যতদিন স্বামীর চিত্তে ধুমায়িত থাকিবে, ততদিন স্বামীর প্রেমে বঞ্চিতা নহ, জানিবে। সুতরাং হিংসার ঐ ধুমায়িত বহ্নিতে বেশ সতর্ক ভাবে ঘৃতাহুতি দিতে শৈথিল্য করিয়ো না। ঐ হিংসা-বহ্নি প্রণয়কে আহিতাগ্নিকের অগ্নির মত চির-জাগরূক রাখে, প্রণয়ে কখনো অবসাদ ঘটিতে দেয় না। কিন্তু সাবধান ভদ্রে, হিংসার এ আগুন জ্বালাইতে গিয়া নিজেকে যেন দগ্ধ করিয়ো না, যেহেতু বহ্নি-দগ্ধা বাঙালীর মেয়ের দাঁড়াইবার আশ্রয় বাঙলা দেশে নাই। ইতি

সাধু।

৩

শিল্পী নীরদ কবিতা লিখিতে সুরু করিয়াছিল—উৎসাহের জলসেকে চিন্তা তার ভাব-কলি প্রস্ফুরিত করিতে উদ্যত হইল।

সেদিন নীরদের জন্মতিথি। চিন্তা তাকে নিমন্ত্রণ করিল এবং তার জন্মতিথিকে রীতিমত উৎসবে বিমণ্ডিত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে বিচিত্র আয়োজনে সে মগ্ন রহিল।

ফলে রঙ্গলাল সেদিন বাদাম পাইল না; এবং তার আহারের সময় চিন্তা একবার আসিয়া কাছে বসিল না...এবং আরো নানা দিকে সে সুগভীর তাচ্ছল্য লক্ষ্য করিল।

দু-তিনদিন পরে আর-এক ঘটনা।...

স্নান করিয়া আর্শির সামনে দাঁড়াইয়া রঙ্গলাল মাথায় ব্রশ্ চালাইতেছিল; চিন্তা আসিয়া কহিল,—আশুবাবুর সামনে আমি আর বেরুবো না। সেজন্য তুমি কিন্তু রাগ করতে পাবে না...

রঙ্গলাল স্ত্রীর পানে না চাহিয়াই কহিল,—হুঁ...

চিন্তা কহিল,—তাঁর কথা-বার্ত্তা ভারী অসভ্যর মত.

রঙ্গলাল কহিল,—বটে!

একটু উত্তেজিত স্বরে চিন্তা কহিল,—আজ এই একটু আগে আমি রান্নাঘর থেকে আসচি, তিনি আমায় কি বললেন, জানো?

সম্পূর্ণ অবিচলিত ভাবে রঙ্গলাল কহিল,—কি?

চিন্তা কহিল,—বললেন, মুখখানি রাঙা হয়ে উঠেচে বৌদি···ঠিক যেন বশ্‌রাই গোলাপ!

রঙ্গলাল কহিল,—সত্য কথাই বলেচে এবং ভালো কথা!

চিন্তা কহিল,—ভালো কথা! কি যে বলো তুমি...তাঁকে এ বাড়ীতে আসতে বারণ করে দেবে। একজন ভদ্র-মহিলার সঙ্গে কথা কইতে জানে না যে. তার উপর এই এক বাক্স চিঠির কাগজ আমায় উপহার দেছেন. তার সঙ্গে খামে-মোড়া এই কবিতা। পড়ে দ্যাখো···

রঙ্গলালের হাতে সে কবিতা গুঁজিয়া দিল। রঙ্গলালকে অগত্যা সে কবিতা পড়িতে হইল,···

কেন হেথা আসি,—মুগুর ভাঁজিতে কি রে?

ডাম্বেল লয়ে খেলিব বলে কি আসি?

না, না, সখি নয়—তোমার ও মুখশশী
দেখে আনন্দ! দেখিতে তা ভালোবাসি!

কবিতা পড়িয়া রঙ্গলাল অপচল স্বরে কহিল,—এ কবিতার ভাব ভালো। তবে লাইনগুলো বিশ্রী এলোমেলো— তোমায় শুধরে দিতে দেছে, বুঝি?

ছুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চিন্তা কহিল,—শুধরে দিতে দেছে! তুমি...

রঙ্গলাল কহিল,—গর্ব্ব বোধ করচি! আমার স্ত্রী এমন যে তাকে দেখে···

রঙ্গলাল ঘরের বাহির হইয়া গেল, আর চিন্তা মেঝেয় বসিয়া পড়িল। তার মাথায় যেন বাজ পড়িয়াছে, এমনি তার মুখের ভাব!...

স্বামীর এমন বিরাগ, এমন

চিন্তা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া 'অন্দর' কাগজে ছাপা 'সাধু' সম্পাদকের জবাব পড়িল; তার পর আকাশের পানে চাহিল, অমন রৌদ্র-ভরা আকাশ একেবারে যেন ঘোলাটে হইয়া রহিয়াছে'

পরের দিন বৈকালে রঙ্গলাল গৃহে ফিরিল—বেতোড়ে ব্যায়াম সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া। সারাদিনের পরিশ্রম···সে আসিয়া ফ্যান খুলিয়া ইজিচেয়ারে দেহ-ভার লুটাইয়া দিল। সজ্জিত বেশে চিন্তা আসিয়া কহিল,—এই যে ফিরেচো। তোমার খাবার-দাবার ঠিক করে আমি বেরুচ্ছি লীলাময় বাবুর সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখতে। খাশা লোক এই লীলাময় বাবু...আমায় একশিশি দামী এসেন্স কিনে দিয়েচেন, তিনি বায়োস্কোপে যেতে বললেন···কথা না রাখা ভালো দেখায় না।

এমনি অসংলগ্ন বহু কথা চিন্তা এক-নিশ্বাসে বকিয়া গেল। রঙ্গলাল কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। সে ইজিচেয়ারে বসিয়া

রহিল, যেন মাটির তৈরী একটা পুতুল! লীলাময় আসিয়া কহিল,—আর দেরী করবেন না বৌদি এই যে রঙ্গলাল!···তা এখন এলে! আসুন বৌদি .আমি আবার ইম্পিরিয়ালে খাওয়ার ব্যবস্থা করেচি···দুজনের মত। বৌদিকে ছেড়ে দাও হে রঙ্গলাল।

রঙ্গলাল কহিল,—হ্যাঁ, যাও গো ··তোমাদের দেরী হয়ে যাবে...

চিন্তা চলিয়া গেল—কিন্তু তার যাওয়ার উৎসাহ ঝড়ের হাওয়ায় দীপের মত নিবিয়া গেল! যে-রঙ্গলাল সামান্য ব্যাপারে জ্বলিয়া উঠিত, সেই রঙ্গলাল আজ...অন্দরের জবাব চিন্তার মনে পড়িল।

ভালো ছবি, লীলাময়ের কত গল্প—চিন্তার কিছু ভালো লাগিল না। চিন্তা উঠিয়া দাঁড়াইল; কহিল,—আমার মন বড় খারাপ লীলাময় বাবু, আর বসতে পারচি না।

কাজেই উঠিতে হইল। ট্যাক্সি করিয়া বাড়ী ফিরিয়া চিন্তা শুনিল, রঙ্গলাল ও-পাড়ায় গিয়াছে—ছেলেদের স্কুলে কি একটা কাণ্ড আছে, মেয়র আসিবেন,···তারি উদ্যোগ-আয়োজনের সুব্যবস্থা করিতে। চিন্তা আসিয়া নিজের সজ্জা-ভূষণ খুলিয়া ফেলিল, তার পর রান্নাঘরে গিয়া ডাকিল,—ঠাকুর···

—মা ..

—কি রান্না করচো?

– মাংস। বাবু বলে গেলেন, রাত্রে মাংস রাঁধতে...

—তুমি ওঠো। বাবু কি মাংস ভালোবাসেন, তুমি ঠিক জানো না তো...

ঠাকুরকে উঠাইয়া চিন্তা নিজে বসিয়া চিংড়ী-মাছের মালাই-কারি রাঁধিল, তার পর মাংস.. সেই সঙ্গে আরো দু'চারিটা তরকারী...

রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল...রঙ্গলাল ফিরিল। চিন্তা

কহিল,—আমি ঠাঁই করে দিই গে। তুমি ঠাকুর, গরম গরম লুচি এনে বাবুর পাতে দেবে

দোতলার ঘরে আসন পাতিয়া স্বামার আহারের আয়োজন করিয়া চিন্তা বসিয়া রহিল। রঙ্গলাল তবু দোতলায় ওঠে না! ব্যাপার কি...?

চিন্তা আসিয়া শেষে বাহিরের ঘরে ঢুকিল, দেখে, রঙ্গলাল তার ব্যায়ামের মুগুরটা কি কাগজ দিয়া ঘষিতেছে··

চিন্তা কহিল,- এত রাত্তিরে না খেয়ে একি হচ্ছে তোমার! দাও, আমি করে দি···

রঙ্গলালের হাত হইতে মুগুর কাড়িয়া সে তার পরিচর্য্যায় লাগিল, তার পর স্বামীর হাত ধরিয়া কহিল,—খাবে চলো। আমি নিজের হাতে আজ রেঁধেচি···

রঙ্গলাল চিন্তার পানে চাহিল।

চিন্তার দুই চোখে জল ঠেলিয়া আসিয়াছিল। বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে সে কহিল,—কেন তুমি এমন চুপ করে থাকো, বলো তো? কেন এমন হয়েচো! সে-রাগ নেই, সে-বকুনি নেই ··কিছু না!

রঙ্গলাল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—হুঁ

চিন্তা কহিল,- আমার ব্যবহারে কষ্ট পেয়েচো! কি করবো, বলো? অন্দরের সম্পাদক আমায় উপদেশ দিয়েছিল...তুমি যা-তা বলতে আমায়, তাই আমি চিঠি লিখে প্রতিকার চেয়েছিলুম। দুটো চিঠিই অন্দরে ছাপা আছে···দেখবে, চলো···

রঙ্গলালকে একরকম টানিয়া চিন্তা দোতলার ঘরে আনিল; আনিয়া অন্দরের ছাপা চিঠি ও তার জবাব দেখাইল···

চিন্তা কহিল,—তোমার সে-হিংসা নিবে গেছে, সেজন্য আমি আবার সে-হিংসা জাগাবার জন্য অভিনয় করচি। তবু তোমার মুখে

একটি কথা ফোটাতে পারি নি! কেন. কেন, কেন তুমি আমায় আর সে-সব কথা বলো না···?

রঙ্গলাল কহিল,—কেন বলি না? এই ছাখো তার কারণ

রঙ্গলাল 'অন্দর' মাসিকপত্রের একটা পৃষ্ঠা চিন্তার সামনে ধরিয়া দিয়া কহিল,—পড়ো—

চিন্তা পড়িল—"হে পালোয়ান, তোমার চিঠি পড়িলাম। স্ত্রীর প্রণয়ে সন্দেহ করিয়ো না। সন্দেহের মত শত্রু আর নাই।"

হাসিয়া চিন্তা কহিল,—তাই! বটে··· ও!

রঙ্গলাল কহিল—তাই। আমার ডাম্বেল আছে. মুগুর আছে. আমি শক্তির উপাসক—কিন্তু এ শক্তির উৎস তুমি···তুমি শ্রীমতী চিন্তা···

সুখে-দুঃখে

উৎপল স্বামী, স্ত্রী মঞ্জরী। উৎপল কবিতা লেখে, সে-কবিতা মাসিক-পত্রে ছাপা হয়। বন্ধু-মহলে তার কবিতার খুব আদর এবং পরিচিত বহু তরুণ-সভায় কবিত্ব-গৌরবে দস্তুর-মত আসনও সে পাইয়াছে।

মঞ্জরী গান গায় হার্মোনিয়ম বাজায়। তার একটি বান্ধবী-দলও গড়িয়া উঠিয়াছে। সে-দল, এবং সে-দলের বাহিরে উৎপলের আর্টিষ্ট-বন্ধুর দল, দু'দলই একবাক্যে রায় দিয়াছে,—রবি বাবুর গান গাওয়ায় মঞ্জরীর নিপুণতা একটু অসাধারণ; প্রাণের এমন দরদ ঢালিয়া মঞ্জরী রবি বাবুর গান গায় যে, স্বরলিপিকেই যাঁরা সুর রপ্ত করিবার উপায় ঠাওরাইয়া রাখিয়াছেন, মঞ্জরীর ছাইলে গান গাহিবে, এমন সাধ্য তাঁদের নাই—সুর-শিল্পী দিনেন্দ্রনাথের তদ্বিরে সে-স্বরলিপির বই ছাপা হওয়া সত্ত্বেও!

আমাদের এ গল্প যদি এইখানেই শেষ করিতে পারিতাম তো বেশ হইত! তরুণ বয়স, স্বামী ও স্ত্রীর প্রাণে প্রণয়ের এই প্রথম আবেগ, কবিতা আর গান—জীবন যদি এই আলো আর সুরের পথেই বহিয়া চলিত তো পরলোকের তত্ত্ব লইয়া কেহ মাথা ঘামাইত না, কল-কারখানার ঘড়ঘড়ানিতে দুনিয়ার কাণে তালা লাগিত না, চিমনীর ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার হইয়া উঠিত না, এবং এই ঝাঁপাঝাঁপি, ছুটা-ছুটি, এই দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অভিযোগের বিভীষিকায় প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া জগৎকে অনিত্য বলিয়া বিধাতাকে ধরিবার কশ্‌রৎও মানুষ করিত না! কিন্তু তা হয় না; এবং হয় না বলিয়াই শাস্ত্র, বিজ্ঞান

এবং বহুবিধ গোলযোগে পড়িয়া সারা দুনিয়া দুলিয়া ঘুরপাক খাইয়া মরিতেছে !

উৎপল আর মঞ্জরী—বন্ধুর দল তাদের দেখিয়া নিশ্বাসও ফেলিত ! খাশা আছে দু'জনে। কোনো ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, জীবনে প্রব্লেম্ নাই, জটিলতা নাই, মুক্ত প্রাণের অবাধ আনন্দে স্বামী কবিতা লিখিতেছে, স্ত্রী গান গাহিতেছে ! কাল কি হইবে- কোথা হইতে কোন্ পাওনাদার আসিয়া গর্জ্জন তুলিবে, কোন্ দিকে কি খিটমিটি বাধিবে, সে-চিন্তাও নাই ! জীবনে এই যে নানা অভাব-অভিযোগ, কোন্টা কোন্ দিকে কখন্ আর্ত্ত চীৎকার তুলিয়া সুরের স্বপ্ন ফাঁশাইয়া দিবে, সে ভয়ও নাই ! অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা মনের কোণে উদয় হয় না— ছেলেমেয়ে নাই যে, তাদের সর্দ্দি-কাশী বা ডিপ্থিরিয়ার হাঙ্গাম পোহাইতে হইবে ! ফুলের পাপড়ি-ঝরা দীর্ঘ পথ সামনে পড়িয়া আছে—সুরে-ছন্দে পা ফেলিয়া সোজা চলিয়া যাও !

কান্তি, বিমল, অজিত, চারু—এরাও কি কবিতা লেখে না ? লেখে। তরুণ বয়সে প্রাণের পাত্র রঙীন্ ভাবে ভরিয়া আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাণের পাশে সংসারের ভারী জাঁতা ঘোরার ঐ বিশ্রী শব্দ... সে যে কতখানি রসভঙ্গ করে ! থাকিয়া থাকিয়া মনে এমন আশঙ্কাও জাগে, এই জাঁতা ঘোরার বেগ পরে যখন আরও বাড়িবে, সে রুদ্র গর্জ্জন সহিয়া কল্পনা চিত্ত-পুরীতে তিষ্ঠিতে পারিবে কি ?

আর উৎপল ?

কল্পলোকের বাহিরে সংসারের যে-দাবী ফুঁশিয়া ফেরে, সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার যে মত্ত হুঙ্কার—তার কুঞ্জবনের নাগাল এরা পায় না সেখানকার মায়া-বিভ্রমের সুর তাই অমন অটুট ! সে মায়াকুঞ্জের এক কোণে বসিয়া উৎপল কবিতা লেখে, লিখিয়া ভালো রুল-টানা কাগজে

সে-কবিতা মুক্তার হরফে 'ফেয়ার' করে; তার পর সেই মুক্তার হরফে-গাঁথা কাগজ যায় মাসিক-পত্রের কার্য্যালয়ে। সেখানে সম্পাদকের হাত হইতে কম্পোজিটরের কালি-মাখা হাত ঘুরিয়া আবার মুক্তার মালায় ফুটিয়া মাসিকের বুকে দুলিতে থাকে! কুঞ্জের আর এক কোণে মঞ্জরী বসিয়া গান গায়। স্বরলিপির বইয়ে ছাপা গান তার কণ্ঠ বহিয়া সুরের ধারায় ঝরিয়া পড়ে!

এমনি করিয়া দিন কাটে, রাত্রি নিঃশব্দ পায়ে চলিয়া যায়—আর্টের চর্চ্চায় কোনো বিঘ্ন নাই, উপদ্রব নাই! দুজনের প্রাণে পুলক সীমাহীন!

কিন্তু...

বাহিরের বিরাট কর্ম্মজগৎ—মায়া-লোক হইতে সম্পূর্ণ সে ভিন্ন। সে জগৎ চাকায় ভর রাখিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—বিরাম-হীন গতিতে। তার সে-চাকার নীচে প্রতি নিমেষ ঝরিয়া পড়িতেছে কত বুকের কত উদ্যম, কত আশা, কত পুলক, কত হাসি, কত অশ্রু পড়িয়া চাকার আঘাতে চূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে! এবং এই কর্ম্মজগতের রথ-চক্রের নীচে উৎপল-মঞ্জরীর আনন্দ-পুলক-কল্পনার আর্টও একদিন লুটাইয়া পড়িল! তার গর্জ্জনে চমকিয়া স্বামী-স্ত্রী চাহিয়া দেখে, দ্বারে মস্ত দাবী সাড়া তুলিয়া হাজির!

চেকের কেতাবে হাত পড়িল, ব্যাঙ্কের খাতা টানিয়া উৎপল দেখে, জমার অঙ্কে মস্ত ফাঁকি। বন্ধু পাশে ছিল, খাতা দেখিয়া সে কহিল, কলসী থেকে জল গড়ানোর যে গল্প চলিত আছে, সে তা হলে গল্প নয়, কঠিন সত্য!

নিশ্বাস ফেলিয়া বন্ধু রসের পিপাসায় রসালো দ্বিতীয় পাত্রের সন্ধানে বাহির হইল।

কুঞ্জ-তলে উৎপল নাই দেখিয়া মঞ্জরী গান থামাইয়া পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

উৎপল গালে হাত দিয়া চেয়ারে বসিয়া ছিল; মঞ্জরী কহিল,—তোমার নতুন বই 'চিঙ্কিকা'র কভারের ডিজাইন ভাবচো বুঝি! এর মধ্যে আট ফর্মা ছাপা শেষ হলো? বাঃ!

উৎপল নিশ্বাস ফেলিয়া মঞ্জরীর পানে চাহিল, আহা, তরুণী প্রিয়া! সংসারের কঠিন ভ্রূকুটির কোনো সন্ধান রাখে না!...আরো একটা নিশ্বাস...সে নিশ্বাসটাও সে চাপিতে পারিল না।

ব্যাকুল কণ্ঠে মঞ্জরী কহিল,—কি হয়েচে?

উৎপল কহিল,—একটা কথা ভাবছিলুম।

মঞ্জরী কহিল,—কি কথা?

উৎপল কহিল,—'অনাবিলা' মাসিকের সম্পাদকী নিতে হলো, দেখচি। ওরা ভারী ধরেচে।

মঞ্জরীর চোখ পুলকে উলসিয়া উঠিল। সে কহিল,—এতে আবার ভাবনার কি আছে! এখনি নাও...

উৎপল কহিল,—সম্পাদকী করতে গেলে কি লেখা চলবে? দিবা-রাত্র কত ছাই-পাঁশ ঘাটতে হবে। তা ছাড়া ওরা মাইনে নিতে বলে. সৌখীন সম্পাদকী নয়।

মঞ্জরী কহিল,—একটা নাম হবে—সম্পাদক! কবি-খ্যাতি তো তোমার আছেই। তবে মাইনে...

উৎপল সংক্ষেপে কহিল,—তাই ভাবচি।...

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। উৎপল সাজিয়া-গুজিয়া বাড়ীর বাহির হইল। মঞ্জরী কহিল,—'অনাবিলা' আপিসে যাচ্ছো?

ঘাড় নাড়িয়া উৎপল জানাইল, হাঁ।

সে জানে, পয়সা খরচের ব্যাপারে বড়বাবুর কুণ্ঠা কতখানি! তাই ওদিক দিয়া না গিয়া সে ভাবিল, এমনি ভাত পাকাইয়া বড়বাবুর মন যদি যশোদা অধিকার করিতে পারে, তাহা হইলে চাকরিটুকু কায়েমি হওয়ার পক্ষে আশা থাকে!...

সেই ব্যবস্থাই হইল ..

কিন্তু যশোদা খোট্টা...সদ্য দেশ হইতে আসিয়াছে—তার হাতে অন্ন যে-মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিতে লাগিল, সে-মূর্ত্তি দেখিলে করুণাময়ী অন্নপূর্ণা দেবীও বুঝি অন্ন-জল ত্যাগ করেন! বড়বাবুর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ক্রমে অস্থতায় দাঁড়াইল, এবং অফিসের ফেরত তিনি গিয়া একদিন সাধিয়া গৃহিণী নন্দরাণীকে গৃহে আনিলেন। ..

নন্দরাণী আসিলেন, কিন্তু মূক যন্ত্রটির মত আর রহিলেন না। আসিয়াই প্রথমে বলিলেন,—আমি এসেচি, কিন্তু একজন ঝী রাখা চাই। বাসন মাজতে আমি পারবো না,—স্পষ্ট কথা! আমার হাতে বাত...

কর্ত্তার মেজাজ ভালো ছিল না; থাকিবার কথা নয়। তিনি বলিলেন,—ঝী! চুরি করে ভুক্তিনাশ করুক্ আর কি! নোংরা, ইল্লুতে কাণ্ড...

গৃহিণী দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন,—নোংরা হবে না—সেদিকে আমি নজর রাখবো।...ঝী রাখতে না পারো, আমায় আবার চলে যেতে হবে, বাসন মাজা জল তোলা আমার দ্বারা এ-শরীরে হবে না!

গৃহিণী অধিক বাক্যব্যয় করিলেন না। বাক্যব্যয় সম্বন্ধে তিনি ইদানীং খুব কুণ্ঠিত ছিলেন,—কাজেই সে-ব্যাপারে সাধনার প্রয়োজন ছিল না।

বড়বাবু দেখিলেন, গৃহিণীর চিত্ত-বৃত্তি যে-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাতে দাসী না আনিলে তাঁকে গৃহে ধরিয়া রাখা দায় ঘটিবে।

অগত্যা দাসী আসিল। দাসী আসার সঙ্গে সঙ্গে বাজার করার ব্যাপারে দু-একদিন ত্রুটি ঘটিতে সুরু হইল। বড়বাবু প্রতিবাদ তুলিতে গেলে গৃহিণী সাফ্ বলিয়া দিলেন,—আমার সংসার চালানোয় যদি খুঁৎ পাও তো নিজে আবার সংসার দ্যাখো। আমার তাহলে এখানে থাকার কোনো প্রয়োজন দেখচি না।

মুখের কথা বুকের মধ্যে পুরিয়া বড়বাবু দৃশ্যান্তরালবর্ত্তী হইলেন।

৪

সেদিন বড়বাবু অফিস হইতে ফিরিবামাত্র গৃহিণী কহিলেন,—তোমার চিঠি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে গোলাপী খামে-আঁটা একখানা চিঠি বড়বাবুর কোলে আসিয়া পড়িল।

খাম দেখিয়া বড়বাবু কহিলেন,—আমার চিঠি? এ যে মেয়ে-হাতের লেখা দেখচি।

গৃহিণী কহিলেন,—খামে তোমারি নাম লেখা...

বড়বাবু দেখিলেন. তা বটে! কিন্তু এ-চিঠি...

গৃহিণী যেন অন্তর্যামিনী! কহিলেন,—তোমার সেই মণিমালা দেবীর চিঠি নয়তো? যাঁর জন্য আমার বনবাস ঘটেছিল?

বনবাস! মণিমালা দেবী!...সেই অতীতের দৃশ্য বড়বাবুর চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল—সেই দিন হইতেই শান্ত গৃহে বিপ্লবের সূত্রপাত!...

তবু মন চন্‌চন্ করিয়া উঠিল! কি কথা এ-খামের মধ্যে? প্রাণের কি গোপন রহস্য?

গৃহিণী স্থির-দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। বড়বাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন, কহিলেন—না, না—আপিসের কোনো ছোক্‌রা হয়তো!...কিম্বা কারো বিয়ের নেমন্তন্ন...

গৃহিণী কহিলেন,—ছোকরার হাতের লেখা অমন হয় না। আর বিয়ের নেমন্তন্ন হলে কোণে 'শুভবিবাহ' কথাগুলো ছাপা থাকতো!...

তা ঠিক! কাজেই বড়বাবু নীরব রহিলেন; এবং গৃহিণী কহিলেন,—আমার সামনে চিঠি পড়তে বুঝি লজ্জা হচ্ছে?...তাই বুঝি সংসার-খরচে সর্ব্বস্বান্ত হবার ভয় প্রতিপদে? এ বয়সেও...ছি!

বড়বাবুর মনের মধ্যে দুটো বিড়াল যেন কলহ বাধাইয়াছিল! কি তীব্র সে কলহের রব! একটা কেবল বলিতেছে, খোলো চিঠি, পড়ো গো···আর একটা তাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিতেছে—খবদ্দার! গিন্নী দাঁড়িয়ে—এখনি কুরুক্ষেত্র ..

বড়বাবু হতভম্ব! গৃহিণী ফশ্ করিয়া খামখানা টানিয়া কহিলেন,—দেখি, কার চিঠি...

দপ্ করিয়া যেমন বিদ্যুৎ চমকিয়া ওঠে, তেমনি খপ্ করিয়াই গৃহিণী খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিলেন। চিঠি পড়িলেন। চিঠিতে লেখা আছে—

প্রিয়তম

তোমার প্রাণের মধু সব কি ফুরাইল, হে আমার মধুসূদন চাটুমণি?···শনিবার বায়োস্কোপ দেখিতে যাওয়ার কথা পাকা তো? দেখো, ভুল না হয়! আর বায়োস্কোপে যাইতে হইলে কি চাই, মনে আছে?···একজোড়া ভালো

জরিদার নাগরা, একটা ব্রুচ, সোনার রিষ্ট-ওয়াচ, আর সেই গুজরাটী শাড়ী। ভুল না হয়!···

কবে আসিবে? আমি যে বিরহ-বেদনায় মরি! পুরানো গৃহিণীর এমন কঠিন বাঁধন যে নিমেষের জন্য গ্রন্থি শিথিল হয় না? আজ আসা চাই। ইতি.

তোমার বুকের মণিমালা

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি বলিয়া সাহিত্যে নাকি একটা কথা আছে! তার চেয়ে জোরালো কিন্তু চলিত গ্রাম্য কথা,—তপ্ত তেলে বেগুন ছাড়িয়া দেওয়া...

চিঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই ঘটিল। গৃহিণী একেবারে আগুনের মত জলিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—বটে! তোমার ভাত রাঁধবার জন্য আমায় নিয়ে এসেচো খোসামোদ করে! আমোদ ওদিকে ধরে না যে! বায়োস্কোপ! তার উপর এই ব্রুচ, শাড়ী, হাত-ঘড়ি! আমার জন্য একটা ঝী রাখতে হলে হাজার বায়নাক্কা ওঠে! এ অপমান আমি কখনো সইবো না—কখনো না। আমি মরি কষ্ট করে, ভাবি,—পয়সা জমাচ্ছে, বুড়ো বয়সে তীর্থ-ধর্ম্ম করবে বলে! তা না, এই রোগে ধরেচে···

বলিতে বলিতে গৃহিণী গিয়া সিন্ধুকটা খুলিয়া ফেলিলেন এবং তার মধ্য হইতে এক তাড়া নোট্ বাহির করিয়া আঁচলে বাঁধিলেন; বাঁধিয়া বড়বাবুর কাছে আসিয়া কহিলেন,—দেখাচ্ছি তোমার মণিমালা দেবীকে বায়োস্কোপ! দেখি, কি দিয়ে তাঁর ব্রুচ্ কেনো!

বড়বাবু যেন পাষাণ...গৌতমের শাপাগ্নিতে সে-যুগে অহল্যা বুঝি এমনি ভাবে পাষাণ হইয়াছিলেন!...আকাশের বাতাস নিমেষে

স্তব্ধ হইল ! চারিধারে অসহ্য গুমট্ !...কিন্তু শুধু অপবাদ নয় তো··· অতগুলা নোট ! গৃহিণী যে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন...নোটগুলার অদৃষ্টে কি যে ঘটিবে !

অপরাধীর মত বড়বাবু কহিলেন,—আমি আর যে-দোষে দোষী হই, ও-চিঠি সম্বন্ধে সত্যি কিছু জানি না !

গৃহিণী কহিলেন,—থাক্ ! বায়োস্কোপ, গহনা, শাড়ী...এ-সবের আব্দার অনেকদিনের মেলামেশা না হলে কেউ করে না !...এই যে আমি...কখনো এমন আব্দার তুলেচি !

বড়বাবু কহিলেন,—চিঠিখানা দেখতে দাও। হয়তো কারো ষড় !

গৃহিণী কহিলেন,—ষড়ই বটে ! সেদিন আমায় দেখে সে-ছোঁড়া চিঠি দিলেই না !...

বড়বাবু কহিলেন,—কিন্তু ঐ বায়োস্কোপ...আমি কখনো যাই সেখানে ?

গৃহিণী কহিলেন,—বাড়ীতে জানিয়ে যাও না, জানি। পাছে আমি যাবার বায়না ধরি !···তাছাড়া এ কার সঙ্গে যাওয়া গো ! এ যে বুকের মণিমালা ! বাস্‌রে,—বইয়েই এমনি-সব কথা পড়ি। জল-জ্যান্ত মানুষ এমন চিঠি লেখে, তা কখনো জানি না !

বড়বাবু হতাশভাবে কহিলেন,—তুমি বুঝচো না ! এর কোথাও মস্ত কিছু গোলযোগ ঘটেচে···

গৃহিণী কহিলেন,—তাতো ঘটেচে . দেখচি...যখন চিঠি আমার সামনে এসে পড়েচে !...তাই বলি, এতদিন বাপের বাড়ী গিয়েছিলুম—বেশ তো চলছিল, কোনো অভাব ঘটেনি ! শেষে নাকি ভাত রেঁধে দেবার দরকার হলো ..

বড়বাবু নিরুপায় নেত্রে চাহিয়া কহিলেন,—ওগো ..

গৃহিণী সনিশ্বাসে কহিলেন,—থাক্, আর আদর কাড়াতে হবে না।

বড়বাবু কহিলেন,—ও নোটগুলো ?

গৃহিণী কহিলেন,—আর যাই করি, তোমার বুকের ঐ মণিমালা দেবীর ব্রুচ্ আর হাত-ঘড়ি কেনায় ব্যয় হবে না—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো।

গৃহিণীর রুদ্ধ কণ্ঠ বহুকাল পরে মুক্ত হইয়াছিল। তিনি বলিয়া বসিলেন,—পয়সায় গিঁট বাঁধচো কার জন্যে...? আরাম সকলেই একটু চায়! মানুষের একটু সঙ্গও! তার কিছু নেই! যেন বনে বাস করচি! কেন? কিসের জন্যে এত সইবো...

এমন অন্তহীন রহস্য যে, তার মধ্যে দিশাহারা বড়বাবু চক্ষু মুদিলেন!

গৃহিণী যে-মূর্ত্তি ধরিয়াছেন, ও-নোট? না, উদ্ধারের কোনো আশা নাই!···

চিঠিখানা ছুড়িয়া বড়বাবুর গায়ে নিক্ষেপ করিয়া গৃহিণী বিদায় লইলেন।

৫

পাঁচ-সাতদিন পরের কথা।

রবিবার। গৃহিণী গিয়াছেন পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে। বড়বাবু উপরের ঘরে একটা চাবি-ভাঙ্গা ড্রয়ার হাতড়াইতেছিলেন, মিউনিসিপ্যালিটি কি একখানা ড্রেণের নোটিশ দিয়াছে. তার সন্ধানে। হঠাৎ হাতে ঠেকিল,—একটা বাণ্ডিল। কাগজে মোড়া। মোড়ক খুলিয়া দেখেন,—দশখানা গোলাপী খাম আর চিঠির কাগজ...সেই সঙ্গে টুকরা চিঠি···

চিঠিখানা তিনি পড়িলেন,—এণার লেখা। এণা লিখিয়াছে...

বারোখানা গোলাপী খাম আর চিঠির কাগজ পাঠাচ্ছি। যে প্ল্যান খাটানো গেছে—মনে আছে তো? ঐটিই হলো মারাত্মক দাওয়াই! সত্যি, অত পয়সা-কড়ি—ছ'খানা গহনা কেনই বা পরবে না? বায়োস্কোপ কেন দেখবে না?···

কি হয়, আমায় জানিয়ো দিদি। এখানে একলা হাতে কাজ পাই না তো! তোমাদের কি হয় জানলে তাই নিয়ে নাহয় একটা ছোট গল্প লিখে ফেলবো। মেয়েমানুষ হাতা-বেড়ি নয়, গরু-ছাগলও নয়! তারো সখ আছে···নয় কি? চিঠির জবাব দিয়ো।

স্নেহের এণা

বটে! এ তবে ষড়...চক্রান্ত! ও!··

বড়বাবু ক্ষণেক গম্ভীর হইয়া রহিলেন, পরে বাণ্ডিলটা লইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া বাহিরের ঘরের তক্তাপোষে শুইয়া পড়িলেন।...

বহুক্ষণ পরে বাড়ীর দ্বারে গাড়ী আসিয়া থামিল। গৃহিণী নামিলেন। গাড়ী চলিয়া গেল পাড়ার আরো মেয়ে সওয়ারী সে-গাড়ীতে ছিল।

বাহিরের ঘরে উঁকি দিয়া গৃহিণী প্রবেশ করিলেন, কহিলেন,—উঠে বসো একবার...

যন্ত্রচালিতের মত বড়বাবু উঠিয়া বসিলেন। গৃহিণী গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিলেন, প্রণামান্তে কহিলেন,—কেমন মানিয়েচে...বল দিকিন্!

বড়বাবু চাহিয়া দেখেন, গৃহিণীর পরণে নূতন গরদের শাড়ী, টক্‌টকে লাল-পাড...

গৃহিণী হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—নতুন কাপড়, নতুন গহনা, গঙ্গাস্নান করে ঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে পরতে হয় কি না···তাই গেছলুম। গাড়ীভাড়া আট আনা পড়েচে, শেয়ারে অবশ্য। তোমার বেশী খরচ করাইনি...

তারপর দুই হাত প্রসারিত করিয়া কহিলেন,—এই নতুন চুড়ি করালুম পাঁচ গাছা করে দশ গাছা। আর এই হাত-ঘড়ি...এণা বড্ড ধরেছিল.. হাল-ফ্যাসানের কিছু না হলে চলে না! তাই। তা, সে টাকা থেকে খরচ হয়েও বেঁচেছে সাঁইত্রিশ টাকা তিন আনা। সে টাকায় একখানা গুজরাটী শাড়ী কিনবো, ভাবচি।

বড়বাবুর দেহে প্রাণ-বায়ু ফিরিয়া আসিতেছিল। তিনি কহিলেন,—সে-চিঠি তুমিই তাহলে লিখেচো.. ?

গৃহিণী কহিলেন,—মন খারাপ হয়ে গেল না কি! নিজের স্ত্রীর চিঠি বলে? পরের স্ত্রী সত্যি-মণিমালার লেখা হলে খুব খুশী হতে—না?

বড়বাবু কহিলেন,—তা নয়। তবে এ ছলনার কি দরকার ছিল?

গৃহিণী কহিলেন,—ছলনা কি রকম?

—নয়? মণিমালা দেবী নাম নেওয়া?

গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন,—ফুলশয্যার রাত্রে আমায় কি বলে ডেকেছিলে, মনে নেই...? আদর করে বলেছিলে, তুমি আমার মণি, মণি, বুকের মণিমালা!—সে-কথা আজো ভুলিনি। কিন্তু আর কখনো ও-নামে ডাকোনি তো!

বড়বাবু আবার স্তম্ভিত—ধন্য স্মৃতি এই নারীজাতির! তাঁর মনেও নাই, কবে প্রথম যৌবনে প্রাণের আবেশে...কিন্তু গৃহিণী? আজো সেটুকু মনে রাখিয়াছেন!

গৃহিণী কহিলেন,—আজ আপিসের ছুটি আছে তো! নতুন দু'চার রকম রান্না রাঁধবো, ঠিক করেচি।...

বড়বাবুর মুখ ঘোরালো; মুখে কথা নাই! গৃহিণী কহিলেন,—রাগ করো না! আমি স্ত্রী। আমার বেশভূষা তোমার তৃপ্তির জন্যেই। তুমি আবার তেমনি হও। পয়সাকেই একমাত্র ধ্যানের বস্তু না করে আমার পানে একটু চাও গো. মন আমার সত্যি আজো মরে যায়নি! বুঝলে!

বড়বাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তাকিয়া টানিয়া তাহাতে হেলান্ দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

অবুঝ প্রেম

লেক-রোডের বুক ফুঁড়িয়া যে নূতন রাস্তা দক্ষিণে লেকের দিকে গিয়াছে, তার ঠিক প্রথম মোড়ের উপর বাঁ-দিকে একখানি দোতলা বাড়ী, পাশে টেনিশ-কোর্ট, সাম্‌নে বাগান,—ও-পথে যাঁরা চলেন, সকলেই বাড়ীখানির তারিফ করেন। এ-বাড়ীর মালিক হিমাংশু চাটুয্যে; পৈতৃক অগাধ টাকার মালিক—তার উপর বি-এ পাশ; বাঙলা সাহিত্যে নামজাদা কবি। পত্নী সুষমা তরুণী, রূপসী এবং শিক্ষিতা। এক কথায়, সব দিক দিয়া হিমাংশু রীতিমত ভাগ্যবান্। জীবনে বাঙালীর যা-কিছু কাম্য, না চাহিতে হিমাংশু তার সবই পাইয়াছে।

এ-পাড়ায় তার আলাপী বন্ধু কেহ নাই। এখানে আসিবার পূর্ব্বে সে থাকিত বাগবাজারের দিকে, এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে। সে বাড়ীতে বন্ধুর ভিড় খুব জমিত। একেবারে উত্তর মেরু ছাড়িয়া দক্ষিণ মেরুতে আসিয়া আস্তানা পাতার ফলে পুরানো বন্ধুদের পক্ষে নিত্য পাড়ি দেওয়ায় বিস্তর অসুবিধা। কারণ, সে বেচারীরা দিন খাটিয়া খায়; এতদূরে আসার পরিশ্রম, পয়সা-খরচ—সকলের সাধ্যে তা কুলায় না। মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ-রক্ষা চলে—উভয় পক্ষ তখন ক্ষুব্ধ মনে অদর্শনের বেদনার কাহিনী পাড়িয়া বসে।

বন্ধুদের মধ্যে অশোক এখনও নিত্য-সহচর। গৃহে তার সম্বল আছে। সংসারে সে একা; বিবাহ করে নাই; তার উপর কবি হিমাংশুর সে মুগ্ধ ভক্ত। তার ভক্তির আতিশয্যে বন্ধুরা তাকে বলিত,

হিমাংশুর ল্যাংবোট! এ-কথায় প্রথমে সে রাগ করিত, প্রতিবাদ তুলিত, কিন্তু ক্রমে এ-উপাধি তার সহিয়া গিয়াছে।

অশোক এখানেই পড়িয়া থাকিত, হিমাংশুকে কাব্য চর্চ্চায় উৎসাহ দিত, সুষমার সঙ্গে বিস্তর তর্ক তুলিয়া তাকে বুঝাইতে চাহিত, হিমাংশুর কবিতা এখন মুকুলিকা, কালে এ-মুকুল বিকশিত হইয়া শোভায়-গন্ধে বাঙলা সাহিত্য-জগৎকে একেবারে—ইত্যাদি

সুষমা মাঝে মাঝে অশোককে বলিত,—বিয়ে করুন অশোক বাবু। আমি তাহলে একটি সঙ্গিনী পাবো।

অশোক হাসিয়া জবাব দিত,—তেমন মেয়ে তো দেখি না!

সুষমা বলিত,—দেখার চেষ্টা চাই। নাহলে ফ্লাওয়ার শো, ডগ্ শোর মত মেয়েদের শোর কোনো ব্যবস্থা নেই যে...

বাধা দিয়া হিমাংশু বলিত,—সময় হলে তিনি আপনি এসে দেখা দেবেন। যেমন আমার বেলায় হলো! তোমার উদ্দেশে কোনো দেব-মন্দিরেও ছুটিনি, কোনো ফুল-বাগিচার ধারেও ঘুরিনি! অথচ...

সুষমা বলিত,—লোকজন আমার খপর এনেছিল, মশাই। আমি কিছু তোমার সামনে আপনা থেকে এসে উদয় হইনি...

হাসিয়া হিমাংশু বলিত,—তা নয় তো কি? চোখ তুলতে আমি দেখলুম, উষার উদয়-সম পূর্ণ প্রস্ফুটিতা

সলজ্জভাবে সুষমা বলিত,—অনবগুন্ঠিতা নয় তা বলে! লোকজন দিয়ে চেষ্টা চলছিল, এ-কথা কাব্যের খাতিরে তুমি না মান্তে পারো, কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করবার অধিকার কারো নেই।...অশোক বাবুর জন্য সে-রকম চেষ্টা চালাবার লোকই দেখচি না..

হিমাংশু কহিল,—

প্রেম কি যাচ্‌লে মেলে ?
সে যে আপনি উদয় হয়
শুভযোগ পেলে !

সুষমা কহিল,—প্রেমের কথা বলচি না। বধূর কথা বলচি।

হিমাংশু কহিল,—তুমি জানো না হে আমার বধু,...অশোকের চিত্ত বড় প্রেম-বিহ্বল। জীবনে একাধিক বার ও প্রেমে পড়েচে, কিন্তু একটা প্রেমও প্রগাঢ় হবার অবকাশ পায়নি...

সুষমা হাসিয়া কহিল,—তাই না কি অশোক বাবু ?

অশোক লজ্জায় মাথা নামাইল। হিমাংশু কহিল,- একটা কাহিনী বলি, শোনো,—আমরা তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। মামীমা এসেছিলেন আমাদের বাড়ী। একদিন, তাঁর ফরমাস হলো তাঁকে এক বস্তা উল কিনে এনে দিতে হবে; তিনি যাচ্ছিলেন পশ্চিমে। সেখানে কিছু কাজ চাই, তাই। বেরুলুম উলের সন্ধানে নিউ মার্কেটে। বন্ধুবর সহযাত্রী হলেন। সেখানে এক দোকানে প্যাটার্ণ মিলিয়ে উলের কাঁড়ি বাচ্‌ছি, এমন সময় পল্লবিনী লতার মত তন্বঙ্গী এক য়ুরোপীয় তরুণী...ঘন নীল দুটি চোখের তারা, এলায়িত বেণী, আর বিম্ব অধরে হাসির অমিয়-ধারা...

বাধা দিয়া সুষমা কহিল,—তুমি তার প্রেমে পড়ে গেলে না কি ?

হিমাংশু কহিল,- আমার কথা তবে বলবো ? গোপন করবো না...হৃদয়ের যে-বৃন্তে প্রেমের ফুল ফোটে, বুঝি, সে-বৃন্তটি একটু দুলেছিল ! বয়সের ধর্ম্ম ! কিন্তু বিদেশিনী দেখে বৃন্তের দোলন থমকে থেমে গেল ! বন্ধুবর কিন্তু প্রেমে জর্জ্জরিত হলেন।

হাসিয়া সুষমা কহিল,—তার পর ?

হিমাংশু কহিল,-- চমক ভাঙ্গতে আমি উল কেনা শেষ করে দাম চুকোলুম—বন্ধুবরের সেদিকে হুঁশ নেই ! আমি গায়ে ঠ্যালা

দিয়ে ওঁকে সচেতন করলুম। বন্ধুবর তখন মানুষের ভেদ-নীতি নিয়ে তর্ক সুরু করে দিলেন। প্রেম যে ও-সব সঙ্কীর্ণ ভেদ-নিষেধ মানে না, তা বোঝাতে উদ্যত হলেন।

সুষমা কহিল,—শেষে হলো কি, বলো?

হিমাংশু কহিল,—দু-তিনদিন ওঁর মন উদাস, হু-হু করতে লাগলো...রবিবাবুর সেই 'চিনি গো চিনি বিদেশিনী'—গানটা মাঝে মাঝে গাইতে লাগলেন! অবশেষে ··

সুষমা কহিল,—ব্যাধি কাটলো?

হিমাংশু কহিল,—কাটলো। কারণ, সহসা উনি জু দেখতে গিয়ে এক তরুণী বঙ্গবালাকে দেখে হৃদয় হারালেন...

হাসিয়া সুষমা কহিল,—তাহলে অশোক বাবু হারা-হৃদয় নিয়েই দিন কাটাচ্ছেন!

হিমাংশু কহিল,—তা ঠিক নয়! পদ্যপাঠে বিদ্যা-ধন সম্বন্ধে পড়া গেছলো,

এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে।
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে॥

অশোকের হৃদয়-ধনটুকু পদ্যপাঠের ঠিক সেই বিদ্যা-ধনের মত! যত দান করে ফেলচে, প্রসারে ততই তা বাড়চে...

মুখ-চোখ লজ্জায় রাঙা করিয়া অশোক কহিল,—আঃ থামো হিমাংশু! You are growing vulgar...

সুষমা কহিল,—না, সত্যি অশোক বাবু, আমি ব্যাপার বুঝেচি। আপনি একা থাকেন, নিঃসঙ্গ জীবন,...তাই মনের শূন্যতায় আপনি এমন বিচলিত হন।

হিমাংশু কহিল,—ঐ হৃদয় নিয়ে ওর অবস্থা এখন হয়েচে ঠিক সেই রকম...দিতে চাই, নিতে নাই কেহ!

সুষমা কহিল,—আমি উপায় দেখছি, অশোক বাবু। আমার সঙ্গিনী সখীটিকে আমিই সংগ্রহ করে আপনার হৃদয়-দ্বারের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবো।

অশোকের বুক দুলিয়া উঠিল। সঙ্কোচ না রাখিয়া দীপ্ত নেত্রে সুষমার পানে সে চাহিল—চাহিতে দেখিল, সুষমার দুই চোখ দরদে মায়ায় ভরিয়া অপূর্ব্ব দীপ্তিতে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে! সে আবার মাথা নামাইল।

হিমাংশু কহিল,—ও-কথা যাক্‌। তাহলে অশোক, কবিতাটা তুমি 'কণিকা' মাসিকেই পাঠাবার মত করচো...তারা ভারী তাগাদা করচে।

অশোক কহিল,—দিতে পারো। 'কণিকা' কাগজখানা ভদ্র-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেচে।

এমনি হাসি, কলরব আর আনন্দের মধ্য দিয়া তিন জনের দিন কাটিতেছিল বেশ নিশ্চিন্ত আরামে।

২

সেদিন রবিবার। বাগবাজারের দু'চারজন বন্ধু আসিয়া জমিয়াছিল।

নেপাল কহিল,—তোমার পুকুরে আজ সাঁতার কাটবো, ভাই...

দধি কহিল,—আমি সাঁতার জানি না...

বরেন কহিল,—তুই ঐ ছোট ক্যান্‌ভাস্‌ বোটটায় চড়ে এ-পার ও-পার করিস্‌।

হিমাংশু কহিল,—আমি সাঁতারে রাজী। সত্যি, অনেক দিন জল-ক্রীড়া হয়নি!

নেপাল কহিল,—কেন, সুষমা দেবীও তো সাঁতার শিখেচেন...

হিমাংশু কহিল,—তা শিখেচেন। যতদিন শিক্ষা-নবীশী করেচেন ততদিন দৌরাত্ম্যের অন্ত ছিল না, আমাকেও রোজ দুপুরে নামতে হতো। ঐ কাপড়ের wingsগুলো, আর টায়ারের টিউব—এ দুয়ের সাহায্যে খাশা শিখেচেন।

অশোক কহিল,—এবং কত শীগগির! বোধ হয় দিন পনেরোও লাগেনি।

দধি কহিল,—তুমিও সাঁতার কাটতে চলেছো না কি?

হিমাংশু কহিল,—নিশ্চয়।

অশোক কহিল,—বেশ!...

কয়জনে জলে নামিল। অশোক নামিতে যাইতেছিল, এমন সময় সুষমা আসিয়া কহিল, বাঃ, আপনাদের বুঝি এই মতলব চল্‌ছিল এতক্ষণ

অশোক কহিল,—কেন, বলুন তো?

সুষমা কহিল,—আমার একটা প্ল্যান্ ছিল...

অশোক কহিল,—কি প্ল্যান?

সুষমা কহিল,—সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে সেই ডায়মণ্ড হারবারে মোটর-ট্রিপ্...

অশোক কহিল,—চমৎকার হতো···আঃ! দেখুন তো এদের সখ—ছেলেমানুষীর চূড়ান্ত!...

জলগর্ভ হইতে বরেন ডাকিল,—অশোক যে রয়ে গেলে! নামবে না?

বোট হইতে দধি কহিল,—আমার সঙ্গেও আসা হলো না! ও, বৌদির রান্নাবান্না কেমন হলো, তার স্বাদ গ্রহণ করচো, বুঝি!

অশেকে কহিল,—না হে, না। বলিয়া সে উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল,—হিমাংশু...

হিমাংশু তখন সাঁৎরাইয়া ওপারে গিয়াছে—তার ডাক শুনিতে পাইল না।

নেপাল ডাকিল,—এসো অশোক...

অশোক কহিল,—আমি ওদের বল্‌চি গিয়ে...

সুষমা কহিল,—আচ্ছা। দেখবেন, আমাব প্ল্যান যেন না মাটি হয়!

অশোক জলে নামিল,—একটা, দুটা সিঁড়ি তারপরই শাওলা জমিয়া সিঁড়ি এমন পিছল যে, পা হড়কাইয়া অশোক দুম্ করিয়া পড়িয়া গেল। মাথা ঠুকিল একটা সিঁড়িতে এবং নিমেষে বিশ্রী বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিল!

ওদিকে জলের বুকে বন্ধুর দলে বিরাট অট্টহাস্য এদিকে মাথার আঘাতে বেদনায় কাতর অশোক...

সে উচ্চহাস্যে সুষমা রাগিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তার আগে

দ্রুত আসিয়া সে অশোকের হাত ধরিয়া কহিল—বড্ড লেগেচে? আমি মালীকে ডাকি...

সুষমা মালীকে ডাকিল। মালী আসিল; বয় আসিল। দুজনে ধরিয়া অশোককে তুলিল। তার পা মচ্‌কাইয়া গিয়াছে—নিজে হইতে উঠিবার সাধ্য ছিল না।

ধরাধরি করিয়া অশোককে পুকুরের চাতালে আনা হইল। অশোক একে অপ্রতিভ, তায় বেদনা...সে যেন বাঁচিয়া নাই, এমনি নিরুপায়-ভাবে চক্ষু মুদিল।...

সুষমা কহিল,—অশোক বাবুকে তুলে ঘরে নিয়ে যা...আর বাবুকে খপর দে। শীগ্‌গিব আসতে বল্—চোট সামান্য নয়। আমি শুক্‌নো

কাপড় আর তোয়ালে পাঠিয়ে দি...সেই সঙ্গে ডাক্তার বাবুকে টেলিফোন্ করি...

সুষমা দ্রুত চলিয়া গেল। বিমূঢ়ের মত অশোক বসিয়া দেখিল,—যেন চকিত চপলা! চোখে বহ্নি-রেখা. অথচ ও-দীপ্তিতে দুনিয়ার সব অন্ধকার কোথায় উবিয়া যায়! অপরূপ!...

চেতনা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে অশোক নিজের পা দুইটাকে জোর করিয়া ঠেলিয়া ধরিল—তার পর মালীর হাতে ভর দিয়া কোনোমতে উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—পা ভাঙ্গেনি...

বয় কহিল,—মাথায় রক্ত, বাবু

অশোক কহিল,—কল-ঘরে গিয়ে ধুয়ে ফেলি...

বেশভূষা সারিয়া অশোক আসিয়া ড্রইং-রুমের একটা সোফায় বসিল। সুষমা আসিয়া মাথার কাটা ঘায়ে আইডিন দিয়া পটী আঁটিয়া দিল। দাসী একখানা শাড়ী আনিয়া দিলে ফ্যাশ করিয়া ছিঁড়িয়া তাই দিয়া অশোকের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া সুষমা কহিল,—পায়ে কিছু ফুটে যায়নি?

অশোক কহিল,—না।...

সুষমা কহিল,—ডাক্তারকে টেলিফোন করেচি, ননীবাবুকে··· এখনি তিনি আসবেন। তিনি এসে যা হয় বিহিত করুন, আপনি মোদ্দা নড়বেন না। আপনার খাবার এইখানে ছোট টেবিল পেতে দেবার ব্যবস্থা করেচি। কিন্তু তার আগে...এঁদের ওঠার নাম নেই! বাঃ! আশ্চর্য্য লোক সব···দেখি একবার...

সুষমা আবার চলিয়া গেল। ..মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া অশোক দেখিল, কি সহজ সচ্ছন্দ, লঘু ভঙ্গী! আলাপে, হাস্যকৌতুকে যেমন অকুণ্ঠ, সেবায়, মায়া-মমতায় তেমনি অচপল! অপরূপ! ..সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।...

হিমাংশু আসিয়া কহিল,—ভালো বীর বটে। পুকুরে নামতে আছাড় খায়!

বরেন কহিল,—এতে যে হাসি আপনি আসে।

নেপাল কহিল,—বৌদি অনর্থক রাগ করলেন। একটা জোয়ান মদ্দ..

দধি কহিল,—ছি!...

এই পঞ্চবাণে জর্জ্জরিত হইয়া অশোক আবার চক্ষু মুদিল। কঠিন ধরণী!

সুষমা আসিয়া কহিল,—ননীবাবুকে টেলিফোন করেচি। তিনি এখনি আসবেন···

সুষমাকে কাছে পাইয়া অশোকের কথা ফুটিল। সে কহিল,—আপনার প্ল্যানের কথাটা বলুন। এঁরা তো হাজির..

সুষমা কহিল,—থাক্! আপনিই সব ভেস্তে দিলেন···

চেষ্টা করিয়া হাসিয়া অশোক কহিল,—না হলে এঁরা কি এত শীগ্‌গির উঠতেন.

হিমাংশু কহিল,—কিসের প্ল্যান গা?

সুষমা কহিল,—সে থাক···

অশোক কহিল,—মোটরে ডায়মণ্ড-হারবার যাওয়া এবং সেইখানে আহারাদি করা...

বরেন কহিল,—বেশ তো!

সুষমা কহিল,—অশোক বাবুর এই চোট্...

দধি কহিল,—ও কিছু নয়। দেখি হে...মাথায় পটী বেঁধেচো, ওঃ, একেবারে সেকন্দর লোদি হয়ে বসে আছো যেন!

মৃদু হাসিয়া অশোক কহিল,—বৌদির নার্শিং···

হিমাংশু সুষমার দিকে চাহিয়া কহিল,—তুমি ওরে করেচো সম্রাট্!…সেকন্দর লোদির এ পাগড়ী ওই শ্রীহস্তের দান!—

নেপাল কহিল,—Br.vo!…

৩

সাত-আট দিন পরের কথা। বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। সুষমা আসিয়া কহিল,—হ্যাগা, অশোক বাবুর খবর কি, বলো তো?

হিমাংশু তার কবিতার প্রুফ দেখিতেছিল। প্রুফের কাগজ হইতে চোখ না তুলিয়াই কহিল,—কেন?

সুষমা কহিল,—পুকুর-ঘাটে পড়ে মাথা কেটে সে-রাত্রে সকলের সঙ্গে সেই চলে গেলেন, তার পর আর এদিক মাড়ানমি! একটা খপর পর্য্যন্ত দেওয়া নয়…এমন তো কখনো ঘটেনি! আছেন বা কেমন!…

প্রুফে ওদিকে 'অনুমানকে' প্রেসের লোকে 'হনুমান' বানাইয়াছে দেখিয়া হিমাংশু ক্ষেপিয়া উঠিবার মত হইয়াছে! সে শুধু কহিল,—হুঁ!

সুষমা কহিল,—তোমার প্রুফ রাখো তো। কথা বল্‌তে এলুম, না, উনি ছারপোকা মার্‌তে ব্যস্ত! দেবো এখনি কাগজ ছিঁড়ে।

বলিয়াই সে প্রুফের কাগজ কাড়িয়া লইল।

হিমাংশু একেবারে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল,—ছিঁড়ে যাবে, ছিঁড়ে যাবে।

সুষমা কহিল,—ছিঁড়ে যাবে কি! ছিঁড়ে দেবো! বললুম না।

সুষমাকে হিমাংশু জানে। তার যে কথা, সেই কাজ! হিমাংশু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বসিল। কহিল—কি কথা বলবে বলছিলে, বলো!

সুষমা কহিল,—কি বলছিলুম, তা কাণে যায়নি, বুঝি?

হিমাংশু কহিল,—বিলক্ষণ গেছে। অশোকের কথা তো?

সুষমা কহিল,—হ্যাঁ। ক'দিন তাঁর খপর নেই...তোমার বাড়ীতে এসে অত-বড় চোট লাগলো...

হিমাংশু কহিল,—আমায় কি করতে বলো ?

সুষমা কহিল,—ভদ্রতা করে খপরটা অন্ততঃ একবার নাও।

হিমাংশু কহিল,—বেশ, আজই তার কাছে যাবো। প্রুফটা তাহলে...

সুষমা কহিল,—দিচ্ছি। কিন্তু কথা রেখো- কাব্য-কলার চর্চ্চায় ভুলে যেয়ো না! হিমাংশু জবাব দিল,—না গো, না। তুমি না হয় সঙ্গে চলো.

সুষমা কহিল,—আমার আজ যাবার উপায় নেই। শশীবাবুর বাড়ীর মেয়েরা আজ সন্ধ্যার সময় আসবেন, তাঁদের কি নারী-সমিতি হয়েচে, আমায় তাতে যোগ দিতে বলচেন ..

হিমাংশু কহিল,—বেশ, তুমি তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় নিযুক্ত থেকো, আমি সেই অবসরে অশোকেব কাছে ঘুরে আসবো ..

রাত্রে হিমাংশু আসিয়া সংবাদ দিল—অশোকের কি হয়েচে, বুঝলুম না.. ভালো করে কথা কইলে না...ফ্যাল্‌ফেলে দৃষ্টি, যেন মস্ত অপরাধ করে গেছে সেদিন আছাড় খেয়ে! তোমার নাম করে তাকে আসতে বললুম। আমার পানে শুধু চেয়ে রইলো···তার পর বললে, আর যেতে বলো না ভাই হিমাংশু, আমায় মাপ করো...

সুষমা কহিল,—কেমন আছেন ?

হিমাংশু কহিল,—শরীর ভালোই দেখলুম...

সুষমা কহিল,—মাথার সে চোট ?

হিমাংশু কহিল,—ব্যাণ্ডেজ নেই। দেখলুম, মাথার ছড়া ঘা শুকিয়ে গেছে।

সুষমা বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে কহিল,—তবে ?

হিমাংশু কহিল,—বোধ হয়, অভিমানে !... ওরা সেই হেসেছিল...

সুষমা কহিল,—ওরা হাসুক। তুমি সে-হাসিতে যোগ দিয়েছিলে, তাই।

হিমাংশু কহিল,—কে জানে, ঠিক বুঝলুম না ! আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন যাবে না ? সে তার জবাব দিলে না, চুপ করে রইলো।

সুষমা ব্যথিত হইল। বেচারা ! তাকে লইয়া আর পাঁচজনে যে-রকম করে ! যেন সে...

সুষমা কহিল,—চলো, কাল দুজনেই যাই।

হিমাংশু কহিল,—আমিও তাই ভাবছিলুম। বিকেলের দিকে—কেমন ?

ঘাড় নাড়িয়া সুষমা জানাইল, আচ্ছা।..

পরের দিন সকালে হিমাংশু এক চিঠি পাইল,—চিঠি অশোক লিখিয়াছে। চিঠি পড়িয়া হিমাংশু শিহরিয়া উঠিল।..

সুষমা কাছে বসিয়া একটা টেবল-ঢাকায় ফুল তুলিতেছিল। সে কহিল,—চমকালে যে ! কার চিঠি ?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হিমাংশু কহিল,—অশোকের...

সুষমা কহিল,—কি খপর ?

হিমাংশু কহিল,—গাধা ! নিরেট গাধা ! বেদম গাধা ! হতভাগা কি লিখেচে, পড়ে ভ্যাখো...

সুষমা চিঠি লইয়া পড়িল। চিঠিতে লেখা আছে...

—ভাই হিমাংশু

আমি তোমার গৃহে যাওয়ার অযোগ্য। আমি কত বড় শয়তান, তা তুমি জানো না।

আমি বৌদিকে ভালোবাসিয়াছি। এ সে খেয়ালী প্রেম নয়। ক'দিন নিজের সঙ্গে বিস্তর বোঝাপড়া করিয়াছি। কিন্তু এ ভালোবাসা মুছিবার নয়—ঘুচিবার নয়। শয়নে-স্বপনে আমার ঐ এক চিন্তা. পাগল হইব, জানি। এ আমার মস্ত অপরাধ, তাও জানি; কিন্তু এ সত্য, এবং এ আমার গৌরব—সে-কথাও অস্বীকার করিতে পারি না, বন্ধু।

আমায় ক্ষমা করিয়ো। আমার মন এ-চিন্তায় বিভোর। এ চিন্তা আমার স্বপ্ন, আমার স্বর্গ।

অশোক।--

সুষমার মুখ নিমেষে পাণ্ডু বিবর্ণ হইয়া গেল। বুকের ভিতর কে যেন সহসা কশাঘাত করিয়াছে, এমনি ভাব! পা টলিল। সুষমা স্বামীর পাশে বসিয়া পড়িল।

হিমাংশু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—বেচারা!

সাম্নে বাগান—রৌদ্র-কিরণে ঝলমল করিতেছিল। হিমাংশুর মনে হইল, ও যেন রঙ্গমঞ্চের আঁকা দৃশ্যপট, ও রৌদ্র-কিরণ কৃত্রিম!

সুষমা একটা নিশ্বাস চাপিয়া কহিল.---এ কি ভয়ঙ্কর কথা। ছি! পাগলও এমন চিঠি লিখতে পারে না।

সুষমা হিমাংশুর গা ঘেঁষিয়া বসিল, তার কাঁধে মাথা রাখিয়া উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল।

হিমাংশু তার পানে চাহিল. ডাকিল,—সু...স্নেহ-ভরা বড় কোমল ডাক।

সুষমার দুই চোখে কোথা হইতে জল আসিয়া জমিল। স্বামীর পানে চাহিতে সে-জল আর বাধা মানিল না, গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

হিমাংশু কহিল, -তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না ?

সুষমা কহিল,—না।

হিমাংশু কহিল,—আমি বিশ্বাস করি। কারণ, আমি যে তাকে ভালো করে চিনি। ভালোব প্রতি অশোকের ভক্তি-ভালোবাসার সীমা থাকে না! তোমার মত ভালো সে কাকেও দেখেনি, সু...

দুই হাতে স্বামীর মুখ চাপিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে সুষমা কহিল,—থামো, থামো গো! তুমিও অমন পাপ-কথা মুখে উচ্চারণ করো না। লজ্জায় ঘৃণায় আমার মনে যা হচ্ছে···

সুষমার কপোলে মৃদু করাঘাত করিয়া হিমাংশু কহিল,—ভালোবাসা পাপ নয়, সু .

—আবার তুমি! সুষমা কাঁদিয়া স্বামীর বুকে মুখ ঢাকিল।

হিমাংশু কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে রৌদ্র-কিরণ যেন মেঘের স্পর্শে ম্লান হইয়া আসিতেছে...বাহিরে জীবনের ঐ কলরব যেন কোন্ স্বপ্নলোক হইতে ভাসিয়া আসে! সে ডাকিল—সু···

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুষমা কহিল,--তুমি ছাড়া অমন কথা আমায় বলবার কারো অধিকার নেই বলিতে বলিতে রাগে সে জলিয়া উঠিল, রূঢ় স্বরে কহিল,—তোমাব বন্ধু বলেই শুধু . কিন্তু ছি...আমারো খুব শিক্ষা হয়েচে।

হিমাংশু কহিল,—কি বলচো তুমি সু...! তাকে ত্যাগ করবো আমরা···? বেচাবা! দুনিয়ায় যে তার আব কেউ নেই। তার আশ্রয় বলো, আত্মীয় বলো ..

সুষমা কোনো কথা কহিল না। হিমাংশু কহিল,—তার সঙ্গে আজই আমি দেখা করবো। এ-আঘাতে সে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েচে। কি করবে, তাও বুঝি না। ..

সুষমা কহিল,—কি করবে ?

হিমাংশু কহিল,—জানি না। তবে একটা কথা জানি··

সুষমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিল।

হিমাংশু কহিল,—তার নৈরাশ্যে দরদ জানাবো–জানিয়ে তার রুচিকে অভিনন্দিত করবো। তোমায় ভালো না বেসে কেউ থাকতে পারে, কখনো ?. .

দুই চোখে দৃপ্ত রোষ ভরিয়া সুষমা স্বামীর পানে চাহিল।

হাসিয়া হিমাংশু কহিল,—তবে ভাবনার কারণ নেই যেহেতু আরো বহুবার সে প্রেম-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েচে এবং সে ব্যাধি থেকে অতি অনায়াসে মুক্তিও পেয়েচে...

সুষমা কহিল,—কিন্তু সে-সব তো তিনি বলেন, নেহাৎ চোখের নেশা...

হিমাংশু কহিল,– তাই হোক্! তবে আমার বিশ্বাস···

সুষমার চোখে আবার সপ্রশ্ন দৃষ্টি !

হিমাংশু কহিল,—এ নেহাৎ চোখের নেশাই··

বাহিরে দুড়ুম করিয়া শব্দ ··সুষমা চমকিয়া উঠিল। হিমাংশু কহিল,—কার গাড়ীর টায়ার ফাটলো, বুঝি ! ·

দোতলায় খোলা খড়খড়ির ধারে দাঁড়াইয়া সুষমা পথের পানে চাহিয়া ছিল। বাহিরে মেঘের আবরণ ভেদ করিয়া রৌদ্র-কিরণ আবার দুলিয়া দেখা দিয়াছে। পাখীর কণ্ঠে আবার সুর ছুটিয়াছে, ফুলের সভায় অলির গুঞ্জন জাগিতেছে। সুষমার মনে হইতেছিল, দুনিয়ায় জীবনের কি এ প্রাচুর্য্য, কি বৈচিত্র্য। তবু মানুষ কোথা হইতে দুঃখ-বেদনা বহিয়া আনিয়া জীবনকে এমন পরিম্লান করিয়া তোলে ! .

অশোকের কথা মনে হইল। বেচারী! কি বলিয়া সে এমন কাজ করিয়া বসিল? সুষমা তার বন্ধুপত্নী…তাকেই ভালোবাসিয়া…

ভালো নাহয় বাসিয়াছে,— তা বলিয়া সে-কথা অমন করিয়া বলে? ছি! লজ্জার তার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। ইহার পর কি বলিয়া সে আর অশোকের সামনে…!

আজ দুদিন নাহয় নিজেকে জোর করিয়া এ-পথ হইতে দূরে রাখিয়াছে—কিন্তু স্বামীর প্রতি তাঁর যে নিবিড় স্নেহ, অনুরাগ…দীর্ঘ জীবনে কখনো কি আর দেখা হইবে না? যেদিন দেখা হইবে, সেদিন…

লজ্জা-সঙ্কোচ ঠেলিয়া তার প্রাণের কোণে একটু ব্যথা, একটু বেদনাও জাগিল। এই হাসি-খুশী-প্রমোদের মেলায় সহসা এ কি সুর আজ…

তবু দরদ হয়! স্বামী বলিলেন,—তোমায় ভালো না বাসিয়া থাকিতে পারে না যে! সে তাহা হইলে এমন

গৌরবে মন ভরিয়া উঠিল। মনের গোপন তলে একটু পুলকও অমনি…

সুষমা অস্থির হইয়া পড়িল—কাণের কাছে ঐ সুর—'ভালো-বাসি! ভালোবাসি'! সে সুরে অগ্নির দাহ, তবু কেমন আরামও…

এ-দায়ে বাঁচিবার জন্য সুষমা গিয়া রান্নাঘরে বসিল, পাচককে কহিল,—তুমি ওঠো ঠাকুর। এটা কি? কালিয়া? সরো, আমি রাঁধি…

হায়রে, তবু কাণের কাছে সে-সুরের রেশ আর থামিতে চায় না! সুষমা ভাবিল, সে বুঝি পাগল হইবে!…

ওদিকে হিমাংশু গিয়া অশোককে পাকড়াইয়া বসিল, কহিল, এ কি করেচো, ষ্টুপিড!

শুষ্ক মুখে অশোক কহিল,—হুঁ...

হিমাংশু কহিল,—কথাটা গোপন রাখতে পারলে না? চিঠিতে লেখবার কি প্রয়োজন ছিল? আমাকে নাহয় চুপি চুপি বলতে!

অশোক কহিল,—কেন?

হিমাংশু কহিল,—কেন নয়! তোমায় আমি চিনি, অশোক, এ প্রেম কোনো অকল্যাণের সৃষ্টি করবে না, তাও জানি। তোমার মনে নীরবে ফুটে নীরবেই

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অশোক আবার শুধু কহিল,—হুঁ!

হিমাংশু কহিল,—স্থ সে চিঠি পড়েচে আর জানো, এ-চিঠি পড়ে সে কি বলেচে?

অশোক হিমাংশুর পানে চাহিয়া রহিল। হিমাংশু কহিল,—এ চিঠি পাঠানোর উদ্দেশ্য? বিশেষ যখন জানো, এ প্রেম চিরকাল এক-তরফা ..

শুষ্ক হাসি হাসিয়া অশোক কহিল,—কৌতুক···

হিমাংশু কহিল,—কৌতুক! একে কৌতুক বলে? আমার স্ত্রীকে তুমি ভালোবাসবে, আর সে-খপর আমায় দিয়ে কৌতুক করবে!

হিমাংশু স্থির দৃষ্টিতে অশোকের পানে চাহিল। সে-দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া অশোক কহিল,—ব্যাপারটাকে তুমি এত serious করে দেখেচো?

—Serious করে দেখেচি! কেন দেখবো না, বলতে পারো? আমি তো জানি, স্থ-র মত নারীর প্রেম ..

বাধা দিয়া অশোক কহিল,—অন্যায়, অন্যায়, খুব অন্যায় কাজ হয়েচে। আমি ভেবেছিলুম, ব্যাপারটাকে তোমার স্ত্রী অকৃত্রিম পরিহাস বলে উড়িয়ে দেবেন...

হিমাংশু হাসিল, কহিল,—তুমি পাগল...! এ পরিহাসের অর্থ বোঝো না!

অবাক্ হইয়া অশোক হিমাংশুর পানে চাহিল।

হিমাংশু কহিল,—সু...নারী। নারীর মনে ও-কথায় অনেকখানি বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়! ভালোবাসা কে না চায়? নারী পুরুষ দু'জাতিই। তবে নারীর মন ভালোবাসায় যতখানি বিচলিত হয়, বিগলিত হয়, পুরুষের মন তেমন হয় না। কারণ, আরো নানা দিকে তার ব্যাপ্তি। এর পর সু তোমার সঙ্গে কথা কইতে গেলে, তার মন কখনো কি সেই চিঠির কথা ভেবে...

অশোকের মুখে লজ্জার রক্তিম আভা ফুটিল। অশোক কহিল,—তুমি থামো। আমি অপরাধ করেচি, অন্যায় করেচি,...তোমাদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে কি দুঃখে, কি গ্লানিতে আমার দিন কাটচে···

হিমাংশু কহিল,—চলো, আজই চলো আমার ওখানে। সু-কে বেশ হাসি-মুখে সহজ ভাষায় বলবে চলো, সে চিঠিখানা পরিহাস মাত্র!

অশোক কহিল,—আজ থাক্, কাল যাবো ..

—নিশ্চয়?

—নিশ্চয়।···

সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। হিমাংশু গৃহে ফিরিল। ঘরে আলো নাই,—সুষমা চুপ করিয়া খড়খড়ির ধারে দাড়াইয়া...

হিমাংশু ডাকিল—সু...

সুষমা কহিল,—কি? ..তার স্বর গাঢ়।

হিমাংশু কহিল,—কাল সে আসবে। সে বললে, শুধু একটু পরিহাস করেই সে-কথা চিঠিতে লিখেছিল।···গাধা...পরিহাসের মাত্রা বোঝে না।

সুষমার সমস্ত শরীর-মন কাঁদিয়া উঠিল—পরিহাস! অত বড় কথা—সে পরিহাস! হায়, নারীর মন এমন তুচ্ছ, নারী এমন হেয় জীব যে তাকে লইয়া অত বড় আয়োজনে পরিহাস করা...

হিমাংশু কহিল,—কি ভাবচো?

সুষমা কহিল,—কিছু না।

—তবে এমন ..

সুষমা কহিল,—শরীরটা বড় খারাপ। ভারী মাথা ধরেচে···বোধ হয়, জ্বর হবে।

সবলে সুষমাকে বুকে টানিয়া তার মুখে-গায়ে হাত দিয়া হিমাংশু কহিল,—কৈ, গা তো গরম দেখচি না...

সুষমা কহিল,—তা নয়। মাথা কিন্তু খসে যাচ্ছে!

কথাটা বলিয়া সুষমা সোফার উপর গিয়া বসিল।

হিমাংশু কহিল,—কিন্তু তুমি ভাবচো, তাকে আমি সহজে ক্ষমা করবো ?

ক্ষীণ কণ্ঠে সুষমা কহিল,—ঐ তামাসার জন্য ..?

তার মুখে আর কথা ফুটিল না। বাহিরে জ্যোৎস্নার আলোর উপর কে যে মোটা কালো রেখা টানিয়া দিতেছিল! সুষমা চক্ষু মুদিল। মনের মধ্যে হুঙ্কার দিয়া কে কহিল, তার ভালোবাসা ক্ষমা করতে পারতুম ..তার দুর্ব্বলতা, তার দুরাশা, তার সব অপরাধ। কিন্তু পরিহাস! নারীর চিত্ত নিয়ে এই তুচ্ছ আমোদ, এই খেলা...

কিন্তু এ সত্যই পরিহাস? না, না···এ শুধু স্বামীকে ভুলাইবার প্রয়াস···অশোকের ছলনা...প্রকাণ্ড ছলনা! নহিলে জগতে তামাসার বস্তুর অভাব ছিল না! এ...

...তাই, তাই,—প্রকাণ্ড সত্যকে মিথ্যার পোষাক পরানো··· ছলনা, বিরাট ছলনা! অশোককে তো সুষমা জানে।···

পরের দিন অশোক আসিয়া দেখা দিল। তার হাতে এক-রাশ ফুল।

হিমাংশু কহিল,—ফুলের অর্থ?

হাসিয়া অশোক কহিল,—ফুল। Fool ফুল বয়ে এসেচে...

হিমাংশু কহিল,—ও-কথা থাক্...

সুষমা আসিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল,—এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবেন তো অশোকবাবু?

—নিশ্চয়।...

অশোকের স্বর বেশ সহজ। সুষমা তা লক্ষ্য করিল। তবে সে পরিহাসই···

সুষমা সেখানে দাঁড়াইল না।·

অশোক কহিল,—আজ ভাই সাঁতার কাটবো···

হিমাংশু কহিল,—আবার! সে পতন মনে নেই?

অশোক কহিল,—আজ আর পতন নয়।

পুকুরে সাঁতার দিতে গিয়া অশোক দেখিল, সুষমা আসিয়া চাতালে দাঁড়ায় নাই। পূর্ব্বে আরো দু'চারবার সাঁতার চলিয়াছে, সুষমাও বরাবর ঐ চাতালে···

আহারের সময় অশোক কহিল,—বৌদি খাবেন না?

সুষমা গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—পরে।

—হঠাৎ এ ব্যবস্থা?

এটুকু বলিবামাত্র মনে হইল, এ-ব্যবস্থার কারণ তার সেই চিঠি। তবু— না, এ-ভাব ঠিক নয়! তার প্রাণে বড় বাজিতেছে!

অশোক কহিল,—অন্যায় হলো, বৌদি...

সুষমা কহিল,—অন্যায়ের পালাই জগতে সত্য। সুষমার কণ্ঠস্বর আগেকার মত নয়...

আহারাদি চুকিবার পর হিমাংশু অশোককে লইয়া পড়িল,—পাচটা কবিতা নূতন লেখা হইয়াছে; ছোট একটা নাটিকাও সে ধরিয়াছে। অতএব...

বেলা প্রায় চারিটা বাজে, কাব্য-চর্চ্চা থামিল। অশোক উঠিল।

হিমাংশু কহিল, -তোমার চিঠির ফল দেখচো সু এদিক মাড়ালে না।

অশোক কহিল,—আমার ক্ষমা চাওয়া হয়নি, না?

হিমাংশু কহিল,—থাক্‌...সেটা বাহুল্য হবে।

অশোক শুনিল না; ডাকিল,—বৌদি!

কোথায় বৌদি? ঘরে কেহ নাই!...ঐ যে .

একটা বকুল গাছ। তার তলায় পাথরের বেদী...ঝরা বকুলে চারিদিক ছাইয়া আছে। বেদীর উপর বসিয়া নিবিষ্ট মনে সুষমা কার্পেটের আসন বুনিতেছিল।

অশোক আসিয়া ডাকিল,—বৌদি...

সুষমা চমকিয়া উঠিল, কহিল,—ওঃ, আপনি! আবার সে বোনার কাজে মন দিল।

অশোক কহিল,—একটা কথা ছিল...

—কি?

—আমার মূঢ়তা ক্ষমা করবেন বৌদি। একটা কৌতুক...

সুষমা ঝাঁজিয়া উঠিল, কহিল,—জানি, জানি,—নারীকে এমন অবজ্ঞা করবার অধিকার পুরুষের যুগ-যুগ ধরে চলে আসচে! এমন বিশুদ্ধ কৌতুকের পাত্রী দুনিয়ায় আর কোথাও মিলবে না...

অশোক বিস্ময়ে বিমূঢ়! সুষমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,— আপনাদের চায়ের সময় হয়েচে। চলুন...

অশোক একেবারে সুষমার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল, কহিল,— আমায় ক্ষমা করবেন কি না, আগে বলুন .

সুষমা দু'পা পিছনে হঠিয়া গেল, গিয়া কহিল,—এতে অপরাধ কি হলো যে ক্ষমা চাইছেন! কৌতুকে অপরাধ হতে পারে না..

অশোক কহিল,—ক্ষমার এমন অযোগ্য আমি ? জানেন তো, আমি চিরদিন অবুঝ··· আমার বুদ্ধির বড় অভাব...আপনি যদি ক্ষমা না করেন সত্যি বৌদি নিজের অপরাধের ভারে আমি এমন কাতর যে সে-পাপ করবার পরক্ষণেই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও করেচি।

সুষমা বেশ সতেজ ভঙ্গীতেই কহিল,—কি সে প্রায়শ্চিত্ত ?

সে-ভঙ্গী অশোক লক্ষ্য করিল,—মহিমময়ী নারী! যুগ-যুগের রাজেন্দ্রাণী মূর্ত্তি! এ-মূর্ত্তির পায়ে মাথা আপনি নত হয়!...

সে কহিল,—খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে নাজিরাবাদের নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারী চাকরি পাবার দরখাস্ত পাঠিয়েচি।

হিমাংশু দূর হইতে ডাকিল,—অশোক···ঐ যে! বাঃ, তোমার ওখানে...

হিমাংশু কাছে আসিল, আসিয়া কহিল,- এ কি পদ-তলে···কি হে, কি নিবেদন চলেছে - এও কৌতুক···?

সুষমা তাড়াতাড়ি বলিল,—অশোকবাবু নাজিরাবাদে যাচ্ছেন চাকরি করতে।

হিমাংশু কহিল,—তার আগে ওর হৃদয়ের ঐ খালি জায়গাটুকু ভরাট করে দিতে চাই। না হলে সেখানে যদি কোনো আশমানতারা কি জিন্নৎ বেগমকে ভালোবেসে ফেলে...

স্থষমা কহিল,—ভালো কথা, মাসিমা কাল চিঠি লিখেচেন, তাঁর ভাশুর-ঝী বীণা ডাগর হয়ে উঠেচে,—তার একটি পাত্র দেখতে বলেচেন··

হিমাংশু কহিল,—খাশা হবে। বীণা ম্যাট্রিক পাশ করেচে,—আর তার মুখের কথা গাণ্ডীবের টঙ্কার! সেই ঠিক লোক হবে অশোককে শাসনে রাখতে···

স্থষমা কহিল,—কি বলেন অশোকবাবু ?

অশোক কহিল,—আপনারা যখন মত করচেন .

স্থষমা কহিল,··এই দণ্ডে আমি চিঠি লিখে দি—বীণাকে নিয়ে তিনি আস্থন...

হিমাংশু কহিল,—অশোক-তরু মুঞ্জরিত হয়ে উঠুক, বীণার ঝঙ্কারে...উপমা যদিও ঠিক হলো না, যেহেতু অশোক মুঞ্জরিত হয় অন্ত ব্যবস্থায়···

অশোক কহিল,—শাস্ত্রের সকল ব্যবস্থাই আমি শিরোধার্য্য করতে প্রস্তুত, বন্ধু !

ট্রেণের কামরায়

পূজার ছুটী হইতে চার-পাচ দিন দেরী। দিল্লী এক্সপ্রেশে বাহির হইয়া পড়িলাম, আগ্রা-দর্শন-মানসে।

বার্থ ক'টা রিজার্ভ ছিল... পার্শী আর সাহেব, আমি একা বাঙালী। লগেজের মধ্যে একটা বিছনার মোট, একটা ট্রাঙ্ক, আর একটা হাতব্যাগ। বিছানাটা বেঞ্চে পাতিলাম, এবং ট্রেণ ছাড়িবামাত্র তদুপরি দেহ-ভার গড়াইয়া দিলাম। হাতে ছিল সদ্য-প্রকাশিত একখানা বাঙলা নভেল—তার পৃষ্ঠায় মনোযোগ অর্পণ করিলাম।

বর্দ্ধমানেই কামরা খালি হইয়া গেল। নশীবের ফের! নহিলে এমন আর কবে ঘটিয়াছে! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, আরাম খুবই! আঃ! সেই স্কুলে-পড়া কবিতার ছত্র মনে পড়িল, I am monarch of all I survey...

আসানসোল! ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল,—সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিয়া সাহেবী-পোষাক-পরা এক বঙ্গীয় ভদ্রলোক কামরার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমার দৃষ্টি পড়িল এই নব আগন্তুকের প্রতি... তাঁরো দৃষ্টি...চারি চক্ষে মিলন হইল। বুঝি, পাঁজিকায় সেটুকু ছিল শুভক্ষণ! আগন্তুক পরমোৎসাহে কহিলেন,—আরে...বা! আপনি...!

সবিস্ময়ে তাঁর পানে চাহিলাম। কিছুতেই স্মরণ হইল না, কোথায় ইহাকে দেখিয়াছি! আমার স্মরণ-শক্তি ভারী কমিয়া আসিতেছে, প্রায় এমন ঘটে! ভাবিলাম, ফিরিয়া কবিরাজ-মহাশয়ের শরণ লইব।

মালপত্র যথাস্থানে সংরক্ষিত করিয়া আগন্তুক একটা বেঞ্চে বসিলেন. বসিয়া কহিলেন,—এ জীবনে কোনো দিন আর দেখা হবে বলে মনে হয় নি! ভারী আনন্দ বোধ করচি। বই পড়া হচ্ছে? কি বই? বাঙলা?

আমি কহিলাম,—হাঁ, একখানা নভেল।...

—দেখি।

দিলাম। পাতাগুলা খুলিয়া দেখিয়া তিনি কহিলেন,—ফন্দা হাওয়া—পতিতপাবন পোদ্দারের লেখা। ইনি আজকাল খাশা লিখচেন। রবিবাবুকে নভেল লেখা বন্ধ করতে হয়েচে!...ওঁর সে বইখানা পড়েচেন?

কহিলাম,—কোন্ বই?

তিনি কহিলেন,—ঐ যে—আহা, নামটা মনে পড়চে না। ঐ যে যাতে আছে, সেই নায়িকা ঘোড়ায় চড়ে পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়লো...হাঁা, হাঁা—দিল্ বাতিল!... এবারে ঐ জগত্তারিণী মেডেলটি ওঁকেই দিতে হবে। তা কর্ত্তাদের বিচার-বিবেচনা আছে! উনি ছাড়া মেডেল পাবার যোগ্য দ্বিতীয় ব্যক্তিও আর দেখচি না...

অতীতের কুয়াশাচ্ছন্ন দিনগুলার মধ্যে মনকে ছাড়িয়া দিলাম—পরিচয়টুকু যদি সংগ্রহ করিতে পারি! কিন্তু...

আগন্তুক কহিলেন,—আপনি মোদ্দা একটুও বদলান্নি ...

মনকে চাঙ্গা করিয়া লইলাম। অপ্রতিভ হইলে চলিবে না—কিছুতে অপ্রতিভ হইব না! হাইকোর্টে ওকালতি করি, বুদ্ধিও তো কিছু আছে...

কাজেই বেশ সপ্রতিভ-ভাবে জবাব দিলাম—আপনার চেহারারও বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখচি না...

আগন্তুক কহিলেন,—আপনি একটু মোটা হয়েচেন...

সবিস্ময়ে কহিলাম,—মোটা! সকলে বলে, একটু কাহিল···

আগন্তুক কহিলেন,—না। আমার চোখে তা তো দেখচি না! কি রকম ছিল আপনার শরীর ..ইয়া একেবারে স্পোর্টস্‌ম্যান লাইক্! অর্থাৎ 'এজিং' আর কি! কথাটা বলিয়া আগন্তুক একটু হাসিলেন।

আমার মনের মধ্যে অস্বস্তি জাগিয়াছিল। কে এ ভদ্রলোক—এমন অনর্গল কথা বলিতেছেন...যেন কত কালের অন্তরঙ্গতা! কি নাম? যাচিয়া নামটা জানিতে পারি না! জীবনের দীর্ঘ পথে কবে-কার সঙ্গে দেখা, কার সঙ্গে কবে মিশিয়াছিলাম, সেই ভিড়ের মধ্যে বিচরণ করিয়াও মন কিছুতে সন্ধান পাইল না, কে এ আগন্তুক!···

তবু মনকে শাসাইয়া কহিলাম,—না, তা বলিয়া হঠিব না! অপ্রতিভ হইব না! কোনোমতে না!...

আগন্তুক কহিলেন,—ক'বছর পরে দেখা হলো...? আট, দশ,... না, পনেরো-ষোল বছর বোধ হয়...

আমি কহিলাম,—তা হবে!—স্বর যথাসাধ্য করুণ করিলাম···যেন দীর্ঘকালের বিচ্ছেদের বেদনায় মন আমার কাতর!

আগন্তুক কহিলেন,—কথায় বলে, সময়, না, জলের স্রোত... বেগে চলেছে!

আমি কহিলাম,—বিদ্যুতের মত কালের গতি!···

আগন্তুক কহিলেন,—আশ্চর্য্য! পাশ থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিট্‌কে কতদূরে সরে যাচ্ছে কি পরিবর্ত্তনই জীবনে আসে! নতুন মুখ নিয়ে নতুন লোকের নিত্য আনাগোনা ··মন কিন্তু সেই হারানো বন্ধু-বান্ধবের পিছনে আকুল হয়ে ঘুরে বেড়ায়!

কহিলাম,—তা ঠিক!

আগন্তুক কহিলেন,—পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখাশুনা হয় কখনো ?...মানে, সে বাল্য লীলাভূমিতে...

তাঁর কথায় কবিত্বের আমেজ ! সেটুকু লক্ষ্য করিলাম।...

কহিলাম,—না। কারো সঙ্গে দেখা বড় হয় না।

আগন্তুক কহিলেন,—হাইকোর্টে বেশ পশার হয়েচে...কাগজে নাম-টাম দেখি। অনেকের মুখে আপনার কথা শুনি ! আমি বলি, সেই আমাদের চাটুয্যে .

কহিলাম,—আপনি এখন কি করচেন ?

আগন্তুক কহিলেন,—পৈতৃক কিছু বিষয়-আশয় ছিল, তাই নাড়াচাড়া করচি। কিছু হলো না জীবনে—সফলতার দিকে এক-পা এগুতে পারলুম না। আমার জীবনটা এ-জন্মের মত failure হয়ে রইলো...

কথার পর ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ! সে দীর্ঘশ্বাসে ব্যর্থ জীবনের এক করুণ ইতিহাস নিমেষে ছাপানো বইয়ের পাতার মত আমার চোখের সামনে জলজ্বলিয়া উঠিল।...

ট্রেণ চলিতেছে। কামরার জানালা খোলা। নক্ষত্র-ভরা আকাশ ...আলো-আঁধারের অস্পষ্ট আবছায়া · মনের কোণে অস্পষ্ট স্মৃতিরেখার মত হু-হু বেগে সরিয়া সরিয়া চলিয়াছে। ট্রেণের একটা ঘড়-ঘড় শব্দ নিতান্ত একঘেয়ে ! মানব-জীবনের অবিরাম নিত্য-চলা বৈচিত্র্যহীন যন্ত্রটার শব্দই যেন ট্রেণের-সে-শব্দে তালে তালে বাজিয়া চলিয়াছে ! আগন্তুক চুপচাপ বসিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ ...তারপর কহিলেন,—দু'মাস আগে বসন্তর সঙ্গে দেখা...ট্রেণে। আমি সাহেবগঞ্জ থেকে ফিরছিলুম। বসন্তকে মনে আছে ? সেই কোঁকড়া চুল, গান গাইতো ?

সুরের ঘূর্ণি হাওয়ায় বসন্তর পাত্তা পাইলাম না! কোঁকড়া চুল, গান গাইতো? আমাদের কেষ্টর মূর্ত্তিখানাই চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে বার-বার...

আমি কহিলাম,—বটে! বসন্ত এখন কি করচে?

ভদ্রলোক কহিলেন,—মাসিক কাগজের সম্পাদকী করচে! দুর্গ্রহ! গবর্ণমেণ্ট সার্ভিসে ঢুকেছিল, ছেড়ে দিলে! সাহেবগঞ্জে মেয়ের বিয়ে দেছে মেয়েকে দেখতে এসেছিল। আপনার কথা হলো। মানে, জীবন-যুদ্ধে আপনিই আমাদের দলে সব-চেয়ে successful হয়েচেন! আপনার কথা সকলের সঙ্গেই হয়

একটু গর্ব্ব বোধ করিলাম। স্তুতিবাদে অপ্রসন্ন বিমুখ চিত্তেও প্রসন্নতার উদয় হয় এ-কথা অবিসম্বাদী সত্য! পুরাণ-ইতিহাসেও তার বহু প্রমাণ পাই!

আমি কহিলাম,—চারুর সঙ্গে দেখা হয়? আমাদের সেই puritan চারু?

চারু নামটা স্রেফ বানানো—ধাপ্পা! ভদ্রলোক সার-সার নাম বলিতেছেন আর আমি হাঁ করিয়া থাকিব? তাই এক চাল চলিলাম!

ভদ্রলোক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মিনিটখানেক কি ভাবিলেন, বুঝি অতীতের বহুদিনের কথা ..তারপরই তার চোখে দীপ্তি ফুটিল। তিনি কহিলেন,—চারু! চারু সিঙ্গি তো? সে আছে বোম্বাইয়ে ফিল্মে যোগ দেছে। এক বোম্বাই ওয়ালার ফার্ম্মে বেশ রোজগার করচে। ঐ যে 'চীন রাজকুমারী' ফিল্মে চীন পরিব্রাজক সেজে ভারী নাম কিনেচে।

আমি অবাক্! তবু হাল ছাড়িলাম না। কহিলাম,—আর হেমলাল?

ভদ্রলোক কহিলেন,—চারুর পিসতুতো ভাই হেমলাল! সে বিয়ে করেচে যে! কথাটা বলিয়া ভদ্রলোক হাসিলেন।

আমার বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। কে চারু জানি না, কে হেমলাল, তাও জানি না। তবে হেমলালের বিবাহটা এক অসম্ভব কল্পনার বস্তু ছিল, বুঝিলাম জোর করিয়া হাসিলাম। হাসিয়া কহিলাম,—হেমলাল অবশেষে বিয়ে করলে!···হাঃ হাঃ হাঃ!

উচ্চ হাস্যরোলের মধ্য দিয়া একটা ষ্টেশনে ট্রেণ থামিল। লোকজনের ছুটাছুটি, কোলাহল—চকিতের জন্য একটু বৈচিত্র্য...

তারপর আবার যথারীতি ট্রেণ চলিল।

কাশিয়া ভদ্রলোক কহিলেন,—কতবার আমার মনে হয়েচে, চিঠি লিখে আপনার তত্ত্ব নি...বিশেষ আপনার অত-বড় বিপদের কথা যখন শুনলুম...

বিপদ! বিস্ময়ে আমি বাক্যহীন! দীর্ঘ দশ-পনেরো বৎসরের মধ্যে কোনো বিপদ...কৈ, আমার তো মনে পড়ে না! একদিন হাঁ, ঘোড়াটা পড়িয়া পায়ে চোট্ লাগায়···আর একদিন সেই হাইকোর্টের সিঁড়িতে পা পিছলাইয়াছিল! কিন্তু তাকে কি বিপদ বলে!

ভদ্রলোক একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—মৃত্যুর ছায়া সর্ব্বত্র! বুদ্ধদেবের সেই গল্প মনে পড়ে? হুঁঃ—মৃত্যুকে এড়াবার শক্তি কারো নেই। কুইন ভিক্টোরিয়া অত ভালো মহারাণী··মারা গেলেন! অমন দুর্দ্ধর্ষ বীর যে নাদিরশা, চেঙ্গিস খাঁ··তারাও মৃত্যুকে রোধ করতে পারেনি···

আমার বিস্ময় বাড়িয়া উঠিল। মৃত্যুর পিছনে হঠাৎ ইতিহাসের দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধার মূর্ত্তি আনিয়া দাঁড় করানো। এ-মৃত্যু কার ঘটিল যে··

ভদ্রলোক কহিলেন,—সে-মৃত্যুর আঘাত আপনি যে সহজে কাটিয়ে উঠেচেন, হাঁ, একেই বলে মনের শক্তি।

কথাটা প্রাণে যেন কেমন বেসুরা বাজিল! তবু মৃত্যুকে বুকে জড়াইয়া কহিলাম,—মৃত্যু তো আছেই। সেজন্য কাতর হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ভদ্রলোক কহিলেন,—ঠিক! আপনার পিশিমার কথা বলছিলুম। তাঁর স্নেহেই...

ভদ্রলোকের স্বর শোকের বেদনায় আর্দ্র হইয়া থামিয়া গেল। আমি অবাক্! পিশিমা আমার কে? আমি জানিতাম, আমার পিতামহের কোনো কন্যা ছিল না। এ ভদ্রলোক দেখি ..

Bogus...? নয়তো বিষম ভুল করিতেছেন! কথাবর্ত্তা ভালো একটু করুণা বোধ করিলাম—এ ভুল ভাঙ্গাইব না। পুরানো বন্ধু ভাবিয়া সুখ-দুঃখের দুটা কথা তুলিয়া যদি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন... মন কিন্তু রুখিয়া উঠিল, রাত হইয়াছে—এ-সব কাহিনী আর কেন!

কৌতূহল থামিয়া গেল।

বইখানা মুড়িয়া হাত-ব্যাগ খুলিয়া চশমা জোড়া তার মধ্যে রাখিয়া শুইয়া পড়িলাম। ভদ্রলোক কহিলেন,—ঘুমোবেন! রাত হয়েচে বটে। তা, কতদূর যাওয়া হবে?

কহিলাম,—আগ্রা।

তিনি কহিলেন,—বটে! আমি যাবো মৃজাপুর...পরে আবার কথাবার্ত্তা হবে। কিছুদিন আমি ওখানে থাকবো। তার পরে পূজা চুকলে...আগ্রা...হাঁ, গেলে হয়। সেখানে কোথায় থাকবেন?

কহিলাম,—একটা হোটেল খুঁজে নেবো।

ভদ্রলোক কহিলেন,—স্থিরতা নেই? আচ্ছা, এগুনতো আপনি। যদি যেতে পারি আমি খুঁজে নেবো। আহা, আগ্রা...কি তাজ... নর-জন্ম-গ্রহণ করে তাজ যদি না দেখলুম তাহলে কি হলো! আমি

দুবার গেছি। তবু মন টানে...কি প্রেম, কি প্রীতি, কি অনুরাগ! হাঁ, বাদশা বটে সাজাহান, শুধু বাহিরের ঐশ্বর্য্যে নয়, মনেও···চক্ষু মুদিলাম।

মাঝে মাঝে চোখ খুলিতেছিলাম। ভদ্রলোক নিজের বাক্স খুলিয়া ব্যাগ খুলিয়া এটা-ওটা নাড়িতেছিলেন, গুছাইয়া রাখিতেছিলেন।

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ধাক্কায়। চোখ চাহিয়া দেখি, ট্রেণ দাঁড়াইয়া আছে। একটা ষ্টেশন!···

ভদ্রলোক আমায় ঠ্যালা দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইলেন, কহিলেন,—আমায় এখানেই নামতে হচ্ছে। একখানা টেলিগ্রাম। স্ত্রীর কলেরা হয়েচে— ফিরতি ট্রেণে বাড়ী চললুম। একটু সতর্ক থাকবেন। জিনিষ-পত্তর··· সাবধান···নাহলে যে রকম train theft হচ্ছে! আচ্ছা, গুডনাইট। কলকাতায় যাবো। এর পর দেখা হবে। একটা কাজের পরামর্শও আছে। দেখি, স্ত্রী কেমন থাকে। একটু আগে মৃত্যুর কথাই হচ্ছিল! আমার বুক কাঁপচে...coming events সেই কথা আছে তাই না কি···

ট্রেণের বাঁশীর স্বর কাণে গেল। চোখ বুজিয়া আসিতেছিল। কোনোমতে জড়িত স্বরে ভদ্রলোককে বিদায় দিলাম। ট্রেণ চলিতে সুরু করিয়াছে, ভদ্রলোক দ্বার খুলিয়া লাফাইয়া পড়িলেন।

চোখে ঘুম আর আসে না! কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। চোখ দুটা করকর করিতেছিল। জ্বালাও! বিরক্ত হইয়া ভাবিলাম, পতিতপাবন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসখানা শেষ করিয়া ফেলি।...

উঠিয়া বাথরুমে গিয়া চোখে-মুখে জল দিলাম। ফিরিয়া হাতব্যাগ···বাঃ, আমার হাতব্যাগ? নাই তো! তার জায়গায় বেতের একটা বাক্স!

বাঙ্কের নীচে উপরে সর্ব্বত্র খুঁজিলাম। হাতব্যাগ নাই! সর্ব্বনাশ! উহারই মধ্যে শ'খানেক টাকা, রেলের টিকিট, আমার যথাসর্ব্বস্ব অর্থাৎ পথের সম্বল!

হ্যাঁচকা টানে বেতের বাক্সটা খুলিয়া ফেলিলাম। কতকগুলা নুড়ি, পাথর – সেই সঙ্গে ভাঁজ-করা একটুকরা কাগজও।

কাগজ খুলিলাম, লেখা আছে--

—ধন্যবাদ, পি. চ্যাটার্জী এ্যাডভোকেট সাহেব। ব্যবসার খাতিরে হাতব্যাগটা লইতে হইল। আপনার খাতির বহু বহু কাল মনে থাকিবে। ইতি

বোগাস।

তীব্র রোষে সর্ব্বশরীর ঝাঁজিয়া উঠিল। ট্রেণের শিগনাল চেন টানিয়া দিব? না, গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িব? কি করিব? কি? কি?

বসিয়া পড়িলাম। মনে উকিলী বুদ্ধির গর্ব্ব ছিল বড় বেশী—লোকটা কি··· কিন্তু নাম? আমার নাম? ঠিক! ঐ ট্রাঙ্কের উপর লেখা আছে, পি চ্যাটার্জী, এ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট, ক্যালকাটা!

পরের ষ্টেশনে পুলিশ ডাকিয়া নালিশ লিখাইলাম!

টেলিগ্রাম করিয়া টাকাও আনাইলাম, কিন্তু যা গেল—থাক! পুলিশ কবে কার খোয়া মাল সন্ধানে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে! বিশেষ...

অগ্নিচক্র

আগের রাত্রে থিয়েটারে সীতা দেখিয়া আসিয়াছি। অভিনয়ের আলোচনা হইতেছিল। কমল কহিল,—বেচারা শম্বুক! স্ত্রীর সাম্‌নে তাকে ঐ নৃশংস হত্যা...নারীর জীবনে এর চেয়ে বড় ট্রাজেডি কি ঘট্‌তে পারে, জানি না!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কমল আকাশের পানে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া ধরিল।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কেন, রামের ঐ আকুল আবেগের মধ্যে সীতাদেবীর অন্তর্ধান—সেও কি কম ট্রাজেডি!

অবু কহিল,—আমার কিন্তু ভারী আশ্চর্য্য বোধ হয়.

সকলে অবুর পানে চাহিলাম। অবু কহিল,—নাটক মানুষের লেখা গল্প-কথা। তার অভিনয়—সেও যত বড় উঁচু জিনিষ হোক কলা-শিল্পের দিক দিয়ে, তবু সে কৃত্রিম। তাতে তোমরা এমন বিচলিত হও! অথচ সত্যকার জীবনে কত স্বামী, কত স্ত্রী কি মর্ম্মান্তিক ট্রাজেডি বুকে বয়ে সংসার-ধর্ম্ম পালন করে চলেছে,—তার কোনো খপর রাখো?

কুতূহলী দৃষ্টিতে অবুর পানে চাহিলাম। অবু কহিল,—চোখে এক ফোঁটা জল অবধি ঝরে না; বুকের মধ্যে ট্রাজেডি প্রচণ্ড সাহারার মত খাঁ-খাঁ কর্‌চে! রৌদ্র-তাপে বুক একেবারে ঝল্‌সে রয়েচে!

বাহিরে কামারের দোকানে লোহা-পেটার বিশ্রী কর্কশ আওয়াজ চলিয়াছে সমানে। ঘরের মধ্যে নিবিড় স্তব্ধতা।

অবু কহিল,—একটি কাহিনী আমি জানি। এক তরুণীর নীরব বেদনার কাহিনী—বইয়ের পাতায় ছাপা অতি-বড় ট্রাজেডির চেয়েও যা করুণ!

আমি কহিলাম,—Let us have it.

অবু কহিল,—বেশ! সে স্তব্ধ রহিল, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—কিন্তু কোথা থেকে সে-কাহিনী স্থরু করবো, সেইটেই সমস্যা ঠেকচে।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল,—মাঝখান থেকেই স্থরু করো! একদা এক দেশে...সে উপক্রমণিকার প্রয়োজন নেই। আমরা স্থান-কালগুলো কল্পনা করে নেবো।

দু'চার মিনিট নীরব থাকিবার পর অবু কাহিনী স্থরু করিল—

থাকি তখন ঝামাপুকুরে। আমাদের বাড়ীর পাশে ছোট একখানা ভাড়াটিয়া বাড়ী—নেহাৎ পচা, স্যাঁৎসেঁতে, প্রায় খালি পড়িয়া থাকিত; কোনো ভাড়াটিয়া আসিয়া দিন পনেরো-কুড়ির বেশী টিঁকিতে পারিত না।

সেবার পূজার বন্ধের মুখে ত্রিগুণা গাঙ্গুলি আসিয়া কিছুকাল থাকিয়া গেলেন। তখনো আলাপ-পরিচয় ঘটে নাই। শুধু দেখিলাম, যে-বাড়ী প্রায় খালি থাকিত, সে-বাড়ীতে একদল ভাড়াটিয়া তিন-চার মাস টিঁকিয়া রহিয়াছে।

শীতকাল। রাত প্রায় বারোটা, হঠাৎ কান্নার রোলে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া দেখি, ও-বাড়িতে হৈ-হৈ ব্যাপার! দোতলার জানলাগুলা খোলা...এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক শুইয়া আছেন—আর তাঁকে ঘিরিয়া ছেলেমেয়ে ও গৃহিণী ভীষণ আর্ত্ত রোল তুলিয়াছে!

আমার তখন মেডিকেল কলেজে ফোর্থ ইয়ার। দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। ছুটিয়া গেলাম। ব্যাপার যা দেখিলাম, সাংঘাতিক। কর্ত্তা ত্রিগুণাবাবুর হার্টের গোলমাল ছিল। অফিস হইতে ফিরিয়া কেমন নির্জীব হইয়া পড়েন,—ডাক্তার আসে—তারপর এখন—সব শেষ! দিন আনিয়া দিন খাওয়ার সংসার! এক পয়সা সঞ্চয় নাই, অথচ .

এক তরুণী···তরুণী সুন্দরী, মুখে-চোখে কি শান্ত করুণ শ্রী... দেখিলে প্রাণে মমতা জাগে! দুই চোখ জলে-ভরা...ম্লান কণ্ঠে তরুণী কহিলেন,—কি হবে?

মুখে কথা ফুটিল না। তাঁর পানে চাহিয়া রহিলাম, পরে নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম,—করবার আর কিছু নেই এখন!...

তরুণী আমার পানে চাহিলেন—সে-দৃষ্টি জীবনে ভুলিবার নয়!

তোমরা ভুল করিয়ো না...আমার তখন তরুণ বয়স, আর সাম্‌নে সেই অপরিচিতা তরুণী···তায় সুন্দরী·· বুঝি, পঞ্চশর অলক্ষ্যে বসিয়া...! তা নয়। পঞ্চশরের কথা তিলার্দ্ধ মনে উদয় হয় নাই... সে অবস্থায় পুষ্পধনুতে শর যোজনা করিবে কি, পঞ্চশরও বেদনায় শিহরিয়া সরিয়া যায়!

ত্রিগুণাবাবুর মৃত্যুর পর আরো একমাস তাঁর পরিবারবর্গ সে-বাড়ীতে ছিলেন। মাঝে মাঝে সে-গৃহে যাইতাম...শৈলর সঙ্গে পরিচয় ঘটিল। তরুণীর নাম শৈল।

তারপর একদিন এত-বড় দুনিয়ার কোথায় যে তাঁরা অদৃশ্য হইয়া গেলেন! জীবনের পটে কত রঙের তুলির পরশ আসিল, মিলাইয়া গেল...ছোট একটু স্মৃতির রেখায় ক্বচিৎ কখনো শৈলদের কথা মনে জাগিত তাও নিমেষের জন্য! কাজের ভিড়ে স্থান পাইত না।

পাশ করিয়া ডাক্তার হইতে না হইতে ওদিকে বাধিল জার্ম্মাণ যুদ্ধ—ভাগ্য-পরীক্ষার মস্ত অবসর! সে কি ভৈরব-গর্জ্জন! জীবন-মরণ লইয়া খেলা। তা হোক্--ও-ভিড়ে প্রাণটা কোনোমতে যদি বাঁচিয়া যায়, রোজগার মন্দ হইবে না! নাম লিখাইয়া দিলাম। হুকুম আসিল—বস্‌রা যাও!

যাওয়ার মুখে একখানা চিঠি আসিয়াছিল—কালীঘাট হইতে; শৈলর বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র! কিন্তু ওদিকে যুদ্ধের আহ্বান···সে আহ্বান লৌকিকতার ধার ধারে না। বস্‌রায় ছুটিলাম।

তারপর কামানের গোলা, আর্ত্তের হাহাকার—এমনি কোলাহলে জীবন ঢালিয়া ক'বৎসর কাটাইয়া দিলাম। তার মধ্যে কোথায় রহিল শৈল, কোথায় বা তার সেই করুণ চোখের শান্ত দৃষ্টি!

যুদ্ধ থামিলে মোটা মাহিনার চাকরি লইয়া দেশে ফিরিলাম।...

এলাহাবাদে থাকি। আত্মীয়-বন্ধুর পীড়া-পীড়ির অন্ত নাই—মানুষ হয়েচো, এবারে বিয়ে করো!

বিবাহের কথা মনে না হইত, এমন নয়! কিন্তু বয়স বাড়িয়া গিয়াছে! তা ছাড়া সঙ্কল্প ছিল, বিলাত যাইব—গিয়া এমন বিদ্যা শিখিয়া আসিব, যার বলে দেশে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারি, কিন্তু এ-সব আত্মকথার প্রয়োজন দেখি না।

এলাহাবাদে থাকি। হঠাৎ রোগী দেখার ডাক পড়িল, এক বাঙালীর গৃহে। বাড়ীর কর্ত্তার অসুখ। যে-ডাক্তার দেখিতেছিলেন, তিনি আমায় লইয়া গেলেন—রোগ-সম্বন্ধে পরামর্শের জন্য। গেলাম।

গিয়া দেখি—শৈল! সে-ই! সে-মুখ ভুলিবার নয়। তবে সে দীপ্ত-শ্রী মলিন হইয়া গিয়াছে—দুশ্চিন্তার ভারে দুই চোখের নীচে কালির রেখা!

আমায় দেখিয়া শৈল কহিল,—অবু-দা !

হাসিয়া কহিলাম,—হ্যাঁ, আমি। কার অসুখ ?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শৈল কহিল,—আমার স্বামীর।

রোগী দেখিলাম। বয়স হইয়াছে। রোগ কঠিন—মস্ত অপারেশন ছাড়া আরোগ্যের আশা নাই। অথচ সে-কাজে প্রাণহানির আশঙ্কাও অনেকখানি। শৈলকে সে-কথা বলিতে হইল। তার দু'চোখে জলের ধারা নামিল। আমার পায়ে হাত দিয়া শৈল কহিল,—তুমি রক্ষা করো, অবু-দা...

আশ্বাস দিয়া কহিলাম,—চেষ্টার ত্রুটি হবে না, বোন্ !

অপারেশন হইল—গৃহে নয়, হাসপাতালে। শৈলর সঙ্গে নিত্য দেখা হইত। তার স্বামী পরেশ। শৈল তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

পরেশ বাবু সারিয়া গৃহে ফিরিলেন। শৈল কহিল,—বৌকে একদিন আন্‌বে না, অবু-দা ?

আমি কহিলাম,—বৌ পাবো কোথায় ?

শৈল কুতূহলী দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া কহিল,—বিয়ে করোনি !

—না। মোটে সময় পেলুম না বোন্, বিয়ে কর্‌বার। কলেজ ছেড়েই চাকরিতে ঢুকেচি—তারপর সমানে হৈ-হৈ করে দিন কেটে যাচ্ছে। এদিকে বয়সও ফুরিয়ে এলো···

শৈল কোনো জবাব দিল না—আমার পানে চাহিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। কাথায় কথায় শৈলর অনেকখানি পরিচয় মিলিল।

ত্রিগুণাবাবুর গৃহিণীকে দেখিয়াছিলাম; তিনি শৈলর মা নন্, বিমাতা। শৈলর স্বামী পরেশ একটা কারখানায় হেড্ মিস্ত্রীর কাজ করিত। গৃহে অনেকগুলি পোষ্য। বিবাহে একটি পয়সা ব্যয় হয় নাই। যে-দুঃখে শৈলর দিন কাটিয়াছে .

তারপর হঠাৎ এক সাহেবের নজর পড়ায় পরেশের উন্নতি ঘটিয়াছে। সাহেব এলাহাবাদে মস্ত ফ্যাক্টরি খুলিয়াছে—সে ফ্যাক্টরির চার্জ্জ পরেশের হাতে। পরিশ্রম খুব--তবে ফ্যাক্টরিকে দাঁড় করাইতে পারিলে পরেশের ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে।

ভাগ্য পরের কথা। কিন্তু উপস্থিত দায়, পরেশের আয়ে কুলায় না! দেশ পশ্চিম—চেনা লোক-জন নাই, কাজেই পরেশ আরো দু'পয়সা বেশী উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় একটা স্কুলে রাত্রে পড়ায়; শৈলকেও দুপুর বেলায় দু'চার ঘরে মেয়ে পড়াইয়া কিছু রোজগার করিতে হয়। দেশে পোষ্য-সংখ্যা অল্প নয়—সকলের নির্ভর তাদের উপর...

চার বৎসর এমনি চলার পর শৈল এক মৃত সন্তান প্রসব করিল। শরীর তার ভাঙ্গিয়া পড়িল--উঠিতে গেলে চোখে অন্ধকার দেখে, পা কাঁপে। পরেশ নিজের হাতে রাঁধিয়া শৈলর পরিচর্য্যা করিয়া তাকে সারাইয়া তুলিল—কিন্তু তার ঐ পরিশ্রম, তার উপর মাথায় দুশ্চিন্তার পাহাড়.. পরেশের শরীরও ভাঙ্গিতেছিল- কিন্তু উপায় কি! দুটি ভাই এগ্‌জামিন দিবে, তাদের টাকা চাই,—বিধবা বোনের মেয়ের বিবাহ—তার রশদ...পরেশ কি পরিশ্রম সুরু করিল!

বর্ণনায় শৈলর চোখে জল-ধারার বিরাম নাই। শৈল তখনো বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না। তার ঔষধ-পথ্যও চাই- কিন্তু কোথা হইতে এ-সবের সংস্থান হয়! রোগে শৈলর দুঃখ ছিল না। স্বামীর কি সেবা! অহরহ তত্ত্ব লওয়া, রাত্রে বই পড়িয়া গল্প শুনানো···যার অর্থের অভাব, সে-দুঃখী যত রকমে সে-দুঃখ ভুলাইয়া, যাতনা ঘুচাইয়া আরাম দিতে পারে, তার কোথাও ত্রুটি নাই। টাকার জন্য শরীরে অসুরের বল লইয়া কত দিকে যে তার কাজ চলিল ..

শৈল সারিল, কিন্তু স্বামী রোগে পড়িল। দেড় বৎসর রোগে ভুগিয়া চারিদিক সামলাইয়া আসিয়াছে, স্তব্ধ মৌন ভঙ্গীতে। শেষে শরীরে যখন একেবারে আর সহিল না—শৈলকে পয়সার সন্ধানে বাহির হইতে হইল। দেশের বাড়ী হইতে ক্রমাগত টাকার তাগিদ আসিতে থাকে,—অনেকগুলি প্রাণী—তারাই তাদের ভরসা! একটা মেয়ে-স্কুলে শৈলর চাকরি মিলিল। স্বামীর চাকরি যায়-যায়—সাহেব কত ক্ষতি সহ্য করিবে! অথচ স্বামীর কাজ করিবার শক্তি নাই।

আমি কহিলাম,—ওঁর সারতে একটু সময় লাগবে। কিন্তু কারখানার খাটুনি কিছুকাল চলবে না—তালি-দেওয়া শরীর!

নিরুপায় হতাশ দৃষ্টিতে শৈল আমার পানে চাহিল। আমি কহিলাম,—ভেবো না শৈল। আমি আছি। যা হয় একটা উপায় করা যাবে'খন। ওঁর শরীর আগে সারুক!

পরেশের সারিতে ছ'মাস লাগিল। এ ছ'মাস আমি লক্ষ্য করিয়াছি, শৈলর সেবা! মাথায় হাত বুলোনো, পথ্য তৈয়ারী, শিয়রে বসিয়া রাত্রি জাগা—স্বামীর রোগে কোন্ মেয়ে মানুষ না করে! কিন্তু তার উপর ঐ চাকরি—সারাদিন পরের দ্বারে পরের মন জোগাইয়া শরীর-পাত।

আমি কত নিষেধ তুলিয়াছি, কত বলিয়াছি,—আমার বাড়ীতে এসো—আমার ওখানে কে-বা আছে! আমার খরচ কার জন্যই বা! তুমি এ চাকরি ছাড়ো, শৈল…

করুণ মিনতি-ভরে শৈল জবাব দিয়াছে,—যা করছো অবু-দা, পয়সার বিনিময়েও মানুষে এমন করে না। তার বেশী আর বলো না—তোমার দুটি পায়ে পড়ি। সব কষ্ট সহ্য করতে পারি অবু-দা, ভিখিরী হতে শুধু না হয়, এই আশীর্ব্বাদটুকু করো।

ও, আত্মসম্মানে আঘাত বাজে? বেশ, তাই হোক্, শৈল!…

পরেশ ক্রমে সারিয়া উঠিল। আমার জানা এক সাহেব ছিল—মুর। ইউ-পি অঞ্চলে বিস্কুট আর সাবানের কারখানা খুলে বহু পয়সা রোজগার করচে—তারি হাতে শৈলর স্বামীকে তুলে দিলুম।...লোকটি কাজের। দু'চার মাসেই কাজের গুণে সাহেবের সে ডান হাত হয়ে উঠলো—এবং দু'বছরে তার কারখানার কাজে দু'আনার বখরাদার। ইউ-পি বিস্কিট্‌স্ নাম শুনেচো তো? আর হিমালয়ান সোপ্..? আগ্রা, দিল্লী, মীরাট, এলাহাবাদ, কানপুর, লাহোর, বোম্বাই—সর্ব্বত্র ব্রাঞ্চ-ফ্যাক্টরি...লক্ষ্মী একেবারে সর্ব্বত্র ছুটে গিয়ে ধরা দিচ্ছেন।

অবু চুপ করিল।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল,—এই তোমার কাহিনী?

অবু কহিল,—না,—এটুকু ভূমিকা। আসল কাহিনী সংক্ষেপে এবার বলি। বহুকাল পরে...এই ছ'মাস পূর্ব্বে শৈলর সঙ্গে আবার দেখা। এলাহাবাদে এলগিন রোডে মস্ত বাঙলা—পরেশ তার মালিক। তার এখন অনেক পয়সা। শৈলকে চাকরি করতে হয় না। আমি বেড়াতে গিয়েছিলুম—তাদের বাসায় গিয়ে উঠি!...শৈলর চোখের কোণে সেই কালো কালির রেখা—ঘোচেনি!...করুণ শ্রী...

আমি বললুম,—আজো এমন মলিন মুখে কেন, শৈল? ভগবান তো মুখ তুলে চেয়েছেন!

শৈল হাসিল—ম্লান হাসি। কহিল,—তোমার দয়ায় পয়সার অভাব ঘুচেছে আজ...মেজ দ্যাওরকে উনি বিলেত পাঠাচ্ছেন..

আমি কহিলাম,—তবে?

শৈল যা বলিল, তার মর্ম্ম এই,—

মুর সাহেবের যত্নে স্বামীর অর্থ আজ প্রচুর। কাজ লইয়াই স্বামী সারাক্ষণ মত্ত—এ এক নেশা! এ কাজের ভিড়ে, পয়সার প্রাচুর্য্যে

বেচারী শৈল আজ স্বামীর কাছ হইতে কোথায় কত দূরে সরিয়া পড়িয়াছে ! যে-স্বামী অসুখের সময় অমন·· শৈলর অভাব কিছু নাই, সত্য ! দাস-দাসী, লোক-জন, গহনা-কাপড়—যেন আলাদিনের প্রদীপ ঘষার মায়ায় চকিতে কোথা হইতে আসিয়া জড়ো হয় ! কিন্তু এ-সব কার জন্য ! এ-গহনায় সাজিয়া, এ-কাপড় পরিয়া কার সামনে সে দাঁড়াইবে ? কে দেখিবে ? স্বামীর কাছে সর্ব্বক্ষণ লোকজনের ভিড়—সাহেব-মেমকে খানা-ভোজে নিমন্ত্রণ, এ-দেশ ও-দেশ ঘুরিয়া বেড়ানো—তার মধ্যে শৈলর ডাক কোনোদিন পড়ে না ! কোনো ব্যাপারে পরামর্শ করার কল্পনাও স্বামীর মনে উদয় হয় না, কোনো প্রয়োজনে ডাকিয়া পাঠাইলে স্বামী কখনো আসিয়া দেখা করে, কখনো করে না। এ কি যাতনা, তা তার অন্তর্য্যামীই জানেন ! সংসারে সে কর্ত্রী, তারি হাতে লোকজন মাহিনা পায়, তারা আসিয়া মা বলিয়া ডাকে; আদেশ অমান্য করিবার সামর্থ্য কাহারো নাই—তবু এ কি অস্বস্তি, কি অশান্তির কাঁটা-বনে সে পড়িয়া আছে !

স্বামীর কাছে অনুযোগ তুলিলে সেই পুরানো জবাব—স্বামী পুরুষ, তার লক্ষ কাজ, যশ, কীর্ত্তি, উন্নতি ! আর সে ? নারী ! নারীর স্থান অন্দরের কোণে ! লোক-জনকে খাটাইয়া মাহিনা দিয়া সংসার-তরী বাহিয়া চলো ! এর উপর নারীর ইহলোকে চাহিবার আর আছেই বা কি !

অবসরও কি স্বামীর মেলে না ? মেলে···

তখন বন্ধু আসে, বান্ধব আসে,—সুরার পাত্রও না কি ...

শৈল কাঁদিয়া বলিয়াছিল,—ছি, এ আবার কি..

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া স্বামী জবাব দিল,—পুরুষ মানুষ···কাজের ফাঁকে আমোদ-আহ্লাদ একটু চাই তো···

শৈল বলিল,—তা বলে মদ! ও-জিনিষে তোমার যে চিরদিন বিতৃষ্ণা ছিল!

স্বামী কহিল,—সে কুসংস্কার আজ নেই! যার অভাব-হাহাকার আছে, তার রীতি স্বতন্ত্র,—এ সব তার সাজে না। পয়সা হলে রীতি, চাল-চলনও তার মত হওয়া দরকার।

স্বামী মোটরে চড়িয়া বাহির হইয়া গেল!...

জীবনে শৈলর আর সাধ নাই—মরণের নামেও প্রাণ কাঁপিয়া ওঠে! স্বামীকে ফেলিয়া সে চলিয়া যাইতে পারিবে না। তিনি না ভালোবাসুন, তাঁর না প্রয়োজন থাক···শৈলর আছে। আবার তার সেই রোগ দেখা দিয়াছে—চলিতে গেলে পা কাঁপে, চোখে সে অন্ধকার দেখে!

শৈল কহিল,—এ সারবার অসুখ নয় অবু-দা, না...?

আমি কহিলাম,—সারবে বৈ কি।

শৈল কহিল,—বুকে কেমন হাঁফ ধরে, শরীর সর্ব্বক্ষণ দুর্ব্বল মনে হয়..

আমি কহিলাম,—মনের রোগ, বোন্।···একটা কাজ করতে পারো?

শৈল কহিল,—কি?

আমি কহিলাম,—সংসারের ভার ছেড়ে কোথাও সরে বসে থাকো কিছুকাল...

শৈল করুণ দৃষ্টিতে চাহিল, কহিল,—ওঁকে ছেড়ে? সে আমি পারবো না অবু-দা...

তাই! বেচারীর বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে...স্বামীকে আজো সে ভালোবাসে প্রাণ ঢালিয়া! কিন্তু স্বামীর সে ভালোবাসা আজ আর

নাই ! যতদিন অর্থ ছিল না, ততদিন প্রীতির কি নিবিড় বন্ধন ছিল··· অত পরিশ্রম, অভাব-অভিযোগ—মুখে তবু হাসি ছিল ! আজ অভাব নাই, হাসিও নাই !

বেচারী শৈল বাক্‌হীন পশুর মত নিঃশব্দে যাতনা সহিতেছে। তোমরা নাটক-গল্পের ট্রাজেডিতে আত্মহারা হও...কিন্তু যে জীবন্ত ট্রাজেডির ছায়া আমি দেখিয়াছি, শৈলর চোখের দৃষ্টিতে যে ট্রাজেডি, গ্রীক্-নাটকের পাতায় তেমনটি দেখি নাই !

কবি-কথা

নাম ভোলানাথ। বুঝি, সেই কারণেই কখন কাহাকে কি কথা বলে, কার কাছে কি গল্প করে, তা তার মনে থাকে না। কল্পনার রঙ্ ফলাইতে ভোলানাথ ওস্তাদ। সে পরিচয়..

ঠিক কথা! সাহিত্য-ক্ষেত্রে হালে যে-সব প্রাণবন্ত গল্প ও কবিতা ছাপা হয়, সে-গুলির অধিকাংশের লেখক এই ভোলানাথ। নামটা আপনারা জানেন না? কখনো শোনেন নাই? কি করিয়া জানিবেন, বলুন, সে তো ও-নামে গল্প বা কবিতা ছাপায় না। সাহিত্যের বাজারে তার পরিচয় তার স্বকৃত নামে। সে নামটি বলিলেই চিনিবেন।

কনক সেন! হাঁ, শ্রীকনক সেন। এটুকু ভোলানাথ বেশ জানে, লেখকের নাম দেখিয়া বাঙলায় পাঠক-পাঠিকা লেখার তারিফ করে। ভোলানাথ নামটা অত্যন্ত ঢিলা গোছের। ও-নামে কবিতা লিখিলে টেক্‌স্‌ট্‌-বুক-কমিটির দ্বারে হত্যা দিবার মত শরীরে-মনে বল থাকা প্রয়োজন। গল্প ও-নামে কোনো মাসিকের সম্পাদক ছাপিবেন না, না পড়িয়া ফেরৎ পাঠাইবেন। তাঁদের ও তাঁদের কাগজের একটা ইজ্জৎ যেমন আছে তাঁরা ভাবেন, তেমনি একটা কলাজ্ঞানও

ভোলানাথের চেহারা? হাজার লোকের মধ্যে দাঁড়াইলে হয়তো সে-চেহারা কাহারো নজরে পড়িবে না। কিন্তু চুলগুলি পাটে পাটে কপালে ল্যাপ্‌টাইয়া কস্‌মেটিকের সাহায্যে তার আলুথালু ভাব দমন করিয়া, চোখে একটু আবেশ-মাখানো দৃষ্টি মাখাইয়া বেশ কশ্‌রৎ-

কৌশলে সে-চেহারার যে-ফটো তুলাইয়া ব্লক ছাপাইয়া কনক সেনের কেতাবে আঁটা হয়, সে-ফটো দেখিয়া বলেন নাই কি, হাঁ, কবির চেহারা বটে! কিন্তু এত সূক্ষ্ম বর্ণনার কোনো প্রয়োজন দেখি না। যেহেতু তাঁর জীবন-চরিত আমরা লিখিতে বসি নাই। সে সময় এখনো আসে নাই। কারণ, কবি ও গল্প-লেখক শ্রীকনক সেন এখনো সশরীরে বাঙালীর রসিক-সমাজ অলঙ্কৃত করিয়া জীবিত আছেন, এবং ভগবান করুন, যেন বহু বহু দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তিনি এমনি অক্ষত দেহে বর্ত্তমান থাকিয়া বাঙলা সাহিত্যে রসের ভিয়ানে রত থাকেন!···

একটা নিমন্ত্রণ-সভায় কবি কনক সেনের সঙ্গে আমার দেখা। আলাপ করিয়া বলিলাম,—আপনার লেখা পড়ে ভারী আনন্দ পাই। মাসিক-পত্র এলেই সূচীপত্র খুলি, দেখি, আপনার কি লেখা ছাপা হলো।

মৃদু হাস্যরেখা তাঁর অধরে উথলিল। তিনি কহিলেন,—হাঁ, যাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, তিনিই ঐ কথা বলেন। তাই ভাবি, পাঠক-পাঠিকাকে যারা তৃপ্তি দিতে পারে না, তারা কেন লিখতে ছোটে! শুধু একটা কোলাহলের সৃষ্টি করে বৈ তো!

আমার পাশে ছিল বন্ধুবর নৃপেশ। নৃপেশ কহিল,—ঐ যে গণেশ জোয়াদ্দার···একে গণেশ, তায় জোয়াদ্দার···তার হলো কবিতা লেখার সখ! দেখুন একবার বিবেচনার বহর!···

একটা বিদ্রূপের হাসি কনক সেনের অধর বহিয়া ছুটিয়া গেল। কবি কহিলেন,—যত অপদার্থের দল বাঙলা সাহিত্যটাকে ভারগ্রস্ত করে তুলেচে

কনক সেন আকাশের পানে চাহিয়া কল্পনা-নেত্রে বুঝি বাঙলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রটাকে ইন্‌স্‌পেক্সন করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে

তাঁর পানে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম,—কল্পনার কি অসীম শক্তি! কনক সেন না জানি ভূত-ভবিষ্যতের কতখানি দেখিতে পাইতেছেন!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কনক সেন কহিলেন,—পাঠক-সমাজকে রীতিমত গড়ে তোলা চাই—কলকাতার ফুটপাথে মিউনিসিপালিটি যেমন বাঁখারির বেড়ার গোল গণ্ডী রচে ছাগল-গোরুর অত্যাচার থেকে চারা গাছগুলোকে বাঁচিয়ে বাড়িয়ে তোলে, বাঙ্‌লা সাহিত্যকে তেমনি বেড়ার গণ্ডী টেনে এই সব বাজে সাহিত্যের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে বাড়িয়ে তোলা দরকার। আর তা পারলেই বিশ্ব-সাহিত্য-সভায় বাঙ্‌লা সাহিত্যকে অনায়াসে প্রবেশ করানো সম্ভব হবে।

তারপর আরো নানা কথাবার্ত্তা হইল। হালের মাসিক পত্র. সম্পাদক, লেখক-লেখিকা, তাঁদের ষ্টাইল, রচনার বস্তু প্রভৃতি লইয়া। কনক সেন অত্যন্ত গম্ভীর-ভাবে মাঝে মাঝে 'হাঁ, হুঁ' সাড়া দিলেন, কখনো মৌন চিন্তায় এমন তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়া বসিলেন যে, তাঁর মুখে বেদনার চিহ্ন সুস্পষ্ট প্রকট হইয়া উঠিল। বুঝিলাম, এ-বেদনা আমাদের বঙ্গবাণীর দুর্দ্দশায়! আমার মত লোকের বুকেও সে-বেদনা এমন মর্ম্মান্তিক আঘাত হানিল যে. আমি মানস-চক্ষে দেখিলাম. বঙ্গ-বাণী ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছেন, চারিদিক হইতে তাঁর শুভ্র অমল অঙ্গে কলমের নিবের খোঁচা, ফাউণ্টেন পেনের দড়াদ্দম আঘাত পড়িতেছে. আর দেবীর দুই চোখে জলের ধারা! বুক আমার নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিল।

পাঁচ-সাত দিন পরে আবার দেখা শ্রীযুক্ত কনক সেনের সঙ্গে এক সান্ধ্য মজলিশ পার্টিতে। পার্টি দিয়াছিলেন 'আরতি'র সম্পাদক, 'আরতি'র দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবে। সম্পাদক আমার বন্ধু। তা ছাড়া তিনি হালের উন্নতিশীল জীব. সেই হেতু বহু মহিলাও মজলিশ

পার্টিতে যোগ দিয়া উৎসবের মঙ্গল-শ্রীটুকু সমধিক বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

হল-ঘরের একদিকে এক তরুণী মহিলা কনক সেনের সহিত কথা কহিতেছিলেন.—তরুণীর হাতে এক-তাড়া কাগজ। কনক সেন তাঁকে গম্ভীর ভাবে কি যে সব বলিতেছিলেন—তাঁদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একটা কৌচে বসিয়া আমি চা পান করিতেছিলাম। তরুণীটি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা।

সম্পাদক-বন্ধু পাশে ছিলেন,—কহিলাম,—ও-মহিলাটি কে? সম্পাদক বন্ধু কহিলেন,—ব্যারিষ্টার গাঙ্গুলির মেয়ে প্রতিমা—লেখার ভারী সখ। প্রায়ই গল্প আর কবিতা নিয়ে আমার কাছে আসে – ছাপবার মত হয়নি এখনো। লেখা মক্‌সো করচে। আমি বলেচি, লেখা পাকুক, তখন ছাপবো।

আমি কহিলাম,—কবি কনক সেন বুঝি উপদেশ দিচ্ছেন?

বন্ধু কহিলেন,—হবে!

হঠাৎ প্রতিমা উঠিয়া ত্বরিত গতিতে চলিয়া গেল। কবি কিছুক্ষণ উদাস নেত্রে তাঁর গতি-ভঙ্গী লক্ষ্য করিল। তিনি একা। আমার চা পান শেষ হইয়াছিল, পেয়ালা রাখিয়া তাঁর কাছে আসিলাম। কহিলাম,—এই যে—চা পেয়েচেন?

—হাঁ।

কবির মুখে গাম্ভীর্য্য। কহিলাম,—আপনি আরতি কাগজেও লেখেন না?

—না, নতুন কাগজ। আগে সাহিত্য-রস গাঢ় করে তুলুক, তখন লেখা দেবো।

সে-প্রসঙ্গ চাপা দিয়া কহিলাম,—বহু লেখক-লেখিকা এসেচেন, আলাপ-পরিচয় হলো?…

কনক সেন কহিলেন,—না।

কহিলাম,—আসুন, যে-কজনকে জানি, আলাপ করিয়ে দি।

কনক সেন উঠিলেন। পাশের ঘরে তরুণ সাহিত্যিকের দল। একজনকে চিনিতাম,—বিপত্তিনাথ। লম্বা চুল, গায়ে খদ্দরের খাটো পাঞ্জাবী, পরণে খদ্দর, পায়ে মাদ্রাজী চটি, মুখে-চোখে মলিন ম্লান-ভাব! কিছু পয়সা রাখিয়া বাপ সদ্য মারা গিয়াছেন; বিপত্তিনাথ তাই লেখাপড়া ছাড়িয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামিয়াছে। দলটিও আকারে আচারে তার অনুরূপ।

তাকে ডাকিয়া কনক সেনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলাম। তারা বিশেষ উৎসাহ বা আগ্রহ দেখাইল না। বুঝিলাম, সব ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও তাই! অর্থাৎ তরুণে-প্রবীণে সেই বিরোধ! ভড়কাইয়া কনক সেনকে বিপত্তিনাথের হাতে ছাড়িয়া সরিয়া পড়িলাম।...

উৎসবের কোনো একটা সুশৃঙ্খল ধারা ছিল না। কেহ এ-ধারে বসিয়া চুপচাপ, কেহ ওধারে বসিয়া মহা-উৎসাহে তর্ক সুরু করিয়া দিয়াছে। দুর্ব্বোধ্য কতকগুলা য়ুরোপীয় নামমাত্র মাঝে মাঝে ধ্বনিয়া উঠিতেছে! কেহ মৃদু স্বরে পাশের শ্রোতাকে গান শুনাইতেছে! লেখিকার দলেও তেমনি চাঞ্চল্য!

ঘোরাফেরা করিয়া আমি আসর রক্ষা করিতেছিলাম। বহুক্ষণ এমনিভাবে কাটাইয়া দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া একটা ইজিচেয়ারে দেহ-ভার গড়াইয়া দিলাম। চুরুট ধরাইয়া আকাশের পানে চাহিয়া আছি...পাশের ঘরে এক মহিলা গান গাহিতেছিলেন। গানের দিকে কাণ পাতিয়া চক্ষু মুদিলাম!

অনেকক্ষণ...সহসা একটা স্বর শুনিলাম। আমার খুব কাছে, পিছনে; ...মাথা হেলাইয়া চাহিলাম।

বুঝিলাম, কবি কনক সেন ও একজন মহিলা। মহিলাটি কে, চিনিলাম না। চেনার চেষ্টাও হইল না। অলসভাবে পড়িয়া রহিলাম। পিছনের কথাবার্ত্তা কাণে আসিতেছিল।

কবি কনক সেনের স্বর করুণ, বেদনায় ঈষৎ আর্ত্ত, আতুর। কবি বলিতেছিলেন,—

"এই বারান্দা। এ জায়গাটি ছিল ভারী আরামের। সদানন্দ দাসের তখন হাইকোর্টে ভারী পশার। তাঁর সঙ্গে আমার জানাশুনা হয় একটা মামলার ব্যাপারে। আমাদেরই বৈষয়িক মামলা। আমার বয়স তখন চব্বিশ-পঁচিশ। দুনিয়াকে অপরূপ রঙীন দেখি! সদানন্দ দাস আমায় ভারী ভালোবাসতেন! প্রায় তাঁর বাড়ী আসতুম। তাঁর একটি মেয়ে—বরুণা। যেমন রূপ, তেমনি গুণ! বরুণার মাও আমায় বিশেষ স্নেহ করতেন। কোথা থেকে জানতে পারেন, আমি ভালো গান গাইতে পারি। আমায় বললেন,—বরুণাকে গান শেখাও যদি..

আমি বললুম,—বেশ!

গান শেখানো সুরু হলো। সেই সঙ্গে বিশ্বের সাহিত্য আলোচনা। বরুণার আশ্চর্য্য রসবোধ ছিল। কন্টিনেণ্টাল লেখকদের লেখা কত বই এনে দিতুম; একদিনে পড়ে শেষ করতো। শুধু পড়া নয়, তা নিয়ে রীতিমত আলোচনা-তর্ক। গোর্কি বড়, না, শেহভ বড়? দোস্তোয়েভস্কির সুরের সঙ্গে গোগোলের সুরের তফাৎ কোথায়; রবিবাবুর চেয়ে মোপাশাঁর গল্পে অত বেশী বৈচিত্র্য কেন—সে-সব কথা যদি কেউ ছেপে বার করতো, তা হলে নানা ভাষায় তার তর্জ্জমা হয়ে যেত! সে-আলোচনায় আমার আগ্রহ আর উৎসাহের সীমা ছিল না।

সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ আলোচনা! আমি তখন গজগামিনী মাসিকে কবিতা ছাপতে সুরু করেচি। কবিতাগুলি তরুণ মনের বিরহী কামনার নানা কথায় ভরা! সে-সব কবিতা বরুণার কাছে পড়িনি, বা গজগামিনী কাগজও এনে তার সামনে ধরি নি।··

একদিন সন্ধ্যার সময় গান চলেছে, হঠাৎ মাঝখানে থেমে বরুণা আমার পানে চাইলো। দেখি তার দুই চোখে জল ভরা, মুখ রাঙা হয়ে উঠচে! আমার বুক কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠলো! আমি ডাকলুম,—বরি···

সদানন্দ দাস তাকে বরি বলে ডাকতেন! বরি কোনো জবাব দিলে না···আমি আবার বললুম,—কি হলো বরি? অসুখ করচে?

বরির চোখে সে কি দৃষ্টি! বিরহী বিশ্বের সজল বেদনা যেন সে দুই চোখের দৃষ্টিতে!...আমার বুক দুলে উঠলো তরুণ বুক! তার মধ্যে আবেশ-ভরা লক্ষ কথা এক নিমেষে সজাগ হয়ে উঠলো! বুক কাঁপতে লাগলো।

বরি একেবারে আমার দু'হাত নিজের হাতে চেপে ধরলে, কাতর কণ্ঠে বললে,—আমি তোমায় ভালোবাসি।

ভালোবাসা! সমস্ত দুনিয়া যেন চৌচির হয়ে ফেটে গেল! আর তার বুকে লাভা নয়, কয়লা নয়, নুন নয়, মাটী নয়, জল নয়, রাশি রাশি রঙীন ফুল ফুটে উঠলো! কি তার গন্ধ, কি তার রঙের বৈচিত্র্য!...আমি কেমন বিভোর হলুম! কিন্তু সে চকিতের জন্য!... পরমুহূর্ত্তে মনকে চাব্‌কে সিধে করে বললুম—এ তোমার পাগলামি বরি···তোমার এ-রূপ নিয়ে তুমি ধনীর ঘর অলঙ্কৃত করবে। আমি গরীব···ভবিষ্যৎ আমার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মামলা-মকর্দ্দমায় কাতর, উৎপীড়িত আমি।

বরুণার কি কান্না! সেই সঙ্গে প্রচণ্ড আবদার,—না, না, না, আমি পয়সার কাঙাল নই। আমি ভালোবাসার ভিখারী, তোমার ভালোবাসার ভিখারী···

বলতে বলতে সে একেবারে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো; উঠে আমার বুকে তার মার মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। তার সে চূর্ণ অলকগুচ্ছ উড়ে উড়ে পড়চে, ঘাড়ের মর্ম্মর-শুভ্র বর্ণ—তরুণ বয়সে সে কি মোহ রচে তুললো! সে প্রীতির কাতর নিবেদন আমি অগ্রাহ্য করতে পারলুম না। ...

এই অবধি বলিয়া কনক সেন চুপ করিলেন।

আমি অবাক্! কার কাছে প্রাণের এ গোপন বেদনার ব্যথা-গাঢ় গূঢ় কাহিনীর নিবেদন চলিয়াছে! অথচ কাহিনীর শেষাংশ শুনিবার কৌতূহল জাগিল অপরিসীম। কাজেই, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কাঠ হইয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিলাম।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কনক আবার কাহিনী ধরিল,—

"তারপর দুজনে দুজনের ভালোবাসায় দুনিয়া ভুলে বিভোর রইলুম। যদি একদিন দাসের গৃহে হাজিরা দিতে দেরী হয়, বরুণার সে কি কাতর বেদনা। দাসের সঙ্গে গল্প করচি, মামলার আলোচনা করচি, ম্লান মুখে। বরুণা এসে সে-ঘরের একপাশে দাঁড়ালো,···আমি তাকে দেখেও দেখলুম না। সে একেবারে বেদনায় ভেঙে পড়ে দাসের বুকের উপর ভর রেখে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে উঠলো, —তোমাদের কথা কি শেষ হবে না, বাবা? নতুন গানটা কনক বাবুকে শোনাবো বলে...

অশ্রুর বাষ্পে তার কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে আসতো, কথা আর শেষ হতো না! দাস হেসে বলতেন,—যাও হে কনক, ওর গান শোনো গে।

না হলে পাগলী একদম ক্ষেপে যাবে। ওকে নাওয়ানো-খাওয়ানো অবধি দায় হবে!

আমি উঠে পড়তুম। অমনি তার ম্লান মুখ হাসির দীপ্ত-শ্রীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো!.. এমনি ভাবেই হাসি-খেলা অশ্রু-গানের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরের নিখিল প্রেম নিবিড় হয়ে উঠ্‌ছিল। আমারো অবস্থা হলো এমন যে, একদিন বরুণাকে না দেখলে অধীর আকুল হয়ে উঠতুম!

হঠাৎ এমন সময় একদিন দাসকে বিদেশ যেতে হলো। বরুণারও সঙ্গে যাওয়া চাই...কি নাকি কাজ ছিল! বিদায়-মুহূর্ত্তে তার সে কি কান্না! দাস বিচলিত হয়ে উঠলেন, বললেন,—তুমি তাহলে থেকেই যাও···কিন্তু তার থাকবার উপায় ছিল না! দাস বললেন,—তাহলে কনকও চলুক আমাদের সঙ্গে ..

যাবার জন্য আমার পা চঞ্চল হয়ে উঠলো। কিন্তু, না, এ যে বড় বিশ্রী দেখাবে। তাছাড়া 'যাবো' বললেই আমার যাওয়ার উপায় ছিল না। নানাদিকে আরো নানা কর্ত্তব্যের বাঁধন। ..

বরুণা চলে গেল, আমি পড়ে রইলুম।

তার চিঠি পেতুম···প্রত্যহ! প্রাণের আকুল আবেগে তার প্রতি ছত্র পূর্ণ থাকতো। যে যেন চিঠি নয়, প্রণয়-নিবেদনের বিনোদ-মালা। পড়ে বুক আমার দুলে উঠতো!

সহসা এক চিঠি এলো। তাতে জানলুম, এলাহাবাদে এক ব্যারিষ্টারের সঙ্গে বরুণার বিয়ে হচ্ছে! বরুণা লিখেছিল, আমার সঙ্গে এই নিবিড় অন্তরঙ্গতা দেখে তা বিচ্ছিন্ন করবার অভিপ্রায়েই দাস এই বিদেশে যাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বরুণা তার হাতে বন্দী এ সেই বন্দিনী দশাতেই...

বরুণা লিখেছিল—সমাজের কাছে এ-বিবাহ যত বড় সত্য হোক, তার জীবনে সে তাকে সত্য বলে কোনোদিন গ্রহণ করবে না। বাহিরে সে ব্যারিষ্টার প্রতুল রায়ের স্ত্রী হলেও অন্তরে সে আমারি জন্ম-জন্ম-সঙ্গিনী প্রিয়া !···

আমার জীবনে নিবিড় আলোর উপর অন্ধকার নেমে এলো। আশা-আনন্দের হাজার বাতি সে অন্ধকারের মাঝে নিবে গেল !...”

কবি কনক সেন আবার চুপ করিল। আমার বুক দুলিয়া উঠিতেছিল। কি এ আষাঢ়ে-সাহিত্য রচনা চলিতেছে !

তার শ্রোতাও একেবারে নীরব—বুঝি, বিমুগ্ধও ! কিন্তু সেটা আমার অনুমান। আমার মনে আকুল প্রশ্ন জাগিতেছিল, কে এই শ্রোতা, এমন একাগ্রচিত্তে যে এই আরব-রজনীর কাহিনী-কূজন শুনিতেছে ?...

কনক সেনের কাহিনী আবার সুরু হইল—এ যেন মাসিকের ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস ! কনক বলিতে লাগিল,—

“নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মত আমার জীবন-তরী ভেসে চললো হাওয়ার বেগে, যেদিকে স্রোত বয়, সেইদিকে ! কবিতায় কেবলি বেদনার সুর বাজতে লাগলো ! প্রায় এক বছর পরে হঠাৎ এক চিঠি পেলুম বরুণার কাছ থেকে। বরুণা লিখেচে, থামাও কবি থামাও তোমার বেদনার ঝড় ! আমার পিঞ্জরে-বাঁধা মন আর্ত্ত হয়ে ওঠে, পিঞ্জর বুঝি ও-ঝড়ের দোলায় ভেঙ্গে চুরমার হয়। খামের উপর ডাকঘরের মোহর দেখলুম, বেরিলি ! কত দূর ব্যবধান ! জবাব দিলুম না। হাত উঠলো না। চোখ শুধু অশ্রুর বাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে রইলো।

তারপর এক বাদল রাতে সারা বিশ্ব যখন নিকষ-কালো আঁধারে আচ্ছন্ন, ঝড়ের হা-হা নিশ্বাসে ঘরের দরজা-জান্‌লাগুলো অবধি কেঁপে

কেঁপে উঠচে! আমার বুকের মধ্যটাও ঝড়ের সে রোলে যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, তখন হঠাৎ ঝড়ের ঝাপ্‌টায় খড়খড়িটা খুলে গেল, বিদ্যুতের এক ঝলক আলো, আর ঠিক সেই সঙ্গে ঘরের দরজা ঠেলে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো বরুণা।...বৃষ্টির জলে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে, ম্লান চোখের দৃষ্টি! শ্রান্তি-ভরে পা দুটোকে টেনে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমার পায়ের কাছে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো! আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক্!

প্রথমটা মনে হলো, স্বপ্ন! কিন্তু পরক্ষণেই ঝড়ের মাতনে চেতনা ফিরতে বুঝলুম, না, স্বপ্ন নয়! বরুণাই! তার দু'হাত ধরে তাকে তুললুম, একখানা ডেক-চেয়ার ছিল, তাতে তাকে শুইয়ে দিলুম। বরুণা তখনি ঝাঁকানি দিয়ে উঠে বসলো, বললে,—আমি এসেচি। বহু দূর থেকে এসেচি! কোথাও কোনো অনুযোগ নেই, তবু সে-ঘর আমার অসহ্য হলো তোমার দরদের পরশে। আমার মনে যে ভালোবাসার ফুল ফুটেচে, সে-ফুল কাকেও দিই নি, কবি। প্রাণে ব্যথা বেজেচে। আমার সে-ফুলের ডালি তোমায় দেবো...তাই আমি এসেচি, আমায় নাও।

আবার সেই খোলা খড়খড়ি দিয়ে বিদ্যুতের সেই আলোর ঝলক! আমার মন লোলুপ হয়ে উঠলো। আমার সাধনার ধন আমার হাতের নাগালে! কিন্তু বুক কেঁপে উঠলো...না, না,—

বরুণাকে অনেক বোঝালুম, সমাজ, বিধি-নিষেধ.. প্রাণটাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে ধরে শাস্ত্র-পুরাণের যত বাঁধা-সাধা বচনে তাকে জর্জ্জরিত করে তুললুম। সে কি শোনে! তার কি কান্না, কি আর্ত্ত নিবেদন...

দৃপ্ত কঠিন ভঙ্গীতে আমার মুখে শুধু এক কথা,—না,...

বরুণা যেন আর সইতে পারে না, এমন! আমি অবিচল কণ্ঠে বললুম,—তুমি যাও বরুণা...বেরিলির গৃহে, তোমার স্বামীর পাশে...

সেই ঝড়-বাদলের আঁধার ভেদ করে বরুণাকে গাড়িতে তুলে তাকে নিয়ে তখনি বেরুলুম। একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণে তাকে তুলে দিয়ে বললুম—যাও বেরিলি...

বরুণা কাতর চোখে বললে,—একা?

বললুম.—হাঁ, একা। একাই তো এসেছিলে—

বরুণা কেঁদে বললে,—কিন্তু বুকে তখন মস্ত আশা ছিল, পথের বিপদ ভাবতে পারিনি। এখন এই নৈরাশ্য বয়ে...

বললুম,—হাঁ, এই নৈরাশ্য বয়েই ফিরতে হবে!

বরুণা বললে.—পাথেয়-হীন অবলা নারী...

বললুম,—সেই প্রথম প্রণয়ের স্মৃতি! আমার যে তাই মস্ত পাথেয় জীবনে···

বরুণা খানিক চুপ করে রইলো। ট্রেণের বাঁশী বাজলো; ট্রেণ চলতে সুরু করলো। বরুণা জানলা দিয়ে মুখ বার করে বললে—তবে তাই হোক। তোমার আদেশ শিরোধার্য্য করেই চলবো, নিজেকে ভেঙে চুরমার করে···

ট্রেণ চলে গেল, আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, প্লাটফর্মে···”

তারপর আবার চুপচাপ। বাতাস ভারাক্রান্ত হইল। আমি নিস্পন্দ পড়িয়া, পাশের ঘরে কে তখন গাহিতেছিল—

কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছো...

গানের কথাগুলা ভারী পাথরের মত আমার বুকে চাপিয়া বসিতেছিল—সহসা কবির কণ্ঠে স্বর জাগিল। কনক কহিল—

"তারপর কোনোমতে এই বজ্রাহত মন নিয়ে বাঁশী বাজিয়ে সান্ত্বনা রচবার প্রয়াস পাই। বরুণা সুখে থাকুক! কিন্তু আমার প্রাণের মধ্যে প্রীতি-ভালোবাসা যে তুষারের পাহাড় জমিয়ে রেখেচে,... নিষ্ফল হবে? কারো প্রেমের উত্তাপে এ তুষার গলবে না? তাই ভাবি!—এ প্রেম বিগলিত ধারায় বইতে পেলে দুনিয়াকে যে স্নিগ্ধ শীতল করে দিতে পারে! হায়, দিতে চাই, নিতে নাই কেহ!"

আবার স্তব্ধতা! দু-তিনটা বড় বড় নিশ্বাস!

হঠাৎ কবি কহিল—চললেন?

ঘাড় কাৎ করিয়া দেখি, এক তরুণী উঠিয়া যাইতেছেন। মুখে আলো পড়িল...দেখিয়া চিনিলাম, এ যে মলিনা—সম্পাদক-বন্ধুর ভগ্নী!

আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া গেলাম। কবি চুপ করিয়া বসিয়া আছে—বুঝি, মুদিত চোখে বরুণার কথা ভাবিতেছে! প্রথম যৌবনের সেই প্রেম...! মনে একটু শ্রদ্ধা জাগিতেছিল। কাহিনীটায় মাসিক কাগজের গল্পের ছায়া থাকুক, তবু...

এধার ওধার ঘুরিয়া হল-ঘরে আসিয়া দেখি,—মলিনা আর তিনজন সঙ্গিনীর কাছে একান্তে কি বলিতেছে। বুঝিলাম, কনকের ঐ চমক-ভাঙানো কাহিনী!

একটু বিস্মিত হইলাম। মলিনা ডাগর হইয়াছে,—ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে—এখনো অনূঢ়া! ঐ কাহিনীর করুণ ছিটা যদি...

কনকের একটু বয়স হইয়াছে; তাছাড়া পয়সা-কড়ি যা আছে, সংসারের পথে চলার পক্ষে তা পর্য্যাপ্ত পাথেয় নয়। ভাবনা শুধু সেই জন্যই। তার পর প্রেম বস্তুটার সম্বন্ধে সঠিক কোনো ধারণা আমার এ-পর্য্যন্ত নাই। Love at first sight কথাটা লইয়া বহু গবেষণা করিয়াছি। প্রথম দর্শনে চিত্ত হয়তো একটু দোলে; কিন্তু দুনিয়ার

এত কোলাহল-কলরব, এত বিচিত্র ব্যাপার আসিয়া চোখের সামনে হাজির হয় যে, প্রথম দর্শনের বিভ্রমটুকু থিতাইতে পারে কি না, সে-বিষয়ে আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে দারুণ সংশয় জাগে।

একধারে গ্রামোফোন যন্ত্রটা ছিল; কল চালাইয়া তার উপর একখানা রেকর্ড চাপাইলাম। মূক যন্ত্রে গান বাজিল—

লয়লা কি খেলা খেলে
এ যে নতুন খেলা!

হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল মলিনাদের সঙ্ঘের পানে। তারা হাসিয়া অস্থির…মহা-উৎসাহে হাসিয়া সকলে ত্বরিত কণ্ঠে কত কি কথা বলিতেছে, সেই সঙ্গে চোখে নানা অভিসন্ধির তীব্র ঝিলিক! তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিলাম, তবে একটু সতর্কভাবে।

তারপর মলিনারা সকলে দল বাঁধিয়া চলিল সেই বারান্দার দিকে। তারা বারান্দায় গেলে আমি কাছাকাছি আসিয়া একটা খড়খড়ির পর্দার আড়ালে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইলাম। অন্যায়, জানি। কিন্তু মনস্তত্ত্বে, বিশেষ, নারী-মনস্তত্ত্বে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এমনিভাবেই বাস্তব জীবন হইতে প্রত্যক্ষ ব্যাপারের সহায়তা প্রয়োজন আছে। অতএব…

বেশ তীব্রস্বরে নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—কনক বাবু…

কনক বুঝি তখন তন্দ্রামগ্ন না, চিন্তামগ্ন ছিল। কহিল,—বলুন…

পর্দা ঠেলিয়া সন্তর্পণে একবার চাহিয়া দেখিলাম। মলিনা ও তার এক সঙ্গিনী একটু পিছনে, একটা হাইব্যাক্ চেয়ারের অন্তরালে; আর আগাইয়া কবির সম্মুখীন হইয়াছে মলিনার আত্মীয়া তরুণী মেঘমালা!

মেঘমালা কহিল,—আপনি বরুণদিদিদের কোনো খপর রাখেন ?

ঈষৎ জড়িত স্বরে কনক কহিল,—কে বরুণা ?

আমি ঈষৎ কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম।

মেঘমালা কহিল,—দাস সাহেবের মেয়ে বরুণা···আমার বিশেষ বন্ধু বরুণ-দি···

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর ফুটিল—ও। ..

মেঘমালা কহিল,—আপনার সঙ্গে তার জানাশুনা ছিল ?···

কবি স্তব্ধ, তার মুখে এমন অপ্রতিভ ভাব, আমার লক্ষ্য এড়াইল না।

মলিনা সাম্‌নে গিয়া দাড়াইয়া কহিল,—শুধু জানা-শুনা কি ! ওঁদের দুজনের জীবনে রোমান্সের এক নিবিড়...

—রোমান্স ? মেঘমালা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

মলিনা এক-নিশ্বাসে গড়-গড করিয়া কবি-কাহিনীর সংক্ষিপ্ত-সার বলিয়া গেল। শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। ইণ্টার-মিডিয়েটে ইংলিশ বা সংস্কৃত টেক্‌স্‌ট্‌ হইতে কোনো অংশ লিখিতে দিলে মলিনা তাহাতে ফুল মার্ক পাইবে নিশ্চয় ! খাশা স্মৃতিশক্তি !

সে-কাহিনী শুনিয়া মেঘমালা কহিল,—এ-কথা সত্য ?

কবির দিক হইতে কোনো সাড়া উঠিল না। মেঘমালা কহিল,—বহুকাল পূর্ব্বে এ-বাড়ীর মালিক ছিলেন বরুণা দির বাবা। কিন্তু বরুণা-দি থাকতো···কাশীপুরে। এ-বাড়ীতে এক সাহেব ভাড়াটে ছিল·· তাছাড়া এলাহাবাদের প্রতুল রায়ের সঙ্গে তার বিবাহ হয়নি, বেরেলিতেও সে কখনো যায় নি। তার স্বামীর নাম মণি সেন। মণিবাবু রেঙ্গুনে কিসের কারবার করেন। আর বরুণা-দি রীতিমত পর্দ্দানশীন, ঘোমটা দেয়, বাহিরে খোলা-গাড়ীতেও বেরোয় না, তিন-চার ছেলে-

মেয়ের মা। গান? গান সে শুনতে পটু, কিন্তু গায় না কখনো, কারণ. গাইতে পারে না। তার বাবা সৌখীন হলেও বাড়ীতে সাবেক সেকেলে ব্যবস্থা ছিল। সে-বাড়ী বিশুদ্ধ আয্যামির আস্তানা।

মলিনা কহিল,—আর কনক বাবু, এক ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে নিছক কতকগুলো কুৎসা করে গেলেন!. অকারণে. অম্লান মুখে!

তৃতীয়া সঙ্গিনী.. হেমন্তর স্ত্রী সচকিতে কহিলেন,—আচ্ছা কনক বাবু, এ ভারী মজা তো! এই কাহিনীই সেদিন আমার কাছে বলেছিলেন, যেদিন ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন আমাদের বাড়ী। উনি বাড়ী ছিলেন না, সেই প্রচণ্ড বর্ষা নামলো! তা দেখে নিশ্বাস ফেলে বল্লেন, আপনার জীবনেও এমনি বাদলা নিবিড় হয়ে সেঁটে আছে! গল্পটায় আগাগোড়া মিল—তবে তাতে নায়িকা ছিলেন. পার্ক ষ্ট্রীটের সুবিনয় চ্যাটার্জী সিভিলিয়ানের ছোট মেয়ে মিস্ মিনতি চ্যাটার্জী.. বাদল-রাতে সেও এমনি ঝড়ের মত ছুটে এসেছিল, তাকে আপনি গাড়িতে তুলে বোম্বাই পাঠিয়েছিলেন.. মনে পড়ে?

মলিনা কহিল,—ওঃ আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল! ঐ হৃদয়ভেদী কাহিনী আমার বক্ষ কি দরদে আলোড়িত করে তুলেছিল! সত্যি.. ভাবছিলুম, কবির ঐ প্রীতির হিমালয়-জোড়া তুষার নিয়ে আমার হৃদয়ের দারুণ-দাহ শীতল করি! তার স্বরে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ একগোছা তীর একেবারে গাঁথা!

মেঘমালা কহিল.—আচ্ছা. এ-সব কাহিনী আমাদের কাকেও নিভৃতে ডেকে শোনাবার অর্থ কি, কনক বাবু?

কনক নিঃসাড়; মাথা নীচু করিয়া বসিয়া.. যেন সে পাথরের মূর্ত্তি বনিয়া গিয়াছে!

হাসিয়া মলিনা কহিল. বুঝি ভাবেন, এমনি হৃদয়-ভরা গল্প তরুণীদের হৃদয় জয় করবেন! মলিনা হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মেঘমালা কহিল,—রবিবাবুর কবিতা জানেন ?

কাব্য দেখে যেমন ভাবো,
কবি তেমন নয় গো

আপনাদের ঐ প্রেমের বা বিরহের কবিতা আমরা পড়ি বটে! শাঙন গগনের গান, ঝড়ের রাতের আহ্বান, চাঁদিনী যামিনী, কোথায় সে কামিনী! এ-সবও পড়ি। ভালো গান বা কবিতার তারিফও করি, সত্য। তাবলে তাই পড়ে কবির প্রীতি প্রণয়ে বেপথু হয়ে উঠি, এমন চিন্তা মনে স্থান দেবেন না!...মনের ও এক-একটা উচ্ছ্বাস! ভাষায় ছন্দে ভালো করে তার প্রকাশ দেখে তৃপ্তি পাই ঐ অবধি. . তা না হয়ে আপনি যা ভাবেন, তা যদি সত্য হতো, তাহলে দুনিয়ার যত পাঠিকা আর-কোনো গৃহে আস্তানা বাঁধতো না, কবির চিত্ত-বন ছেড়ে তাঁর গৃহপ্রাঙ্গণে চিড়িয়াখানা বানিয়ে তুলতো···

আর গা-ঢাকা দিয়া থাকিতে পারিলাম না। রঙ্গক্ষেত্রে দেখা দিয়া কহিলাম,—না, না। আহা! বেচারা কবিকে আর অপ্রতিভ করো না তোমরা.. তারপর কনকের পানে চাহিয়া কহিলাম,—উঠে পড়ো কবি। এক-একজনের ও-বাতিক থাকে, কাল্পনিক উপন্যাসের প্রেম নিজের জীবনে গেঁথে নিয়ে করুণ বা বীর-রস উথলে তোলবার। মোদ্দা, ছোট গল্পেও তোমার বেশ মাথা খেলে কনক! লেখা সুরু করে দাও, এই হালের সুরে সুর মিলিয়ে ..আর কিছু না পাও, বাহবা পাবে নিশ্চয়! . তোমার রচনা-শক্তি অপূর্ব্ব— আমি সার্টিফিকেট দিচ্ছি।

মৌ-বনের কবিতা

১

সখীর দলে সুভাগিণীর যে খাতির বাড়িয়াছিল, সেটা মৌ-বনের দৌলতে। মৌ-বন মাসিক-পত্র। তরুণ-তরুণীর দলে মৌ-বনের ভারী পশার। যৌবন-বসন্তে মৌ-বনের যারা খোঁজ রাখে না, সাহিত্যের আসরে তারা বাতিল!

সুভার তরুণ স্বামী রাধানাথ এই মৌ-বনের সহকারী সম্পাদক। বি-এ-র অর্গলে রাধানাথ তিন-চারিবার ধাক্কা দিয়াও সে-অর্গল মুক্ত করিতে পারে নাই। চতুর্থবারে অর্গল ছাড়িয়া সাহিত্যের খাতায় সে নাম লিখাইল। রাধানাথের শাশুড়ী হতাশ-চিত্তে কহিলেন,—কি যে বোঝে, বাপু!...ভেবেছিলুম, উকিল-টুকিল হবে—আমার চিরদিনের সাধ···

সুভার সখী চারুবালা একধারে বসিয়া এ-মাসের 'মৌ-বন' পড়িতেছিল। সে কহিল,—কি যে বলো তুমি মাসিমা···ওকালতি তো বাঙলা দেশের তিন লক্ষ বাঙালী করচে. এমন রচনা-শক্তি ক'জনের আছে ..!

মাসিমা বলিলেন,—থাম্ বাপু...লিখে তো সব দুঃখ ঘুচবে! লেখে ওই হরেন্দর··ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না. বৌটো কেঁদে মরে।

তাচ্ছল্যের হাসি হাসিয়া চারু কহিল,—হরেন বাবু সাপ্তাহিক কাগজে খপর তর্জ্জমা করে বেড়ান, তাঁর সঙ্গে রাধানাথ বাবুর তুলনা! এ-মাসের কাগজে কি কবিতা লিখেচেন ..পড়েচো ?

মাসিমা কহিলেন,—তোরা পড় বাপু ..আমি মুখ্যু, ও-সব লেখা বুঝতেও পারি না। একালের কাগজ যা হয়েচে,—ছাই! আমাদের

কালে কি মাসিক-পত্র ছিল না? না, পড়িনি ? ঐ বঙ্গদর্শন ছিল, সাহিত্য ছিল, ভারতী ছিল···

চারু কহিল,—এবার পড়ে দেখো, অন্ততঃ নিজের জামাইয়ের লেখাগুলো···

কথাটা বলিয়া কৌতুক-ভরে চারু সুভার পানে চাহিল, সুভার মুখে অভিমানের ছায়া! দক্ষগৃহে পতিনিন্দা শুনিয়া সতী দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, একালে ততদূর না হোক, অভিমানও হইবে না? বিশেষ, সতী সুভা তরুণী এবং তাদের বিবাহের তিন বৎসর পূর্ণ হইতে এখনো ঠিক আড়াই মাস বাকী!

চারু কহিল,—তুই পড়েচিস্ ভাই সুভা...বরের লেখা বলে নয়, সত্যি বল্ তো, এমন কবিতা ক'জন লিখতে পারে? ভালো হয়নি?

সুভা কহিল,—ছাই...!

চারু কহিল,—তোমায় শুনতেই হবে, মাসিমা। আমি ছাড়বো না! আমার শ্বশুর-বাড়ীতে রাধানাথ বাবুর লেখার কি খাতির! তাদের কি ক্লাব আছে..সে ক্লাব থেকে ওঁকে অভিনন্দন দেবে, ঠিক হয়েচে।

তকলী ও তুলা লইয়া মাসিমা সুতা কাটিতেছিলেন; কহিলেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, পড় বাছা, শুনি...

চারু পড়িল,—

ফাগুনে আজ গন্ধ বয়ে ছন্দ লয়ে
উঠলো জেগে মন্দানিল,
বন্ধ ঘরে অন্ধকারে তন্দ্রা ভেঙ্গে
রন্ধ্রপথে ছুটলো দিল্!

হাসিয়া মাসিমা কহিলেন,—থাম্ বাছা ও-সব আমরা বুঝি না। ছেলেমানুষের ছেলেখেলা···ও তোদেরই ভালো লাগবে।

চারু কহিল—কেন? এ তো চমৎকার! কেমন অনুপ্রাস বলো দিকিনি! মানেও পরিষ্কার—ফাগুনে ছন্দ নিয়ে গন্ধ নিয়ে হাওয়া বয়েচে, বসন্ত এসেচে বসন্তের নবীন আলোয় দুনিয়ার বন্ধ ঘরের অন্ধকার ঘুচেছে। যেন অন্ধকারের তন্দ্রা ভাঙলো...আর ঐ তন্দ্রা-ভাঙা জাগরণের ফাটলে-ফাটলে আলো পেয়ে দিল্, অর্থাৎ মন ছুটলো!.. কেন মাসিমা, মন্দ কি? এ লাইনগুলো রবিবাবু লিখলে সুখ্যাতি করতে নিশ্চয়! আর এ তোমার জামাই লিখেচে কি না...

মাসিমা কহিলেন,—ওরে, কবিতা পড়বার সময় এখন তোদের··· আমাদের পড়া শেষ হয়ে গেছে। তোরা এখন পড়্, এর পর সংসার ঘাড়ে পড়লে কবিতা পড়বার সময় পাবিনে।

চারু কহিল,—থামো মাসিমা—তুমি যে-কথা বল্‌চো, যেন কত সেকেলে হয়ে গেছ! এই তো সেদিনও রবিবাবুর নতুন বই পড়ছিলে···

মাসিমা কহিলেন,—ঐ-সবের নেশাতেই রাধানাথ লেখা-পড়া সাঙ্গ করে বসলো! জামাই..পরের ছেলে...কিছু বল্‌তে পারি না। সুভাকে বলি, তুই একটু রাগ করিস্, অভিমান করিস্—বলিস্, ও-সব রেখে আগে পাশের কাজটা গুছিয়ে শেষ করো লেখা তো আর পালাবে না···

নীচের তলা হইতে ঝী হাঁকিল,—ও মা, একবার নীচে এসো গো—ঘুঁটেউলি এয়েচে। তুমি বলেছিলে, তাকে কি বল্‌বে! আমি বাপু ওর কথা বুঝি না—ও কি ক্যায়সা-ম্যায়সা করে কথা বলে...

চারু হাসিল, হাসিয়া কহিল,—ঐ নাও, ডাক এসেচে

মাসিমা কহিলেন,—আমার মাসিক-পত্র ঐ ওরাই বাছা, আনাজগুলি আস্‌চে. ঘুঁটেগুলি আস্‌চে মন ঝুঁকে আছে ওদের পশরার উপর। ওরাই আমার কবিতা।

তিনি উঠিলেন এবং সংসারের নিত্যকর্ম্মের ডাকে সাড়া দিতে চলিলেন।

সুভা কহিল,—ফের যদি তুই মার কাছে ওর ঐ কবিতা-টবিতার কথা তুলবি তো তোর সঙ্গে ঝগড়া হবে, ভারী ঝগড়া...তা আমি বলে রাখচি!

সবিস্ময়ে চারু কহিল.— ক্যান্ লো?

সুভা কহিল.- না! মা ও-সব ভালোবাসে না। বাবাও রাগ করে। আমায় মা কেবল বলে,.. ও-সব রেখে লেখাপড়া করতে বল্ না হলে এর পর তোকেই পস্তাতে হবে!

চারু কহিল,- এই করেই ভাই, আমাদের দেশে কত কবির প্রতিভা যে নষ্ট হচ্ছে! আচ্ছা, তুই কি বলিস্...?

সুভা কহিল,—আমি ভাই, অত বুঝি না। তবে দেখেচি তো সেখানে থাকতে...সকলে ওকে কি মান্য, কি খাতির করে। কত লোক চিঠি লেখে, মিনতি জানায়,—তাদের লেখা কাগজে ছাপাবার জন্য...কত লোক লেখা নিয়ে ওকে দেখাতে আসে! আর ও কি বলে জানিস্? সেবার ফেল্ হতে আমি দুঃখ করেছিলুম বলে ..?

চারু কহিল. কি?

সুভা কহিল,—ও বলে. রবিবাবু একটিও পাশ করেন নি, আর তাঁর যে এই জগৎজোড়া নাম. সে ঐ কবি-প্রতিভার জন্য! তাছাড়া আরো কি বলে, জানিস্?

চারু কহিল,—কি ?

সুভা কহিল,—সেদিন কবি মকরাক্ষ চক্রবর্ত্তী মারা যেতে শোক-সভা হলো না ? কত গান, বক্তৃতা...কাগজে মকরাক্ষ বাবুর ছবি ছাপা হলো—দেখেচিস ! ও বললে...উকিল-ডাক্তার মলে এ-সম্মান পায় তারা ? না, তাদের মরণে এমন শোকসভা হয় ?

কথার শেষে সুভার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া উঠিল...বুঝি, ভবিষ্যতের কোনো দুর্দ্দিনের করুণ স্মৃতির কল্পনায় ..

চারু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—তা ভাই, সে-সম্মান যতই হোক, মকরাক্ষ বাবুর স্ত্রীর দুঃখ কি তাতে যাবে ?

সুভা কহিল,—দুঃখ যাবে না . তবু অত-বড় দুঃখে তার এটুকু সান্ত্বনা তো আছে যে, স্বামীর জন্য এত লোক সভা ডেকে শোক প্রকাশ করচে ·

উক্ত রিপোর্টটুকু তুচ্ছ ব্যাপার, হয়তো এ-কথা না বলিলেও চলিত। তবে কবি-প্রতিভাকে কত বাধা ঠেলিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়, এ শুধু তারি একটু পরিচয় দেওয়া মাত্র !

শ্বশুর পশারওয়ালা উকিল, কাজেই কবি-প্রতিভার জন্য রাধানাথ এ-গৃহে বড় তারিফ পায় না ! বি, এ ফেল হওয়ার পর শ্বশুর উপদেশ দিতে ছাড়েন নাই। শাশুড়ীও দু'চারিটা ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন, ছেলেমানুষী রাখিয়া এই বেলা নিজের দিন যদি কিনিতে পারো তো, তোমার নিজেরই মঙ্গল .

নিজের গৃহে উপদেশের বালাই ছিল না। বিধবা মা, এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া তার উপর কথা কেহ বলিতে পারে না। মা অনুযোগ তুলিলে রাধানাথ বুঝাইয়া দেয়, মামুলি পথ তার নয় ! দেবী বীণাপাণির মঞ্জীর-ধ্বনি তার মর্ম্মে পশিয়াছে...

২

কাল রাধানাথ শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিল, আজ বাড়ী ফিরিতেছে। বিদায় প্রার্থনা করিলে রাধানাথের হাত ধরিয়া সুভা তাকে বসাইয়া কহিল,—একটা কথা আছে।

রাধানাথ কহিল, কি কথা?

সুভা কহিল আমায় তোমার সহধর্ম্মিণী করে নাও তোমার এই সাহিত্য-ব্রতে

রাধানাথ সুভার পানে চাহিল, এ-কথার অর্থ?

সুভা কহিল—তোমাদের কাগজের প্রুফটা অন্ততঃ দেখতে শেখাও

সুভাকে রাধানাথ জানিত, নারী-কুল-রত্ন। কোন্ তরুণ স্বামী না স্ত্রীকে তা মনে করে? কিন্তু তা বলিয়া সুভা এমন মানে, তার কাগজের প্রুফ দেখিয়া দিতে চায়!

মুগ্ধ রাধানাথ কহিল—না, না প্রুফ দেখা হলো মোটা কাজ তুমি আমার রূপসী পাঠিকা.. তাই থাকো, সুভা

সুভা কহিল,—না। জানো তো রাজা-রাণার সুমিত্রার কথা বাহিরে মহিষী তব অন্তরে প্রেয়সী। আমি তাই হতে চাই। তোমার যখন এই ব্রত, তখন আমাকেও তোমার পাশে নাও

রাধানাথ কহিল,—অর্থাৎ কি বলতে চাও?

সুভা কহিল,—কায়ে-মনে আমি কবিপ্রিয়া হতে চাই—তোমার ভাবের উৎস তো আমিই। সে ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রেও আমি তোমার পাশে পাশে থাকবো। তোমাদের মৌ-বনের সম্পাদকীয় আসরে আমার স্থান যদি না হয় তো লেখিকা-হিসাবে.

রাধনাথ কহিল.—লেখিকা!

সুভা কহিল,—হ্যা ..তুমি দেখিয়ে দিলে কেন আমি লিখতে পারবো না? তোমাদের মাসিকে যে-সব বই আসে, সমালোচনার জন্য…কতবার আমায় দিয়ে তা প'ড়য়ে আমার মত নিয়ে সমালোচনা লিখেচো তো!

সুভার প্রদীপ্ত দুই চোখের পানে চাহিয়া. রাধানাথ কহিল,—তা লিখেচি।

সুভা কহিল,—তবে? আমায় কবিতা লিখতে শেখাও, গল্প লিখতে শেখাও...আষাঢ় মাস থেকে নিয়মিত আমি তোমাদের মৌ-বনে লিখতে চাই। চারুকে জানো তো! আমার সই চারু… 'রমণী' কাগজে এ-মাসে তার একটা কবিতা ছাপা হয়েচে। আমায় একখানা 'রমণী' পাঠিয়েচে। সে যদি কবিতা ছাপায়, আমি তোমার স্ত্রী হয়ে চুপ করে থাকবো না।

রাধানাথ কোনো জবাব দিল না। সে ভাবিতেছিল, মৌ-বনের সম্পাদক সুবল হাজরার কথা। ভারী অহঙ্কার! সে যেমন লিখিতে পারে, সে যেমন লেখা বোঝে…এমন আর কেহ নয়! রাধানাথের কবিতা যে ছাপা হয়, রাধানাথ মাসে মাসে চাঁদা দেয়, বিজ্ঞাপন জোগাড় করে, তাই! তার উপরে তার কবিতার কত লাইনে কাটকুট করিয়া কি অদল-বদলই না ঘটায়!...বাহিরে মৌ-বনে তার অধিকার লইয়া যত বড়াই সে করুক, মর্ম্ম-কথা সে তো জানে। অত কাজ করে নিজের লেখা-পড়া বিসর্জ্জন দিয়া, তাই রাধানাথ মৌ-বনের সহকারী সম্পাদক,.. নহিলে...

সুভা কহিল,—ঐ যে মেজমামার কাছারির ব্রীফ্ মেজমামী গুছিয়ে দেয়। আমারো ভারি ইচ্ছে ..

রাধানাথ কহিল —মন্দ নয় . ব্রাউনিং-দম্পতী ছিলেন না…আচ্ছা, তোমায় লিখতে শেখাবো।

সুভা কহিল,—আমি একটা কবিতা লিখেচি।

—লিখেচো ?

সুভা কহিল,—হাঁ, সে কবিতা তোমায় ছাপাতেই হবে এই মাসের মৌ-বনে।

রাধানাথের চোখের সাম্‌নে সুবলের সেই গর্ব্বিত মুখচ্ছবি জাগিয়া উঠিল—যে-লেখাই সে আনিয়া দেয়, দেখিয়া সুবল তাচ্ছল্য-ভরে বলিয়া ওঠে, Damn it !

সুভার কথায় তাই তার বুকটা ধড়াশ করিয়া উঠিল। সে তো জানে, কবিদের প্রথম চেষ্টার ফল প্রায়ই কেমন হয়। রচনা-সম্বন্ধে সুভাও এমন শক্তির পরিচয় কোনো দিন দেয় নাই—তাই সে কহিল,—আমার কাগজে ছাপা…ভালো দেখাবে কি ? লোকে বলবে, স্ত্রীর লেখা বলেই ছেপেচে ! তাতে ওর গৌরব কমে যাবে… নয় কি, সুভা ?

সুভা কহিল,—আমি গৌরব চাই না, কবিতা ছাপাতে চাই। এনে দি…

সুভা আলমারি খুলিল এবং ড্রয়ার হইতে একটা চিঠির কাগজ বাহির করিয়া আনিয়া রাধানাথের হাতে দিল, দিয়া কহিল,—পড়ো… পড়ে বলো, কোথায় দোষ আছে ! আমি ছাড়্‌চি না…এর চেয়ে ঢের খারাপ কবিতা তোমাদের মৌ-বনে ছাপা হয়েচে, আমি দেখিয়ে দিতে পারি…

রাধানাথ কহিল,—কিন্তু ঐ তো বলেচি, সুভা, তুমি স্ত্রী বলেই…

সুভা কহিল,—বা রে। নিজের স্ত্রীর বেলাতেই যত কষাকষি! আর পর-স্ত্রীর লেখা হলে তখনি তা মিষ্ট-মধুর হয়, না? আর ছাপাতে আপত্তি থাকে না!

তার দুই চোখের দৃষ্টিতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল!

রাধানাথ তরুণ কবি,—অতএব

সুভা কহিল,—পড়ো আমার কবিতা।

রাধানাথকে পড়িতে হইল। মন্দ নয় তবে নূতন কথা বা ছন্দের কেরামতি এমন কিছু নাই ..যাহাতে স্ত্রীর রচনা-গর্ব্বে গৌরব জাগে...!

সুভা কহিল,—কেমন হয়েচে? বলো, খারাপ? ছাপার অযোগ্য?

রাধানাথ কহিল, তা ঠিক নয়। মানে. একটু আধটু কাটকুট করলে চলে যাবে। ..বেশ, দাও, .আমি ঐ 'অমরাবতী'তে ছাপিয়ে দেবো। তার সম্পাদক বঙ্কেশ্বর বাবু আমায় খাতিরও করেন.— বলবো, আমার স্ত্রীর লেখা ..

সুভা কঠিন স্বরে কহিল,—না, 'অমরাবতী'তে নয়.. তোমার কাগজে ছাপাতে হবে। চারু আমায় লিখেচে—হাতে মাসিক-পত্র রয়েচে...তুই কেন কবিতা লিখিস্ না? স্ত্রী-কবি আর নেই রে! এখন মেয়েরা কেবল উপন্যাস-গল্প লিখতে ছুটেচে। এখন কবিতা ছাপালে চট্ করে নাম হবে। ..

রাধানাথ কহিল,—আচ্ছা, দাও...আমাদের কাগজেই ছাপাবো কিন্তু তোমার নামটা যদি বদলে দি? ধরো. লেখিকা শ্রীমতী সুভাষিণী দেবীর জায়গায় নাম দেবো শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী, কিম্বা রাণী দেবী...

সুভা কহিল —আমার খ্যাতি বুঝি সহ্য হবে না ?

রাধানাথ কহিল,—তা নয়, তা নয় .

—তবে ?

রাধানাথ কহিল,—ওরা তোমার নাম জানে কি না ভাববে, স্ত্রী বলেই...

সুভা কহিল,—তবে থাক . এত লজ্জা ! কিন্তু মনে পড়ে—এক বছর আগেও তুমি আমায় সেধেচো—লেখো সুভা, কবিতা লেখো, গল্প লেখো, লেখো তুমি তোমার লেখার ক্ষমতা আছে সহজেই হবে আমি দেখে দেবো ?

সুভার সুন্দর মুখে অভিমানের কালো ছায়া বেশ ঘন হইয়া উঠিতেছিল। রাধানাথ তাহা লক্ষ্য করিল। এ-ছায়া আরো ঘনাইলে তার আর দুর্গতির সীমা থাকিবে না! কাজেই সে বলিল—আচ্ছা, দাও তোমারি নামে ছাপা হবে.. এবং আমাদের মৌ-বনেই।

সুভা কহিল,—আমি অন্যায় অনুরোধও করচি না। বেশ, তোমাদের সম্পাদকীয় আসরেই এ-কবিতা দিয়ো। যদি তাঁদের বিবেচনায় ছাপার অযোগ্য হয়, ছেপো না। আর যদি যোগ্য হয় ?

রাধানাথ কহিল,— বেশ তাই হবে..

সুভা কহিল,—না, বিচারে কোন পক্ষপাতিত্ব চাই না ·

রাধানাথ কবিতা লইয়া পকেটে রাখিল। তার মনে গর্ব্ব বোধ হইল, স্ত্রী কবিতা লেখা ধরিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে একটু কেমন সঙ্কোচও! সম্পাদক সুবল হাজরা.. যদি না ছাপে ?...যদি বলে, রাধানাথ নিজে লিখিয়া স্ত্রীর নামে চালাইয়া দিয়াছে ?

৩

কাল, রাত্রি। স্থান, রাধানাথের নিজের গৃহ। শয়ন-কক্ষে সে একা·· শ্বশুর সুভাকে পাঠান নাই—বেশ দৃঢ় স্বরে বলিয়া দিয়াছেন,— আবার পড়ে পাশ করা চাই। কবিতা-রচনা ছাড়ো, মৌ-বন ছাড়ো। মক্কেলগুলোর ভার যদি তোমার হাতে দিয়ে যেতে পারি...

শ্বশুর পয়সাওয়ালা লোক,—রাশভারি...সুভা তাঁর আদরের মেয়ে...এবং বিবিধ উপঢৌকন ও বাবু-সজ্জার বিচিত্র উপকরণ,···যার জোরে রাধানাথ বেশে-ভূষায় শ্রী ফুটায়, সে-সব আজো তাঁর দান – এ-দান সাহিত্যিক বন্ধু-সমাজে তার ইজ্জৎ কতখানি উঁচু করিয়া রাখিয়াছে! কৃতজ্ঞতা না হোক, ইজ্জতের খাতিরেও শ্বশুরের উপদেশ শিরোধার্য্য করিতে হয়!...

সুভার কথা বার-বার মনে জাগিতেছিল। সহসা মনে হইল, কবিতাটা একবার দেখিয়া শুধরানো যাক...

উঠিয়া সে জামার পকেট হাতড়াইল—এটা ..? জেনারেল ষ্টোর্শের ক্যাশ-মেমো এক টুকরা,—এক বাক্স সাবান দেড় টাকা; এক-টুকুরা পেন্সিল, কাগজ। সেই কবিতা-লেখা কাগজখানা? সর্ব্বনাশ, নাই!...

ঘরের কোথাও নাই...মণিব্যাগের মধ্যে? না, তাও নাই!... বই-খাতা ঘাঁটিয়া কোথাও সেই কবিতা-লেখা কাগজ মিলিল না!

রাধানাথ ভাবিল, ঠিক, প্রেশের সেই প্রুফের তাড়া, তার পাশেই কবিতাটি রাখিয়াছিলাম। মৌ-বন অফিসে সেই এক দল বন্ধুর প্রবেশ ও বিরাট কোলাহল···এক ঠোঙা কচুরির সদ্ব্যবহার... সেই মত্ত কোলাহল-কলরবে কোথাও হয়তো খোয়া গিয়াছে...!

কিন্তু সুভার অত-যত্নে-দেওয়া কবিতা...খোয়া গিয়াছে শুনিলে সুভার আর অভিমানের সীমা থাকিবে না! সুভা ভাবিবে, "এ শুধু

রাধানাথের কাপট্য...গোড়া হইতে সে নিষেধ তুলিয়াছিল, ছলনায় শুধু স্তোক দিয়া গিয়াছে! নিজেই নূতন একটা লিখিয়া দিবে? বলিবে, কাটকুট করিয়া এমনি দাঁড় করানো হইয়াছে! কিন্তু সেটা কি-কবিতা ছিল? তা'ও যে ভালো লক্ষ্য করে নাই! সুভা পড়িতে বলিয়াছিল; সে কি পড়িয়াছে? শুধু চোখ বুলাইয়া গিয়াছে—ছেলেমানুষকে ভুলাইবার জন্য...তাদের মৌ-বনে কত সমস্যা লইয়া তারা প্রবন্ধ কবিতা গল্প লেখে, সমস্যা ছাড়া লেখাই হয় না...সেখানে সুভা কি কবিতা ছাপাইবে! এই ভাবিয়া .

কবিতা খোয়া গিয়াছে, এ-কথা জানানো হইবে না—একটা নয় নূতন কিছু লিখিয়া দিবে! ভাবিয়া চিন্তিয়া সে চিঠি লিখিল,—"তোমার কবিতা আজ আসরে পড়া হইয়াছে, সকলে ভারী সুখ্যাতি করিয়াছে। তবে তার কতকগুলা লাইনে কাটকুট করা হইয়াছে। কাটকুটের পর যা দাঁড়াইয়াছে, অপূর্ব্ব!"

চিঠিখানা খামে আঁটিয়া ভাবিল, কাল সকালেই ডাক-বাক্সে দিতে হইবে; বিলম্ব নয়! ..

দু'দিন পরের কথা···মৌ-বন অফিসে রাধানাথ চলিয়াছিল; বেলা পাঁচটা বাজে···ডাকওয়ালা একখানা চিঠি দিল। খামে চিঠি; সুভা লিখিয়াছে। চিঠি খুলিয়া রাধানাথ দেখে, চারটি মাত্র ছত্র। সুভা লিখিয়াছে,—

"আমার সে-কবিতা ছাপিয়ো না। খবর্দ্দার। আমায় এখনি ফেরত পাঠিয়ো। মতামতে দরকার নেই। আমি ছাপাতে চাই না, তোমায় জেদ দেখিয়ে অপরাধ করেচি। সেজন্য মাপ করো।···"

চিঠি পড়িয়া রাধানাথের চক্ষু-স্থির! তার সে-চিঠির জবাব এই? নিশ্চয় কবিতাটি তাহা হইলে সেখানেই ফেলিয়া আসিয়াছে। সে-কবিতা পাইয়া এবং তার চিঠিতে মিথ্যার বহর দেখিয়া সুভা চটিয়া এ-চিঠি লিখিয়াছে!…এ ব্যাপারের পর কোন্ মুখে সে এখন সুভার কাছে দাঁড়ইবে! সুভাকে সে কি না বুঝাইয়াছে, সুভা তার ভাবের উৎস, তার কর্ম্মে উদ্দীপনার বহ্নিশিখা। সুভার কাছে সে জীবনে কোন কথা গোপন করিবে না, বলিয়াছিল,...তাব অন্তর অকপটে মেলিয়া ধরিবে! তার কালির লেখা, আলোর রেখা...কিছু লুকাইবে না! আর এই কবিতাব ব্যাপারে...?

মৌ-বন অফিসে গিয়া প্রুফের তাডা সে পকেটস্থ করিল এবং চট্ করিয়া আসিয়া বাসে চড়িল…বাসে চডিয়া একেবারে কালীঘাটে শ্বশুর-গৃহে!...

ঐ বাড়ী দোতলার ঐ ঘব..ঐ জানালা..জ্যোৎস্না নিশীথে ঐ জানালায় দাঁড়াইয়া আকাশের পানে চাহিযা সুভাকে অন্তরের কত কথাই সে গদগদ ভাষে শুনাইয়া বিহ্বল বিবশ করিয়া দিয়াছে...

বাড়ীব দ্বারে পা দিতে তাব পা কাঁপিল! তুচ্ছ ব্যাপাব লইয়া কি কাণ্ডই ঘটিল! এর চেয়ে বেশ সহজভাবে সত্য কথা লিখিলে চলিত,—তোমাব কবিতাটি ফেলে এসেচি রাণি! আর-একটা কপি করে শীঘ্র পাঠিয়ো...তা না, কি বুদ্ধি যে উদয় হইল।

চোরের মত আসিয়া সে একেবারে দোতলায় উঠিল। সামনে শাশুডীব সঙ্গে দেখা! শাশুডী কহিলেন,—এই যে বাবা…! তোমার শ্বশুর বলছিলেন, তুমি আবার কলেজে ভর্ত্তি হয়েচো. ভালো কথা! এবাব বেশ করে পড়ো ও-সব ছেড়ে। তা, এধারে এসেছিলে বুঝি?

বাধানাথ কহিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ অভয় ভড়েব ওখানে পার্টি ছিল। ক'জন লেখকেব নিমন্ত্রণ হয়েছিল, আলাপ-পবিচয় কববে বলে ..

কথাগুলাব দিকে শাশুড়ী বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেখাইলেন না, কহিলেন,—ঘবে বসো। সুভাকে আমি পাঠিয়ে দি। সে বুঝি ওর ঘবে বসে রেডিও শুনচে।

সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া বাধানাথ খাটের বিছানায় বসিয়া রহিল -যেন নির্জীব পুতুল।

সুভা আসিল— তাব মুখে-চোখে প্রসন্ন হাসিব সে দীপ্তি কৈ ?

বাধানাথ উঠিয়া হাত বাড়াহল, কহিল—এসো সুভা..

সুভা সবিয়া গেল, কহিল থাক্, আমায আদব কবতে হবে না। আদব নয়। আমাব সে কবিতা কৈ ? এনেচো ?

বাধানাথ কোনো কথা না বলিয়া মিনতি-ভবা দৃষ্টিতে সুভাব পানে চাহিয়া বহিল। সে যেন চোব অপবাধেব লজ্জায় কাতব... এমনি তাব ভাব ! কি যে বলিবে ? চুপ কবিযা নিজের অপবাধটুকু লঘু কৌতুকেব বঙে বাঙাইযা ? কিন্তু তাব অবসব কৈ মেলে !

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুভা কহিল,—অমন কবে চেয়ে আছো যে ! কি দেখচো ?

—বুঝতে পারচো না ? ..লক্ষীটি, আমায তুমি মাপ কবো

কথাব সঙ্গে সঙ্গে সুভা একেবাবে সেই কবি-লিখিত বাত্যাহত বেতস-লতাব মত বাধানাথেব পায়েব উপব লুইয়া পড়িল।

বাধানাথ তাব দুই হাত দিয়া ধবিয়া সুভাকে তুলিল, কহিল,—কি কবেচো সুভা যে এমন ভাবে মাপ চাইছো. ?

রাধানাথের দুই চোখে একবাশ বিস্ময় !

সুভা তার পানে চাহিল, চাহিয়া পরক্ষণে মুখ নত করিল।

রাধানাথ কহিল,—কোনো অপরাধ করো নি তো সুভা। একে কি অপরাধ বলে ?

সুভা কাতর নয়নে তার পানে চাহিল, কহিল,—অপরাধ নয় ? আমি চোর। লোকের ঘটি-বাটি চুরি করলে চোরের জেল হয়; আর...

সুভার কথা শেষ হইল না। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

রাধানাথ ভড়কাইয়া গেল! সে কহিল,—কি বলচো সুভা...?

সুভা কহিল,—বলো, আমায় মাপ করবে ? ঘৃণা করবে না ? আমায় ত্যাগ করবে না ?

ঘৃণা, ত্যাগ...ব্যাপার কি ?

সুভা কহিল,—ক্ষমা চাইবার যোগ্যতাও আমার নেই। আমি চোর—সে-কবিতা আমার লেখা নয়, পরের। সে-লেখা আমি চুরি করেচি। আর বছরের পূজার সংখ্যা 'বারাণসীতে' ছাপা হয়েছিল—ভারতচন্দ্র বক্সীর লেখা।...

রাধানাথের যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল! হাসিয়া সে কহিল,—এই...?

সুভা কহিল,—লজ্জায় তোমার পানে আমি চাইতে পারচি না। অপরে লেখা ছাপিয়ে নাম করচে দেখে আমি নিজে অক্ষম হয়েও পরের লেখা চুরি করে কাগজে ছাপাতে পাঠিয়েচি.. তাও নিজের স্বামীর হাত দিয়ে! ঘটি-বাটি চুরি করে যে-চোর জেলে যায়, তার সঙ্গে আমার তফাৎ কোথায় ?

আবেগোচ্ছ্বাসে সুভা ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আঁচলে সে মুখ ঢাকিল। রাধানাথ তার হাত ধরিয়া তাকে আনিয়া খাটে বসাইল। তার চোখের জল মুছাইয়া রাধানাথ ডাকিল,—সুভা...

সুভা কহিল,—কি ?

রাধানাথ কহিল,—পরের লেখা চুরি করে ছাপাতে পাঠানো ঠিক নয়। সম্পাদকরা কত লেখা পড়ে; মনে রাখতে পারে কি কোন্‌টা কোথায় কবে ছাপা হয়েচে...? তারা এ-বিশ্বাসে লেখা নেয় যে, এ-লেখা যে পাঠিয়েচে, তার নিজের লেখা...

সুভা কহিল,—আমায় মাপ করবে না? সে-লেখা তোমার বন্ধু-সম্পাদকরা দেখে কি ভাবলেন...!

রাধানাথ কহিল,—ভয় নেই সুভা...সে-লেখা কেউ দেখেনি...

সুভার চোখের জল শুকাইয়া আসিতেছিল; সে রাধানাথের পানে চাহিল। রাধানাথ কহিল,—সে-লেখা আমি হারিয়ে ফেলেচি। সেই রাত্রে সে-লেখা খুঁজে পাইনি ..

সুভা উঠিয়া দাঁড়াইল—বেশ বেগে . যেন পটকার পলিতায় আগুন ছোঁয়ানো হইয়াছে! তেমনি তীব্র ঝাঁজে কহিল,—তবে ও-চিঠির মানে?

রাধানাথ কহিল,—পাছে তুমি মনে করো যে, তোমার অমন সাধের কবিতার আমি যত্ন নিইনি! .ভেবেছিলুম, নিজে একটা কবিতা লিখে মৌ-বনে ছাপিয়ে দেবো তোমার নামে। তুমি বুঝতে পারবে না। কাল একটা লিখে ছাপতেও দিয়েচি ..

সুভা কহিল,—খবর্দ্দার! তা দেবে না।...কিন্তু তুমি না বলেছিলে, আমার কাছে কোন কথা কোন দিন গোপন করবে না? অকপটে...

মৃদু নম্র কণ্ঠে রাধানাথ কহিল,—পাছে তোমার মনে আঘাত লাগে সুভা, তাই···রাধানাথ সস্নেহে সুভার হাত ধরিল।

সজোরে হাত ছাড়াইয়া সুভা জানলার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। কাছেই কোন্ বাড়ীতে কাঁসর বাজাইয়া ঠাকুরের আরতি হইতেছিল···

রাধানাথ আসিয়া স্থভার পাশে দাঁড়াইল, ডাকিল,—স্থভা ..

স্থভা ফিরিল, কহিল,—কি ? তার স্বরে অভিমানের ঝাঁজ !

রাধানাথ কহিল,—আমায় তুমি মাপ করো···

স্থভা কহিল,—আমি ভাবচি, .কার অপরাধ বেশী···আমার, না তোমার ? ..আমি চোর...

রাধানাথ কহিল —আমি ঠক...

নিশ্বাস ফেলিয়া স্থভা কহিল —আমার গা ছুঁয়ে একটা কথা বলবে ?···

—কি কথা ?

—যে, কখনো আর আমার সঙ্গে এ-ছলনা করবে না ? আমি কথা দিচ্ছি, কাগজে লেখা ছাপাবার সাধ আমি কখনো করবো না...

রাধানাথ কহিল,—বিশ্বাস করো...স্থভা, এ-ছলনা আর কখনো নয়...

স্থভা কহিল,—যত ছোট হোক...স্বামি-স্ত্রীর মনের বিশ্বাস যেন অটুট্ থাকে !

রাধানাথের মনে জাগিতেছিল, 'চন্দ্রশেখর'-উপন্যাসে সেই শৈবলিনীর কথা—'কিন্তু কতদিন প্রতাপ' ? এ ক্ষেত্রে সে-কথা খাটে কি না, তা সে বোঝে না...তবু কথার স্থর···

হঠাৎ বাহির হইতে মা ডাকিলেন,—ওরে স্থভা ..

—যাই মা...

মা কহিলেন,—আসতে হবে না। তবে. রাধানাথকে বল্, ওঁর এক মক্কেল এই মাত্র হরিণের মাংস দিয়ে গেছে.. রাধানাথ খেয়ে তবে যাবে...

রাধানাথের পানে হাসি-ভরা দৃষ্টিতে স্থভা চাহিল, রাধানাথও চোখের দৃষ্টিতে উত্তর দিল, বেশ···

স্থভা কহিল,—তাই হবে মা...এখান থেকে খেয়েই যাবে।

— শেষ—

লেখকের লেখা অন্য বই

উপন্যাস

জীবন-স্বপ্ন	২॥০	নিরুদ্দেশের যাত্রী	১॥০
আঁধি	২॥০	মরুমায়া	১॥০
অতঃপর	২৲	ছোট পাতা	১॥০
পিয়ারী	২৲	মনের মিল	১৲
কুজ্ঝটিকা	২৲	মমতা	১৲
লজ্জাবতী	২৲	শান্তি	১৲
গরীবের ছেলে	২৲	দরদী	১৲
বহ্নিশিখা	২৲	প্রেয়সী	১৲
নারী	২৲	সোনার কাঠি	১৲
মুক্তপাখী	২৲	বন্দী	১৲
বিনোদ হালদার	২৲	নবাব	২॥০
নিশির ডাক	২৲	মাতৃঋণ	১॥০
রূপছায়া	২৲	নেপথ্যে	॥০
স্ত্রীবুদ্ধি	১৸০	পথের পথিক	।৵০
মুক্তি	১৸০	বড় ঘর	যন্ত্রস্থ
কাজরী	১॥০	ধূলামাটি	”
লাল ফুল	১॥০	নিশীথ দীপ	”
বাবলা	১॥০	অকলঙ্ক চাঁদ	”

খাট্টা ও খোট্টা	২৲	মণিদীপ	১৲
তরুণী	২৲	নির্ঝর	১৲
যৌবরাজ্য	১॥০	পরদেশী	১৲
পিয়াসী	১।০	শেফালি	৸০
মৃণাল	১।০	বৈকালি	॥০
চাঁদমালা	১৲	রঙের টেক্কা	যন্ত্রস্থ
পুষ্পক	১৲	* * *	

নাট্যগ্রন্থ

স্বয়ংবরা	১৲	দশচক্র	৸০
লাখ টাকা	১৲	হাতের পাঁচ	।৵০
হারানো রতন	।৶০	শেষ বেশ	।৵০
দরিয়া	॥০	পঞ্চশর	।৶০
রুমেলা (বিজয়িনী)	॥০	গ্রহের ফের	।০
যৎকিঞ্চিৎ	॥০	* * *	

ছেলেমেয়েদের গল্প—উপন্যাস

লাল কুঠি	১।০	সাঁঝের বাতি	॥০
মাকালীর খাঁড়া	১৲	ফুলের পাখা	॥০
ছায়াদানব	১৲	তারার মালা	॥০
পাঠান মুলুকে	১৲		

সকল গ্রন্থই কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে, এবং ৮২।৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—ঠিকানায় শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।